বিষয় : বাংলা ছোটগল্প

সম্পাদনা

সমীরণ মজুমদার

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রণে
নিউ মহাত্মা প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাত ৭০০০৭৩

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

গল্প

বাংলা
ছোটগল্পের সেকাল একাল

স্বরাজ গুছাইত

ছোটগল্প সাহিত্যপ্রকরণের শেষ শ্রেষ্ঠ অবদান ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিস্ময়কর সাহিত্যফসলরূপে আলোচিত ও বহুজনসমাদৃত। ছোটগল্পের প্রচলিত জন্মলগ্ন ও ঠিকুজী কতখানি সত্য আর কতখানি এখনও অনাবিষ্কৃত. অন্ধকার গর্ভগৃহে নিহিত তা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে। সেই আলোচনার সীমা-সরহদ্দ বেড়েছে, অনেক গবেষণাধর্মী বইও প্রকাশিত হয়েছে, তবু এই দীর্ঘকালের অনালোচ্য উক্ত বিস্ময়কর অবদানটির প্রতি আমাদের বিস্ময় থেকেই যায়। আদিযুগে সৃষ্টিরহস্যের বিস্ময়ের সঙ্গে মানবমনের নিভৃতে অনেক গালগল্প রচিত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষ ও মানবমন যদি অপ্রত্যক্ষগোচর, অবিভাজ্য, একীভূত সত্তা হয় এবং সেই সত্তার (কারয়িত্রী কিংবা ভাবয়িত্রী যাই হোক) যদি প্রকাশকল্পনা থাকে তবে সেখান থেকেই গল্পের সূচনা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে ছোটগল্প শিল্পীর অনুভূতিপ্রসূত এমন এক বাধাবন্ধযুক্ত গদ্যকাহিনী যার সুনির্দিষ্ট ও একমুখীন বক্তব্য কোন ঘটনা পরিবেশ বা মানসিকতাকে আশ্রয় করে দ্বন্দ্ব ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। বোঝা যাচ্ছে আধুনিক ছোটগল্পে কেন্দ্রস্থ বিন্দুটিতে মানব-মানবীই দাঁড়িয়ে আছে, অন্যান্য বিষয় তাদের অনুষঙ্গমাত্র। গল্প শোনার আদিম আকাঙ্খা গল্পের জন্মেতিহাসকে জটিলবদ্ধ করেছে ; আধুনিক ছোটগল্প তা থেকে কিছুটা মুক্ত—সর্বাংশে বোধ করি নয়।

বাংলা ছোট গল্পের সৃষ্টিতে তার বিষয়, আঙ্গিক ও প্রকরণে সত্যিই কী য়ুরোপীয় বা প্রতিচী প্রভাবের প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়েছিল? ছোটগল্প রচনায় উদ্দীপক হেতু ও মালমসলার অভাব কী বস্তুতই ভারতীয় সাহিত্যে

অভাব ছিল। এখনকার ছোটগল্পকাররা কী তাদের ছোটগল্পটির কুসুম ফুল্ল করতে সতত বিদেশী মৌসুমী হাওয়ার আশায় অপেক্ষমান থাকেন? নব সৃজ্যমান আঞ্চলিক ভাব-ভাষা-বিষয়কেন্দ্রিক ছোটগল্পের পরমপিতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী হতে পারেন কিন্তু তিনি কখনই কোনও বিদেশী সাহিত্যস্রষ্টা নন। আধুনিক ছোটগল্পের অভ্যুন্নতি ও সমুন্নতিতে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব অবশ্যই আছে; কিন্তু সেই প্রভাব না থাকলেও আমাদের দেশে ছোটগল্প তার নিজস্ব রীতিতে একটু দেরীতে হলেও রচিত হত। কেননা য়ুরোপীয় সভ্যতা-প্রসূত রেনেসাঁ আমাদের দেশীয় গল্পের মধ্যে সঞ্জীবনী মানবিকী অনুভূয়মান সত্যগুলিকে ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন করে ফেলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত ছোটগল্পের অনবচ্ছিন্ন উদ্দাম গতিপ্রবাহ ও জয়যাত্রা লক্ষ্য করলে তার বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যে সাহসী করে তোলে। অতএব সমাজ-ব্যক্তি ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রাথমিক প্রকাশ স্তরে বাংলা ছোটগল্প যে পূর্ণত বিদেশী ছোটগল্পের পক্ষপ্রসূত উত্তাপের আশায় আশায় মাত্র বসেছিল সেকথা মেনে নিতে সায় দেয় না। তবে য়ুরোপীয় শিল্প -বিপ্লবের পরবর্তী যুগের প্রভাবকে বাংলা ছোটগল্প নিদারুণভাবে আত্মসাৎ করেছে। আলৌকিকতা ও পৌরাণিকতার নাগপাশ থেকে পরিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা ছোটগল্প উনবিংশ শতাব্দীতে মানবিক জীবনজিজ্ঞাসার পথ ধরেছে।

ছোটগল্প এমন এক গদ্যকাহিনী যা স্বল্প পরিসরে গল্পটির চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতিকে বা চরম পরিণতিতে গল্পকার শৈল্পিক কুশলতায় উচ্চতর কোটিতে পেঁাছে দেয়। ঘটনা, চরিত্র, অনুভূতি, সাংকেতিকতা যাই ছোট গল্পের বিষয়ীভূত হোক না কেন তা গল্পকারের পরিমিতিবোধ, আকস্মিক সূচনা পরিশেষে রসের নিবিড় মোচড় বা চমৎকারিত্বের গুণে সার্থক হয়ে ওঠে। এইরূপ যথার্থ বাংলা ছোটগল্পের শিল্পসার্থকতা রবীন্দ্রনাথের আগে আর কারও হাতে ঘটেছিল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রপূর্ব ছোটগল্প চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সার গুণদোষগুলি থেকে আপনাকে পরিপূর্ণ মুক্ত করতে পারে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে সাময়িক পত্রিকায় যেসব গল্পাদি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উপকথা জাতীয়। রবীন্দ্র-সমসাময়িক গল্প-কারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রথম চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত যাঁরা অল্পবিস্তর ছোটগল্পের চর্চা করেছিলেন তাঁরা হলেন দীনবন্ধু মিত্র সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গো-

পাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অক্ষয়কুমার সেন প্রমুখ। সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে এঁদের সমধিক কীর্তি থাকলেও ছোটগল্পের চিন্তাচর্চায় তাদের অবদান সম্পর্কে আমরা বিস্মৃত হয়েছি। যাইহোক স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের সঙ্গে স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটগল্পের একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। ছোটগল্পের সেকাল ও একাল বলতে যে উনিশ-বিশ দুই শতাব্দীর কথা মনে আসে আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেইদিকে সানুপুঙ্খ আলোকপাত করা সম্ভব নয়।

উনিশ শতকের গল্পকারদের সমাজবদ্ধ মানুষের কথা বিশ শতকের গল্পকারদের হাতে নবনিরীক্ষাসূত্রে অনেক বলিষ্ঠ ও স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ যে গল্পের আদি পীঠস্থান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আখ্যানক জাতীয় রচনা বৈদিক, পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে, বৌদ্ধজাতকে, সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বৃহৎকথা, কথামঞ্জরী, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে সুপ্রচুরভাবে লভ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার পর, তাদের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে ভারতীয় সাহিত্য ও কিছু বিদেশী সাহিত্যের গল্পের বঙ্গীকরণে বাংলা গল্পলোকের রহস্যময় ঐশ্বর্যের বর্ণোজ্জ্বল বিচিত্র দ্বারগুলো খুলে যায়। ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের মতো বাংলায় বাইবেলের খণ্ডিত অনুবাদগুলি বাংলার গল্পসৃজন স্পৃহাকে কতখানি ত্বরান্বিত করেছিল সে বিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। দিগ্‌দর্শন (১৮১৮ খ্রীঃ প্রকাশিত) পত্রিকা থেকে হিতবাদী পত্রিকা পর্যন্ত যে বিরাট কালসীমা তার মধ্যেই বাংলা ছোটগল্পের উজ্জীবন, প্রসারতা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাঠকদের ছোটগল্পের অত্যুগ্র চাহিদা ছিল। সেই চাহিদাই উনিশ শতকের শেষপাদে 'নভেলা' জাতীয় একপ্রকার কাহিনীর জন্ম দিয়েছে যা চূর্ণক, নক্সা, উপন্যাস, ছোটগল্প কোনটিরই বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণ গ্রহণ করতে পারেনি। তবে ঐসব নভেলাগুলি পরবর্তীকালে উপন্যাসের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শণ (১৮৭২) পত্রিকায় কেবল ধারাবাহিক উপন্যাস রচনার বৈপ্লবিক ও আকর্ষণীয় পটভূমি রচিত হয়েছিল তাই নয় পূর্ণচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কতকগুলি ছোটগল্পের প্রকাশে যে সার্থক ভূমিকা নিয়েছিল সেকথা প্রসঙ্গত স্মরণ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী অনেক বেশী উপন্যাসের লক্ষ্মণাক্রান্ত, ছোটগল্পের পূর্বসূরী। বঙ্কিম সমসাময়িক ছোটগল্পগুলির তুলনায় পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-সমসাময়িক ছোট গল্পগুলি অনেক বেশী সার্থকতা অর্জন করেছে। তার কারণ অবশ্যই স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ তার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রভাতকুমার বন্দোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্র-নাথ গুপ্তের সারস্বত-সাধনা খুব বেশী আলোচিত হয়নি, অথচ তখনকার পত্র-পত্রিকায় বিচিত্রতর বিষয়ে অনেক গল্প লিখে পাঠকসাধারণের চাহিদা মিটিয়ে-ছিলেন। অবশ্য ছোটগল্পকে তার নিজস্ব স্বরূপলক্ষণে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন সেই গৌরব-কৃতিত্বের অধিকারী তার সমকালে তো নয়ই, পরবর্তীকালেও সেই উত্তরাধিকার নেই বললেও চলে।

ছোটগল্পে রবীন্দ্র-পথ ও পন্থা ভিন্ন গোত্রের। উচ্চতম জীবনরহস্যের সর্ব্বোচ্চ শিল্পকর্ম তাঁর ছোটগল্পে পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্টিপ্রেরণা ও মাসিক পত্রের চাহিদা এই উভয়দিক থেকে তাঁর ছোটগল্পগুলি রচিত। রবীন্দ্রনাথের শতাধিক গল্পের মধ্যে ১২৯৮ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দের অন্তবর্তী সময়ে তিনি ৬৩টি ছোটগল্প লিখেছিলেন। ছোটগল্প গীতিকবিতার সহোদর। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের জীবনানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছোটগল্পে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে যথার্থ শিল্পসুষমা লাভ করেছে। জীবনের খণ্ড-ক্ষুদ্র তুচ্ছতা কিংবা স্মরণ্য অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভূয়মান সত্য সব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছোটগল্পের রীত্যানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের বহির্বিকশিত ও অন্তর্ভাবনায় ধরা পড়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁর গল্পগুলি প্রাণচঞ্চল, দৈন্যহীন, অদ্বিতীয়।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের বিশাল পটভূমিতে যে অজস্র লেখকসম্প্রদায় এবং তাদের জীবন-রহস্য সন্ধানের যে পথ ও পদ্ধতি তা, বহুধাজটিল ও স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষিতব্য। এই পর্বেও দু'টি ভাগ আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর যুগ। এই যুগ-সময়ের মধ্যে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডের যৌনবাদ ও মার্ক্সের দ্বন্দ্ববাদ বাংলা কথাসাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্র-গল্পে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিকাশ তথা মানবমনের গূঢ়ৈষণা ও জটিলতাগুলি দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ছোটগল্পের পথিকৃৎ। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প উপন্যাসের তুলনায় নিতান্তই স্বল্প। তিনি তাঁর গল্পে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির দিকে জোর না দিয়ে সামাজিক জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও স্বরূপকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'মহেশ', ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দুটিতে মানবিকতা ও আন্তরিকতার অকপট প্রকাশে পাঠকমনে সেগুলি সুচিরস্থায়ী।

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন সময়টিতে ভারতীয়

চিন্তা-চেতনায় রাষ্ট্রনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, নৃতাত্ত্বিক এমনকি সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পুরাতন দর্শণ, মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণায় চিড় ধরে। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে আর্টের চিরন্তন প্রতিমান ভেঙ্গে যায়। উনিশ শতকীয় য়ুরোপীয় শিল্পবিপ্লব ও শ্রমবিপ্লবের প্রভাব এসে পড়ল আমাদের দেশে। ছোটগল্পে নবজাগ্রত মানবতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যাঞ্জনাধর্মী জীবনজিজ্ঞাসা ইত্যাদি উপপাদ্য হয়ে উঠল। য়ুরোপীয় স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ান গোষ্ঠীর সাহিত্যের প্রভাব তিরিশের দশকের ‘কল্লোল’, ‘বিচিত্রা’ ও ‘কালিকলম’ গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের চিন্তাধারায় অভিঘাত এনেছিল সন্দেহ নেই। এই পর্বের গল্পকাররা হলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, প্রেমাঙ্কুর অতিথী, শৈলজানন্দন মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ও একটা ভিন্নধর্মী অধ্যাত্মতাৎপর্য বিভূতি-ভুষণ বন্দোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে আমরা পাই। মানিক বন্দোপাধ্যায় নিজেই একটা স্বতন্ত্র ‘স্কুল’ বা গোষ্ঠী। তাঁর গল্পসংগ্রহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘মাটির মাশুল’, ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’,. ‘ফেরিওয়ালা’, ‘লাজুকলতা’ প্রভৃতি। সমাজ বাস্তবতা, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মানুষের জীবনযুদ্ধ, শাসকশ্রেণীর শোষণ ও অবদমনের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের কথা তাঁর ছোটগল্পে বিশেষ প্রাণ যুগিয়েছে।

স্বাধীনতালাভ ও স্বাধীনোত্তর পর্বের সামাজিক পটভূমিতে বঙ্গবিভাগ ও উদ্বাস্তু বা ছিন্নমূল মানুষের মানসিক হতশ্বাস ও ভাঙন তৎকালীন ছোটগল্প-গুলিতে সুস্পষ্ট প্রতিফলন ফেলেছে। এই সময়ের প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও বিপর্যয় ছোটগল্পের বিষয়ীভূত হয়েছে। জগদীশ গুপ্তের গল্প আমাদের উক্ত মন্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে। সুবোধ ঘোষ তাঁর তীক্ষ্ন বিশ্লেষণী শক্তিতে ও মুন্সিয়ানায় মানবমনের গূঢ়-গহন রহস্যালোককে উদ্ঘাটিত করেছেন। জগদীশ গুপ্ত থেকেই ছোটগল্পে একজাতীয় নব্য-বাস্তবতা শুরু হয়েছে। এই বাস্তবতায় কখনও বহির্মুখীন তীক্ষ্নতা, কখনও বা অন্তর্মুখীন তীক্ষ্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে নবেন্দু ঘোষ তাঁর গল্পগ্রন্থ ‘মানুষ ও পাপুই দ্বীপের কাহিনী’তে শোষক ও শোষিতের পারস্পরিক দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের মূল্যায়ণ করেছেন।

মনোবিশ্লেষণ ও মানুষের অন্তর্জীবনকে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাঁর ‘সোনার চাঁদ’, ‘নীল রাত্রি’, ‘আর লার পাখি’

প্রভৃতি গল্পে একই সঙ্গে জীবনাসক্তি এবং তার অন্তঃস্তলশায়ী নির্মোহ নিরাসক্তির পরিচয় আমরা পাই। মানিকের বিশ্লেষণী পদ্ধতি জ্যোতিরিন্দ্রে সংহত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোট গল্পের ধারায় সমাজ ও জীবনের ওপর গভীর আলোকপাত করে শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে পেঁাচেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। তাঁর গল্পগুলি আঞ্চলিকতার প্রভাব পরিপুষ্ট। আঞ্চলিকতা ব্যতিরিক্ত নগরজীবনেব আভ্যন্তরিক জীবনের ছবিগুলি তুলতে প্রয়াসী ছিলেন সুশীল জানা, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। মনোবিশ্লেষণকে আত্মজৈবনিকতার দৃষ্টিতে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ এবং মধ্যবিত্তিক আত্মজৈবনিকতা সামাজিক ভাঙনের টানা-পোড়েনে বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত হয়েছে বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী ও সমরেশ বসুর কলমে। রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' একটি অসাধারণ গল্প। সমরেশ বসুর অসংখ্য গল্পের মধ্যে 'আদাব', 'জোয়ার ভাটা', 'কিমলিস্' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিমল করের 'আত্মজা' গল্পটির চিরগুনত্ব সর্বজনস্বীকৃত। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সাহিত্যের বিচিত্রের ইজম্ ও সিজম্ থেকে নিজেকে দূরত্বে রেখে মূলত সৌন্দর্যবাদীর দৃষ্টিতে মানবজীবনের নানা কৌণিক বিন্দুতে আলোকসম্পাত করেছেন। আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প-গুলির সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সমস্যা-সংক্ষোভকে ঋজু সাবলীলভাবে ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন প্রতিভা বসু। তাঁর বিশিষ্ট গল্পের মধ্যে 'উৎস', 'প্রতিভূ', 'নিখাদ সোনা' প্রভৃতির উল্লেখ করতেই হয়। লেখিকাদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যায় অনেক বেশী ছোটগল্প লিখেছেন। মধ্যবিত্তিক সমাজ-জীবন তাঁর ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আকর্ষণীয় গল্পরস আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পেঁাছে দিতে সাহায্য করেছিল।

ছোটগল্পকার হিসেবে শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের আলোচনা খুব একটা চোখে পড়ে না। ছোটগল্পের বিষয়গুলি তাঁর কলমে যেরূপ জীবন্তভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে তৎসমসাময়িক অন্য কারও রচনায় তা' দুর্লভ। নিসর্গ-প্রকৃতি ও অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ তাঁর গল্পের প্রধান বিষয়। উল্লেখ্য গল্প হল 'মৎস্যকন্যা', 'সাগর-বলাকা', 'মাটি' প্রভৃতি। এই পর্যায়ের গল্পে অতুলনীয় জীবন-স্বচ্ছতা পরবর্তী সময়ে সমরেশ বসুর মধ্যে প্রাপ্তব্য। বিমল মিত্র ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেলেও ছোটগল্পে তাঁর অসাধারণত্বের কথা বিস্মৃত হবার নয়। প্রসঙ্গত 'ঘরণ্ডী', 'শয়তান', 'লালনেশা', প্রভৃতি গল্প

স্মরণ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি পঞ্চাশের দশকে লিখিত।

ষাটের দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখেরা বাংলা ছোটগল্পকে ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রেখেও নৈর্ব্যক্তিক সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা-বেদনার মধ্যে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় পঁচিশটি গল্পগ্রন্থ থেকে আলাদাভাবে কোন গল্পের বিচার সম্ভব নয়। তাঁর গল্পের চরিত্ররা নিজেরাই কাহিনী তৈরী করে নেয়। তাঁর জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য 'গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প', 'প্রতিশোধের একদিন', 'শাজাহান ও তার নিজস্ব কাহিনী' ইত্যাদি। আমাদের অন্তর্জগতের সুখ-দুঃখকে কখনও বা নস্টালজিক প্রক্রিয়ায়, কখনও বা প্রতীকধর্মিতায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের কাহিনীতে উপজীব্য করে তোলেন। 'আমাকে দেখুন', 'উত্তরের ব্যালকনি', 'কার্যকারণ' প্রভৃতি গল্পে তাঁর অসাধারণ জীবনোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রহস্যময়তা ও তীর্যক বিদ্রূপ বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রাণ। গ্রামবাংলার খণ্ড-ক্ষুদ্র জীবন ও চরিত্র নিয়ে তিনি ভিন্ন আঙ্গিকে ছোটগল্প লিখে একদা আলোড়ন তুলেছিলেন।

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায় এখনও তাঁর জনপ্রিয়তা হারান নি, সম্প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন প্রকাশে সেকথাই প্রমাণিত হয়। গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক-সাযুজ্যে এই ধারায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ও অসাধারণ কৃতিত্ব স্থাপনা করেছেন। মনুষ্যেতর প্রাণীও তাঁর গল্পে সচেতন রূপারোপে অনিবার্যভাবে সংলগ্ন হয়ে পড়েছে। হাস্যপরিহাসে তিনি ও বরেণ গাঙ্গুলী যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চন্দনেশ্বরের মাচান তলায়', 'হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী', 'তুষার হরিণী' প্রভৃতি গল্প বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে নিঃসন্দেহে ঋদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের অবহেলিত অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে পরিবর্তনমুখী মননশীল গল্প লিখে এবং তার সঙ্গে বৈপ্লবিক রাজনীতির যৌগপদ্য মিলন ঘটিয়ে মহাশ্বেতা দেবী লেখকশ্রেণীর মধ্যে ইতিমধ্যে অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করে ফেলেছেন। তাঁর 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প' সংকলনটি সত্তর দশকের বাংলা ছোটগল্পে এক অসাধারণ সংযোজন। সত্তর দশকের পূর্ববর্তী লেখাগুলির তুলনায় তাঁর পরবর্তী সময়ের লেখাগুলির ভাষা, বক্তব্য ও গল্পরস অনেক বেশী তীক্ষ্ণ ও জোরালো। তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গঠনমুখী রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ঔজ্জ্বল্যে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নগরজীবনকে ছোটগল্পের বিষয়রূপে

প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে বাংলার প্রত্যন্ত সমাজের—তাদের আচার-আচরণ, ব্রত অনুষ্ঠান, মানসিকতা ইত্যাদির অনেক গভীরে ডুব দিয়েছেন। 'একালের ছোটগল্পে' সংকলিত তাঁর উল্লেখ্য গল্পগুলি প্রাপ্তব্য। তাঁর গল্পের ব্যঞ্জনাধর্মিতা গভীর ও মননশীল। তাঁর 'গোঘ্ন' গল্পটির কোন তুলনাই হয় না।

খেলাধুলাকে পটভূমি করে মতী নন্দীর লেখা গল্পগুলি পাঠকের কাছে নতুন রসের সন্ধান এনে দিয়েছে।

এই পর্বে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন প্রফুল্ল রায়, দিব্যেন্দু পালিত, নিমাই ভট্টাচার্য, শংকর, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। গল্পের ঘোরপ্যাঁচ নাটকীয়তাকে বাদ দিয়ে সোজা-সুজি গল্প বলা এবং গল্পের চরিত্রগুলি নির্মাণে যিনি ওস্তাদ তিনি হলেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর বাংলার ভৌগোলিক সীমানা কখনও কখনও অভিন্ন বাংলাকেই বোঝায়। তাঁর গল্পের আঞ্চলিকতা সজীব, সুন্দর ও গল্পকারের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। 'রাজা যায় রাজা আসে', 'মাঝি', 'বাঘ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। বিশিষ্ট গল্পসংগ্রহ—'সাতঘরিয়া'। দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে কেবল-মাত্র নাগরিক জীবনের বেদনা-হতাশা নিঃসঙ্গতাই ধরা পড়েনি ; সব মিথ্যাচারের ও দুঃখের উর্ধ্বে জীবনের প্রতি সদর্থকতার দিকগুলোও উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর 'প্রিয়জন' কিংবা 'শুক্রে শনি' গল্পগ্রন্থটি পড়লে সেই কথাই অনুমিত হয়। গল্পের সপ্রাণ ব্যঞ্জনাময় চমক বা দ্যুতির লক্ষণ দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্পের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে। নিমাই ভট্টাচার্য নাগরিক জীবনের গল্পকার। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নিসর্গ প্রকৃতি একটা ভিন্ন মাত্রা যোজনা করেছে। শংকরের গল্প উচ্চবিত্তকেন্দ্রিক, বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসে ঠাসবুনোট ও আকর্ষণীয়। বুদ্ধদেব গুহের গল্পে রোমান্টিক-কতা ও অরণ্যচারিতা প্রকট।

দেবেশ রায়ের গল্পে শোষিত-নিপীড়িতের কথাই অধিকতর মাত্রায় স্থান পেয়েছে। এই পর্বে অসীম রায়ের গল্প রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলিকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর কিছু গল্পে আন্দোলনভিত্তিক সচেতনতার দাবী করতে পারেন।

সত্তর দশকের শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শাস্ত্ররীতির ছোটগল্পের মধ্যে যথার্থ মুক্তি খুঁজে পায়। অধুনাতম ছোটগল্পের আন্দো-

লনের মধ্যে বিচিত্রতর পথ ও পন্থার আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন তরুণ লেখকেরা। কিন্তু ছোটগল্প তার গল্পরসেই সার্থক হয়েছে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে ঘিরে একটা ছোটগল্পের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ফল-পরিণতি কিছু নতুন গল্পকারের জন্ম দিয়েছে। হাংরি/আংরি আন্দোলন, নিম'না-সাহিত্য প্রভৃতি আন্দোলন সাহিত্যভাবনাকে নতুন করে ভাবিয়েছে; কিন্তু ঐসব আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নতুন কিছু পেয়েছি বলে মনে হয় না। হাংরি জেনারেশনের প্রবক্তা-দের মধ্যে বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা' এবং নিম সাহিত্যের প্রবক্তাদের মধ্যে মৃণাল বণিকের 'রাডার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'এই দশক' পত্রিকাকে ঘিরে যেসব নতুন লেখকদের আমরা পেলাম তাঁরা হলেন শেখর বসু, রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, বলরাম বসাক, সজল বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণ সেন, আশিস ঘোষ, সুনীল জানা, অতীন্দ্রিয় পাঠক, অমল চন্দ প্রভৃতি। স্বাধীনোত্তর সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙনকে তাঁদের ছোটগল্পে ভিন্নরীতি বা প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করে একটা চমক সৃষ্টি করেছিলেন। সেই চমকদ্যুতি বিচ্ছুরিত গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নতুন স্বাদ ও মেজাজ এনে দিয়েছে।

নক্সালবাড়ীর আন্দোলন যাঁদের ছোট গল্পে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্ণ মিত্র, সরোজ দত্ত, নবারুণ ভট্টাচার্য, অভিজিৎ সেন, জয়ন্ত জোয়ারদার প্রভৃতি।

শেখর বসু 'মাঝখান থেকে' গল্পগ্রন্থে সত্তর দশকের মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। রমানাথ রায়ের 'বিদ্যাসাগর ও ভানু পাল' 'নুটুর পৃথিবী', 'রামরতন সরণি', 'হৃৎপিণ্ড' প্রভৃতি গল্প সে সময় পাঠকসমাজে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। মানুষের নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতার হাহাকার কল্যাণ সেন তাঁর গল্পে নস্টালজিক মুডে অসাধারণভাবে সনাক্ত করেছেন। উল্লেখযোগ্য গল্প 'পরিত্যক্ত পান্থশালা ও তারা চারজন', 'অমলের দুপুর', 'জীবন যখন', 'দিনযাপন', 'কলকাতা-৭১' প্রভৃতি। সুব্রত সেনগুপ্তের 'জন্মরোধ কেন' একটি বিতর্কিত গল্প। এই পর্যায়ে বাণীব্রত চক্রবর্তী, আশিস ঘোষের নামও উল্লেখের দাবী রাখে। পরবর্তীকালে সুবিমল মিশ্র প্রথাবিরোধী কতকগুলো গল্প লিখে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জীবন সংগ্রামের ইতিহাসকে চেতনার কাছেপিঠে রেখে বাস্তমানুষের গল্প শুনিয়েছেন শৈবাল মিত্র ও শচীন দাশ। শৈবাল মিত্রের 'আতর আলীর রাজ সজ্জা' এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'মা বলিয়া ডাক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে তুলসী সেনগুপ্ত, মিহির মুখোপাধ্যায়,

সমীর মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, সমীর রক্ষিত, শংকর বসু, সমরেশ মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভিন্নধর্মী ভাবনায় অভ্র রায় কতকগুলি গল্প লিখেছেন। 'এখন হৃষিকেশ', 'তারকজীবন লাহিড়ীর আত্মদর্শন' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখ্য গল্প।

বর্তমান সময়ে সরস গল্পের ধারায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং তারাপদ রায় বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর পূর্ববর্তী গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, পরিমল গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষ প্রভৃতির তুলনায় বিষয়বৈচিত্র্যে উভয়েই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত। পূর্ববর্তীদের গল্পরসের তুলনায় জীবনাভিজ্ঞতার জারক রসে এঁরা গল্পগুলিকে সঞ্জীবিত করতে অধিকতর উৎসাহী।

প্রেম-মনস্তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন কণা বসু মিশ্র, নবনীতা দেব সেন, বাণী বসু তাঁদের গল্পে। কঙ্কাবতী দত্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়ী লেখিকা। বাংলা ছোটগল্পে কমলকুমার মজুমদার ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। কমলকুমারের গল্পের পটভূমি লৌকিক-অলৌকিকে মেশানো, কখনও কিছুটা দুর্বোধ্য, তুলনায় অমিয়ভূষণ বাস্তববাদী, ইতিহাসসচেতন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক জগতের রহস্যময়তাকে বিশ্বপটভূমিতে উপস্থাপিত করে একপ্রকার নাগরিক স্বাতন্ত্র্য দেখাতে চেয়েছেন। কয়লাখনির মজদুরদের সংগ্রামী জীবনকে নিয়ে বেশ কিছু নতুন স্বাদের গল্প রচনা করেছেন প্রফুল্ল সিংহ।

সত্তর দশকের বিশিষ্ট ধারায় আরো অনেক নতুন গল্পকারের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সুব্রত নিয়োগী, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, শম্ভু চক্রবর্তী, চণ্ডীমণ্ডল, প্রভাত চৌধুরী, কল্লোল মজুমদার, রাধানাথ মণ্ডল প্রমুখ। আশির দশকে সমাজ বাস্তবতার নিরিখে সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্ব সংগ্রামের কথা নিয়ে যাঁরা গল্প লিখে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভগীরথ মিশ্র, কানাই কুণ্ডু, অমর মিত্র, শিবতোষ ঘোষ, অনিল ঘড়াই, সৈকত রক্ষিত, নলিনী বেরা প্রমুখ। গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পটভূমিতে এঁদের গল্পগুলি স্বতন্ত্র মূল্যায়ণের দাবী রাখে। গ্রামীন জীবনের প্রতি মমতাকাতরতা ও দৌর্বল্যের সঙ্গে একপ্রকার সৌন্দর্যানুভূতি মিশিয়ে গল্প লিখে চলেছেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, আবুল বাশার, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সুতপন চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার বসু, তীর্থঙ্কর নন্দী, উদয়ণ ঘোষ, উদয় ভাদুড়ী, কমল চক্রবর্তী, অশোক সেনগুপ্ত প্রমুখ। এঁদের গল্প উদ্দেশ্যমুখীন অথচ নৈর্ব্যক্তিকতায় শিল্প সৌকর্যমণ্ডিত।

সময় থেমে থাকে না, বাংলা ছোটগল্পও এক জায়গায় থেমে নেই। গল্পে রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথ থেকে গল্পকারেরা সব লাক্ষণিক গুণগুলো স্বীকার করে নিয়েও প্রয়োজনানুগ গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসন্ধান করে চলেছেন, বড়ো কথা তাঁরা মাঝে মাঝে পাঠকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনাদের ক্ষমতাকে যাচাই করে নিচ্ছেন। গল্প লেখা ও প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আলোচনা হচ্ছে, সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। এটি শুভ লক্ষণ।

আমাদের সমালোচকরা নব্য সৃষ্টিকে একটু দূর থেকে দেখতে ভালবাসেন, কালের প্রেক্ষাপটে যাচাই করে নিতে চান। সেই দিক থেকে হয়তো নয়, তবু নব্য সৃজ্যমান লেখাগুলির আলোচনায় কিছুটা যেন ভাঁটা পড়েছিল ; সুখের বিষয় বাংলা সাহিত্যালোচকরা সেই দুর্মর কুসংস্কারকে ইদানীং কাটিয়ে উঠেছেন। বাংলা ছোটগল্পের আলোচনা কবিতার থেকে কম হয় এই অভিযোগ সত্যি ! ছোটগল্প যেহেতু কবিতার দোসর সেহেতু এই দুটি শিল্পপ্রকরণের সমানুপাতিক আলোচনা বাঞ্ছনীয়। ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের সুয়োরাণী, তার জয় অনিবার্য।

পাঠকের চোখে

গল্পময় পাঁচ বছর

মধুছন্দা সেন

বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে পত্র-পত্রিকায় ছোটোখাটো মন্তব্য ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে ছোটগল্প নিয়ে ইদানীং বেশ নাড়াচাড়া হয়ে থাকলেও এ'বিষয়ে অনেক কিছু ভাববার ও বলবার অবকাশ আছে। যারা গল্পের সাধারণ পাঠক, বিদগ্ধ সমালোচক ন'ন, তাদেরও অনেক প্রশ্ন অনুত্তরিত রয়েছে। তাঁরা এখনও জানেন না কোথায় আত্ম-প্রকাশ করছে সেই সব কালজয়ী আধুনিক গল্প যা সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাবে না, অনুভূতিকে মথিত করে পাঠকের অজ্ঞাতেই আত্মা'র আত্মীয় হয়ে যায়। এত অসংখ্য গল্পের ভীড়ে কোথায় তেমন গল্প? কিছু স্বতন্ত্র জীবনানুভূতি, নবীন চিত্রকল্প, ভিন্নতর ভাষা শৈলীর উজ্জ্বল দীপ্তিমান কিছু সম্পদ্ কিংবা লেখকের কোনও বিশেষ বক্তব্যের শিল্পিত প্রতিভাষ, এই কি এ'কালের ছোটগল্প। কোথায় সেই মানব সত্তার নিবিড় উন্মোচন যা বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা', 'তালনবমী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ডাকাতের মা', তারাশংকরের 'অগ্রদানী', বিমল করের 'জননী', সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার', মহাশ্বেতার 'স্তনদায়িনী' প্রভৃতি গল্প কোনও বিশেষ কালের সঙ্গে চিহ্নিত না হয়েও শুধু অন্তর-সম্পদে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছোটগল্প নিয়ে মুদ্রিত অক্ষরে কিছু সমালোচনা, পণ্ডিতজনের জটিল ব্যাখ্যা ও কিছু-কিছু গল্পকারের নিন্দাস্তুতি এ'কালের ছোটগল্প'কে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। সাধারণ পাঠক এখনও হালের ছোটগল্পের চালচলন বুঝে উঠতে পারেনি এবং অতিসাম্প্রতিক গল্প সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আশান্বিতও হতে পারেনি তাই আবার আলোচনায় বসতে হয়। গত পাঁচ বছরের কিছু গল্প নেড়েচেড়ে দেখলে আমরা হয়তো এ'ব্যাপারে খানিকটা হদিস পেলেও পেতে পারি।

বিগত পাঁচবছরের সময়টাকে রাজনৈতিক বা সামাজিক দিক দিয়ে মোটামুটি স্থিতাবস্থাই বলা যেতে পারে। এইরকম নিস্তরঙ্গ সময়-সলিলে হঠাৎ একটা বড় রকমের জোয়ার আসার সম্ভাবনা কমই থাকে, বরং গতিরোধের আশঙ্কাই থাকে তবু প্রবহমান সময় সততই স্বমহিমায় বিরাজিত। ছোটগল্পেও তার প্রতিফলন অনিবার্য, তাই পাঠক সর্বদাই প্রত্যাশী।

গত কয়েক বছরের গল্প পড়ে মনে হয় গল্প থেকে গল্পের আখ্যানভাগটা যেন অতি দ্রুত মুছে যাচ্ছে তার বদলে একধরণের গল্পহীন বৌদ্ধিক—আত্মস্থ গল্প ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। যদিও গল্প লেখার কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলী বা ধরাবাঁধা ছক নেই। তার একটা কাহিনীমূলক সরস আবেদন আছে, আছে বলেই তাকে অন্যান্য সাহিত্যপ্রকরণ থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই গল্পরসের ঘাটতি ইদানীং খুব চোখে পড়ে। ছোটগল্পে এখন গদ্যের ঋজুতা, বুদ্ধির দীপ্তি যতটা আছে প্রসাদগুণ ততটা নেই, অথচ ছোটগল্পকে হতে হবে কমলালেবুর কোয়ার মত, বহিরঙ্গেও যেমন নিটোল, মোহময়, অন্তরেও তেমনি রসে টইটম্বুর। এই দুই'য়ের সমন্বয় গত পাঁচবছরে খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

এ'কালের গল্পে যে ব্যাখ্যাহীন অস্থিরতা, গত্যন্তরহীনতা ও নৈরাশ্যের ছোঁওয়া লেগেছে তাও এতই আরোপিত যে পাঠক তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনা। পড়লেই বোঝা যায় গল্পকার কোন্ মানসিকতায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কলম ধরেছেন। আসলে স্ফুরণের যে আর্তি লেখককে গল্পের শেষ পর্যন্ত তাড়া করে ফেরে সেটাই অনুপস্থিত। গল্প লেখার আগে লেখকের ভাবনায় এমন একটা বিস্ফোরণ হওয়া দরকার যার বহিঃপ্রকাশ না ঘটলে লেখকের মুক্তি নেই। বিন্যাস কৌশল কিংবা ভাষার দক্ষতা তার পরের কথা, সেটা অভ্যাসের দ্বারাও আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু সংবেদনশীলতা প্রতিভার ব্যাপার—সেটা যার আছে সেই হবে কবি, লেখক বা গল্পকার। সেই প্রতিভাই লেখকের অনুভূত সত্যকে পাঠকের কাছে সত্যে রূপায়িত হয়। আধুনিকতা কি এই প্রতিভাকে অস্বীকার করে? পাঠকের এমনতরো কত প্রশ্ন!

সমকালীন তরুণ লেখকরা বড় তাড়াহুড়ো করে সংঘর্ষ, রাজনীতি, দলাদলি, নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণা প্রভৃতির এক-একটা 'ইনডোর সেট' তৈরী করে ফেল্লেন, সাধারণ পাঠকও বুঝে-গেলেন যে এই আত্মমগ্ন তরুণ লেখকেরা তীরে দাঁড়িয়ে তরঙ্গের উন্মত্ততা লক্ষ্য করেছেন। নিজে জলে নামেননি, বুক দিয়ে ঢেউ রুখবার চেষ্টাও করেননি। গল্পগুলি সময়ের স্বাক্ষর হয়ে রইল

বটে তবে গল্প হতে পারলো না। তাই কত গল্প পড়া হয়ে গেল, একটাও মনে থাকলো না। গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এ'কালের গল্পলেখকেরা জীবনের মধুর মুহূর্তগুলিকে ধরতে পারছেন না। সাম্প্রতিক গল্পের পটভূমি থেকে আজ নির্মমভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও বিচিত্র অনুভূতি—'প্রেম'। সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, শীর্ষেন্দু, দিব্যেন্দু পালিত প্রভৃতির গল্পে এক সময় যে রোমান্টিক অনুভূতি ও অপরিমেয় তারুণ্য ঝিকিয়ে উঠেছিলো তাকে বহতা রাখার সার্থকতা কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। পাঠকের এ সকল অনুসন্ধিৎসার নিরসন করবেন ভাবীকালের গল্পলেখকেরা।

গল্পময় পাঁচবছরের বিরুদ্ধে পাঠকের যত অভিযোগই থাকুক না কেন একথাও অনস্বীকার্য যে এই সময়ে আমরা বেশ কিছু রসোত্তীর্ণ সার্থক গল্পও পেয়েছি। অনেক বিচিত্রধর্মী অত্যাশ্চর্য গল্প আমাদের মুগ্ধ করেছে। অনেক কাহিনীকার সম্পর্কেই আমরা গভীর আশান্বিত। হাল আমলের ছোটগল্প সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সমরেশ মজুমদারের কথা এসে যায়। যদিও তিনি দশবছর আগে থেকেই সমধিক পরিচিত কিন্তু গত পাঁচবছরেই পাঠক তাকে পরিপূর্ণ ভাবে পেয়েছেন। তার প্রতিটি গল্পই এক-একটি নতুন অভিজ্ঞতার আলোয় উদ্ভাসিত। মনে পড়ছে কিছুকাল আগে 'দেশে' প্রকাশিত তাঁর একটি গভীর যন্ত্রণাকাতর গল্প—'উনুনের খেলা'।

পাঠককে এরকম বেদনাহত, লজ্জায় অধোবদন করে দেওয়া'র ক্ষমতা একালে খুব কম লেখকেরই আছে। সমর্থ তরুণ লেখকেরা তাঁকে যেমন অগ্রজও মনে করবেন তেমনই দিশারীও মনে করবেন। তাঁর গল্পে দেখতে পাই কেমন করে কোনোও সৎ অনুভূতিকে আঙ্গিকের কারাগারে বন্দী না রেখে মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়িয়ে দেওয়া যায়। নতুন গল্পকারকে যদি পাঠকের আরও কাছাকাছি যেতে হয় তাহলে তাকে আরও আন্তরিক আরও পরিশীলিত হতে হবে। যেমন হয়েছেন ভগীরথ মিশ্র। পাঁচমিশালী লেখার মধ্যেও ভগীরথ মিশ্রের লেখা স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

আঞ্চলিক গল্পের ঘোর আকালের দিনে তাঁর গল্পগুলি যেন এক-একটি হরিৎ-প্রান্তর। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেমনই অকৃত্রিম তেমনই নির্ভরযোগ্য। চেনা জগতের মানুষের এমন চাতুর্যবিহীন রূপায়ণ খুব কমই চোখে পড়ে। আরও উন্নতমানের গল্প লিখতে হোলে তাঁকে হতে হবে আরও মিতবাক্ এবং আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সতর্ক। এই ভাষার ব্যবহার

কোথাও-কোথাও মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গিয়ে রসবিচ্যুতি ও ভাবের ছন্দপতন ঘটিয়ে দেয়। আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে মহাশ্বেতা দেবী এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, উনি জানেন কখন কার মুখে ঠিক কতটুকু আঞ্চলিক ভাষা আরোপ করে সাহিত্যের দাবীতে মূল ভাষাকে ঠিক-ঠিক বহতা রাখা যায়। সেই সঙ্গে অল্প কথায় অনেক গভীর ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাও তার অপরিসীম। এই কৌশল সমকালীন লেখককে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। নতুন লেখকদের কোনোও-ভাবে আহত না করেও বলা যায় যে তরুণ বয়সে নিজের লেখা প্রতিটি ছত্র-ই অতি তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক মনে হয় কিন্তু এটাও তো ঠিক যে গল্পের মধ্যে একটা অনুক্ত অভিব্যক্তিও থাকে যেটা লেখা হয় না, অনুভব করা যায় আর সেটাই লেখকের উৎকর্ষতা। এজন্যই আত্মসমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে তাকে যেতেই হবে নাহ'লে চরম আত্মতুষ্টি তাকে একসময় কোনঠাসা করে দেবে। আঞ্চলিক গল্পপ্রসঙ্গে অনিল ঘড়াইয়ের গল্পগুলি মনে পড়বেই। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় তিনি গ্রাম-বাংলাকে মনে প্রাণে অনুভব করেছেন এবং সার্থকভাবে গল্পে তা রূপায়িতও করেছেন যদিও অতিভাবালুতা ও গতানুগতিকতা থেকে তিনি এখনও মুক্ত হতে পারেন নি। তার টান-টান ছিলার মত ভাষা, বিচিত্র সুন্দর উপমা ও খুঁটিনাটি বর্ণনা এক কথায় অপূর্ব। সমকালীন গল্পের এই 'রণ-পা পুরুষ' যদি তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যেতে গিয়ে হোঁচট না খান, ধীর-পদক্ষেপে, স্থিতধী হয়ে অগ্রসর হন তাহলে জয় সুনিশ্চিত। গত পাঁচবছরে আমরা আঞ্চলিক গল্প বলতে যা পেলাম তা সর্বাংশেই গ্রামবাংলার শোষিত পীড়িত যুযুধান মানুষের আলেখ্য। প্রশ্ন জাগে আমরা যারা গ্রামে থাকি না, গ্রামের মানুষদের চিনিনা তারা কি এইসব গল্পে প্রতিফলিত জীবনযন্ত্রনাটুকুই গ্রহণ করবো! আঞ্চলিক জীবনযাত্রা কি এতই নেতিবাচক। এর কোনোও ইতিবাচক উপভোগ্য দিক নেই। যেমন ছিলো 'পথের পাঁচালি'তে। নিশ্চিন্দিপুরে হাসিও ছিলো কান্নাও ছিলো। সেই মোহময়ী প্রকৃতির আশ্চর্য আকর্ষণ, তার বনজ গন্ধ চিরকাল স্মৃতিকে আপ্লুত করে। বাস্তব জীবন বড়ই রূঢ় কিন্তু এত অবক্ষয়ী নিশ্চই নয় যে তাকে গ্রহণ করা যায় না কেবল করুণা ও উপেক্ষাই করা চলে। এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে হয় 'যুগান্তর' আয়োজিত আঞ্চলিক ছোটগল্পের ধারাবাহিক প্রতিযোগিতা যেন একটা প্রহসন বিশেষ। এইসব পুরস্কৃত গল্পগুচ্ছে গ্রামও নেই বাংলাও নেই, সাহিত্যও নেই, আছে কিছু তথ্যচিত্র গোছের সাজানো পরিবেশ, অবশ্যই তা প্রতিযোগিতার যাবতীয় শর্ত পূরণ করে।

বরং লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তপন বন্দোপাধ্যায়ের গল্পগুলি আমাদের ভরসা দেয়। উনি কম লেখেন কিন্তু সিরিয়াস গল্প লেখেন। মোটামুটিভাবে আঞ্চলিক লেখক হলেও তিনি একটু ভিন্ন জাতের কাহিনীকার। কোথাও কোথাও তিনি ব্যঙ্গে তীব্র হয়েছেন। কোথাও আবার হয়েছেন কৌতুকে উজ্জ্বল। মনে পড়ছে তার 'আগুনের গল্প'। সরকারী অনুদানের আশায় অপেক্ষমান বুভুক্ষু জনতা'র ভীড়ে কখন যেন আমরাও শামিল হয়ে পড়ি। দাঁড়িয়ে থাকি কিছু একটা পাবো বলে, অ—নেকক্ষণ দাঁড়াই। কিছু পাই না, হতাশ হই, ভেঙ্গে পড়ি, আবার বলবতী আশায় বুক বাঁধে। গল্পের শেষে এক ক্ষুধার্ত শীতকাতুরে বৃদ্ধের আগুন আবিষ্কার আমাদের বাক্‌রুদ্ধ করে।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সে'রকম অভিনব গল্প এখন কমই চোখে পড়ে। তবু মাঝে-মাঝে এ'রকম কিছু গল্প পেয়ে যাই অখ্যাত লেখকদের কাছ থেকেও। কানাই কুণ্ডুর লেখা 'ঝাঁটিশালের সীতামাই' এইভাবেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাগ্যাহত এক গ্রাম্য যুবকের জীবনযন্ত্রণার তির্যক চিত্রের গল্প।

সমাজের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে গল্প লেখার ঝুঁকি অনেক। আরোপিত ঘটনা, কৃত্রিম পরিবেশ, অতি ভাবালুতা ও শ্রেণীসংগ্রামের দুন্দুভি-নিনাদ প্রায়শঃই এই ধরণের গলপ্‌কে ব্যর্থ করে দেয়। নতুন লেখকদের পক্ষে এইধরণের ঝুঁকি নেওয়া খুবই বিপজ্জনক। তবু কেউ-কেউ তা'রমধ্যে সফল হয়ে যান। মানুষের অভিজ্ঞতা যেমন অন্তহীন তার প্রকাশও তেমনি অন্তহীন, ছোটগল্পেরও তাই সংকুচিত হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু নতুন গল্পকারের দায়িত্ব ও বীক্ষণ সম্পর্কে গত পাঁচবছরের রিপোর্ট সন্তোষজনক বলে মনে হয়না। তবু নলিনী বেরা, অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শৈবাল মিত্র, আবুল বশার, উদয়ণ ঘোষ-এবং ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মত বহু আলোচিত ও সমর্থ লেখকদের 'ম্যামেরা ও' বিভিন্ন 'অ্যাঙ্গেল' থেকে জীবনের দৃশ্যাবলী তুলতে সক্ষম হয়েছেন। দেশজ উপকরণকে আঙ্গিক ও বক্তব্যের বৈচিত্র্য দিয়ে না বাঁধতে পারলে গল্পের আসর তেমন জমে না। তেমনি কোনোও চিন্তা, যুক্তি বা তথ্যকে দীর্ঘায়িত করে ফেললেও ছোটগল্পের রসবিচ্যুতি হয়। পদে-পদে পাঠককে হোঁচট খেতে হয়। নতুন লেখককে এ'দিকেও সচেতন হতে হবে। প্রসাদগুণ অনেক সাধারণ গল্পকেও উপভোজ্য করে তোলে। সপ্রতিভ ভাষা ও উপস্থাপনার গুণে পড়তে ভাল লাগে রমাপ্রসাদ ঘোষালের

'শ্মশানি-কটাল' সৈকত রক্ষিতের 'খরা' ও অজয় রায়চৌধুরী'র 'স্বপ্নের জন্মভূমি' যদিও এই ধরণের গল্পের রেশ বেশীক্ষণ থাকে না।

জীবনের সর্বত্রই যখন সুবিশাল চড়া তখন গল্পকারেরও থমকে যাওয়া ছাড়া উপায় কি! অপুষ্টি অনুর্বরতা নতুন প্রজন্মের মজ্জায় মজ্জায়। পাঠকের সে কথাও ভুলে গেলে চলবে না। আর এত আগাছা জন্মাতে দেখলেও আশঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। আগাছা দ্রুত অপসৃত হয়ে যায়। টিকে থাকে শুধু শক্তপোক্ত গাছগুলিই। তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অবশ্যই ছোট-বড় সব সম্পাদককেই নিতে হয়। পাঠক জানে বর্তমান অবক্ষয়ের ধূসর তথ্যচিত্রগুলি অচিরেই মুছে যাবে কারণ মনুষ্যত্বের প্রতি আগ্রহশীল গল্পকার কম হলেও—আছে। পাঠকের অপ্রাপ্তির দুঃখবোধ বরং অন্যদিকে বেশী প্রকট। গভীর মর্মবেদনা অনুভব করি যখন দেখি নতুন প্রজন্মে একজনও সমর্থ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত লেখিকা নেই। এমনকি আশাপূর্ণা মহাশ্বেতার দীর্ঘছায়ার প্রতিভাসও নেই। মুষ্টিমেয় যে ক'জন লেখিকার গল্প ইতস্তত চোখে পড়ে তাদের কেউ শেকড় গাঁথতে পারবেন বলে মনে হয় না। গল্পের প্রতি লেখিকদের এই উদাসীনতা ও অনীহার কারণ পাঠকরা জানতে চান। আরও জানতে চান কেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সমর্থ গল্পকারেরা বড় পত্রিকায় প্রবেশ করেন না! এটা কি তাঁদের অভিজাত নিস্পৃহতা না বড়—সম্পাদকদের পক্ষপাতিত্ব!

বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন অতি প্রাচীন পরম্পরা, তাই পাঁচবছরের ক্ষুদ্র পরিসরে সমকালীন গল্পঅন্বেষণের এই অক্ষম প্রয়াস। আমার অনধ্যায় ও অসমর্থতার জন্য যে এই সালতামামি অসম্পূর্ণ ও অনেকাংশে তথ্যহীন হয়ে রইল সেজন্য আমি সুধীজনের কাছে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী।

শতবর্ষের আঙিনায়

বাংলা ছোটগল্প : একটি মূল্যায়ণ

পরীক্ষিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রশাখা 'ছোট-গল্প' আঠার শতকের প্রথম ভাগ থেকে বিদগ্ধ প্রতিভা-যাদুর স্পর্শে, সময়ের উৎকৃষ্ট পলিতে বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বহতা নদীর মত ধাবমান। বিন্যাসে, আয়োজনে, রুচিতে, মননে, মেধায় আজ শতবর্ষের আঙিনায় এই প্রশাখাটি একক সপ্রতিভ মহীরুহ। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটাতে ছোট-গল্পকে অনেকেই শাণিত অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এটি এমন একটি মাধ্যম যেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মৌল অধিকার আছে। গল্পের দেহবল্লরীকে সাহিত্যে উদ্ভাসিত করার দায়িত্ব একমাত্র লেখকেরই। সময় সচেতন লেখকমাত্রেই সময়কে তুলে ধরেন তাঁদের সপ্রাণ লেখনীতে। গল্প যেখানে সময়কালের দলিল, তা হয়তো ইতিহাসের সাক্ষ্যবাহী মাইল-স্টোন নয়, তবু তার দায়িত্ববোধ ও প্রতিক্রিয়া থেকে যায় বর্তমান ও ভাবীকালের জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে।

সূচনা পর্ব

নব উন্মেষের আলোক ধারায় বাংলা গল্পের বিস্তার এবং সীমারেখা সন্দেহাতীতভাবে প্রসারিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকেই ভিখারিণী বাংলা গল্পকে রাজকুমারীর মর্যাদা দিয়েছেন। কল্লোল যুগের শুরু থেকে বাংলা গল্প সমৃদ্ধশালী হতে থাকে। শৈশব নয়, কৈশোরের চপল চটুলতা কাটিয়ে বাংলা গল্প এখন তারুণ্যের চৌকাঠ স্পর্শ করে। তার কশেরুকা টানটান সাবলীল ; ঋজুতা এবং বিষয় বৈচিত্র্যের বর্ণচ্ছটায় সে এখন সৃষ্টিনন্দন সমৃদ্ধশালী সাহিত্য উপকরণ।

এই মহান শিল্প ধারার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। সাহিত্যের যে কোন ধারাই সতত প্রবহমান। আলোচনা, ভাঙচুর, বিশ্লেষণ, বিষয়গত অভিনবত্ব, চমৎকারিত্ব, ভাষাশৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গঠনগত ও পরিবেশনগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ইত্যাদি কোন ঋদ্ধ-সুস্থ আলোচনাকে এক জায়গায় স্থির থাকতে দেয় না। এটাই ইউনিভার্সাল নিয়ম। ওল্ড অর্ডার চেঞ্জ হয় নিউ অর্ডারের স্থায়িত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। এভাবেই পুরাতন পথরেখা সময়ের কালিতে বিলীন না হয়ে নব-প্রজন্মকে পথ দেখায়। এভাবেই সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে নতুন সাহিত্য জগৎ।

যে কোন বিশ্লেষণাত্মক লেখার ভিত্তিভূমি অ্যাবসল্যুট মেটিরিয়ালস্ যা 'মৌলিক আলোচনার বিষয়' তার উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। সাহিত্য আলোচনা পরিপূর্ণতা পায় সাহিত্য উপাদান এবং সাম্প্রতিক সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চার উপর। এখানে বিষয় যেহেতু 'ছোট-গল্প' এবং সময়কাল শতক কিন্তু পরিসরও সীমিত ; সেকারণে বহু আলোচিত বাংলা গল্পের আদি-পর্বটি শ্রদ্ধায় বিনীতভাবে অনুল্লেখ রেখেই, কল্লোল যুগের গোধূলি লগ্ন-থেকে এই আলোচনার সূত্রপাতে অগ্রসর হতে বাধ্য হচ্ছি।

বাংলা গল্পে রবি কবির আমৃত্যু স্ফূর্তি

রবীন্দ্র ছোটগল্প বাংলা গল্পকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় পেঁছে দিয়েছে, বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় তার স্বর্ণখচিত মুকুটকে আরও উজ্জ্বল করেছে শুধুমাত্র ঘটনার ঘনঘটা বা কাহিনীর নিটোল সৌরভ প্রসাদগুণেই নয়—সেখানে যোগ্য প্রতিভার বিরল সমন্বয় ঘটেছিল কালি কলম মনের ত্রিবেণী-সংগমে। রবীন্দ্র ছোট-গল্প সেই সময়ের বাংলা ছোট-গল্পের নাতিদীর্ঘ ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়েছিল বিশ্ববাসীর কাছে। রবীন্দ্র ছোটগল্পে যে মনোবিশ্লেষণ, ভাষার ঋজুতা, বাক্য ব্যবহারের মাত্রা-বোধ, গঠন শৈলীর ট্রাডিশন্যাল ফর্ম, অলংকারময়তা আমরা দেখতে পাই—তা অতি সাম্প্রতিক কালের গল্পকেও নিষ্প্রভ করে দেয়। রবীন্দ্র-গল্পের প্রতিটি বাক্য যেন একে অপরের জন্য সৃষ্ট, তারা যেন প্রত্যেকেই একটি যৌথ পরিবারের সদস্য। ঘটনার ঘনঘটায় পাত্র-পাত্রীরা নিভৃতে উঠে আসে আপন আপন বক্তব্য, সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে। গল্পের ধমনীতে তখন প্রবাহিত হতে থাকে বিশুদ্ধ রক্ত। মানুষের কাঁচা নিঃশ্বাস এবং সবুজ আত্মপ্রত্যয়ে ভরে ওঠে তাঁর গল্পের বুনিয়াদ। শ্রীহীন নিতান্ত মামুলি ঘটনাও শৈল্পিক শোভায়

তন্বী হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পের সমস্যা জর্জরিত নর-নারীরা, অন্তর্লোকে এবং বহির্লোকের টানা-পোড়েনে প্রাকৃতিক শর্তাবলীকে সযত্নে অনুধাবন করে একটি চরম সত্যে উপনীত হয় যেখানে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মত গল্প পেয়ে যায় নতুন মাত্রা। সহস্র প্রজন্মের বর্ডার পেরিয়ে গল্প হয়ে ওঠে হৃদয়স্পর্শী, কালজয়ী। বাংলা সাহিত্যে এমন কোন বিষয় নেই যেখানে রবীন্দ্রকলম স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেনি। মানবিক মূল্যায়ণ, জীবন সৌকর্য, গ্লানি-হতাশা-পরাজয়, মানসিক অবক্ষয় ও অস্থিরতা সব কিছুই জল-বায়ুর মত প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন গল্পে। তবু মাটির কাছাকাছি যেতে পারেননি বলে রবি কবির আমৃত্যু খেদ, অতৃপ্তি।

তিরিশের আকাশে কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র

তিরিশ দশকের বৈচিত্রময়তা বাংলা গল্পকে এক অনাস্বাদিত জগতের আস্বাদন দিয়েছিল। গল্প হয়ে উঠেছিল জীবনমুখী। বিষয় বৈচিত্র্য সেখানে স্রোতস্বিনী নদী—যার ধারা সততই উৎকর্ষতায় প্রবহমান, কেবল এগিয়ে যাওয়া, নিজেকে নিজের ভেতর ভাঙচুর করা, গড়া আর ফিরে দেখা। এভাবেই বাংলা গল্প-তরণী পালতোলা নৌকার মতো তরতরিয়ে এগিয়ে চলল সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে। এই সময়েই হীরক খণ্ডের মত দামী দামী গল্প পেয়েছি আমরা যা বাংলা সাহিত্যের কাঞ্চন সিংহাসনে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সংযোজন।

এই সময় দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ খরা বন্যা মহামারী দেশ-বিভাগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতির নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিফলন বাংলার জন-জীবনকে ঝড়ের মুখে ঠেলে দেওয়া নৌকোর মত অস্থির, অশান্ত করে তুলেছিল। সময় এবং পরিবেশগত অস্থিরতা, ব্যাধি, সামাজিক শোষণ ও শাসন, রাজনৈতিক অবক্ষয়, বিভিন্ন মতাদর্শে বিভিন্ন আন্দোলনের যে সূত্রপাত ঘটে - সে সবেরই বিক্ষিপ্ত আলোকপাত বাংলা ছোট-গল্পধারাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। 'সাহিত্য সমাজের দর্পণ' এই প্রবাদ-প্রতিম বাক্যটিকে পুনরায় মর্যাদা দিলেন তৎকালীন গল্প লেখকরা। এসব কারণেই তিরিশের দশক বাংলা ছোটগল্প আন্দোলনের বিতর্কিত সময়। এই সময়েই বাংলা গল্পে গ্রাম উঠে এসেছিল তার সবুজ গন্ধ নিয়ে, হাঁসের পালক থেকে খসে পড়া জলের মৃদু শব্দময়তা নিয়ে। তারাশংকর তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে রাঢ়-বাংলার গৈরিক সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন, চিত্রময় করে তুললেন সেই অঞ্চলের জীবনচর্চা, লোকাচার ও অন্তর্নিহিত জীবন-সুষমাকে; যার মধ্য দিয়ে চিরন্তন ভারতীয় জীবন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। তাঁর অসাধারণ

সব গল্পগুলি লোক জীবনের তথ্যচিত্র। সেখানে অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনযুদ্ধ, আধ্যাত্মিকতা, লৌকিকতা আবর্তিত। তারাশংকরের কলম বাংলার 'গণদেবতা'র আশীর্বাদ-ধন্য। তাই তাঁর গল্পগুলি মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ সচেতনতা ও রাজনৈতিক উত্থান পতনের মূল্যবান দলিল।

ঠিক এই ধারায় বিরল আর একটি প্রতিভা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাণিকের গল্পে বাস্তবতা, নির্মমতা. সৌন্দর্য-উৎকর্ষতা এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাবেশ দেখতে পাই। 'প্রাগৈতিহাসিক' থেকে 'কুষ্ঠরোগীর বউ' প্রায় সর্বত্রই এই ঘুণধরা সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি ভেসে ওঠে। পড়লে কখনই মনে পড়ে না তা বানানো, আত্মজৈবনিক আদিম প্রকৃতির নিষ্করুণ কাঠামোয় সাহিত্যের খড়িমাটি লেপা। হয়ত তখন সভ্য জগতের মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নেবে এই ভেবে— 'বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন কঠোর-কঠিন বাস্তব বড় চোখে লাগে' এমন অজুহাতে। লেখক তাঁর কর্তব্য সমাপনে আন্তরিক, মিথ্যে আপোস নয়, মনগড়া 'তুমি আমার আমি তোমার' কাহিনী নয়; ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমী ছেড়ে লেখকের কলম তখন সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের নিটোল চিত্রাংকনে ব্যস্ত। বাংলার জল হাওয়া মাটির স্পর্শে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেধা লালিত হয়েছে, পদ্মানদীর জলে তাঁর মন ভিজেছে, সর্বহারা মানুষের স্পর্শে তার কৈশোর যৌবন উদ্বেলিত, বাংলার ফুল-ফলের সুবাস তাঁর নিঃশ্বাসের প্রতিটি অণুতে সঞ্চরমাণ, তাই সংগত কারণেই তার কলম হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী। ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন তাঁর লেখায় রক্তে হিমোগ্লোবিনের মতো মিশে আছে।

মানব দরদী, প্রকৃতি প্রেমিক কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পে প্রকৃতির অকৃত্রিম নির্যাসকে জন-জীবনের জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। দৈনিক-অভিজ্ঞতা মণি-কাঞ্চন উপলব্ধি সমৃদ্ধ যে ছোটগল্পগুলি তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে আসে সেগুলি বৈচিত্র্য এবং কাব্যময়তায় উজ্জ্বল 'আকর সম্পদ'। মানুষের সুপ্ত কামনা-বাসনা, প্রেম-প্রীতি, কোমলতা-কোঠরতা, ক্রোধ-লোভ-লালসা তাঁর লেখনীতে খুব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। জীবনবোধে উদ্দীপ্ত গল্পগুলির রূপ-রস গন্ধ-বর্ণের আস্বাদনে পাঠকমন তৃপ্ত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

শৈলজানন্দ কয়লা খনির ধূসর জীবন-যাপনকে কালিমার জগত থেকে উৎখাত করে দেখান-বেঁচে থাকার প্রকৃত রহস্য ও সংগ্রামকে। মানুষের

নারকীয় প্রবৃত্তি, ক্ষন্নবৃত্তির রহস্য কিছুই বাদ যায়না তাঁর গল্পে। এভাবে তাঁর কলমের মোহিনীস্পর্শে গল্প পায় নতুন জগতের ঠিকানা। মুখোশের আড়ালে মানুষের শঠতা ও ক্রূরতার যে নগ্নরূপ তা তিনি উদ্ঘাটন করেন খুব সহজ সরলভাবে। শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর কলম বিস্ফোরণ ঘটায়। তাঁর হাতে গল্প হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের দলিল, সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর 'পজিটিভ ফিগার'।

তিরিশের দশকের বেশ কিছু শক্তিশালী গল্প লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা গল্পের রসদ তুলে এনেছিলেন কয়লাখনি, গহন অরণ্য, বস্তির চালাঘর, গ্রাম-গঞ্জের ইঁট ভাটা প্রভৃতি অন্ধকারময় স্থান থেকে, যা বিগত দশকে উপেক্ষিত থেকেছে। এই কারণেই তিরিশের দশক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের লেখকদের গল্পে মানুষের শরীরের ঘাম, চষা-মাটি, এঁদো ডোবা, অসন্তোষ বিক্ষোভ সব কিছুই ঘনীভূত হয়েছিল তাঁদের নিজস্ব মুন্সীয়ানায়। আরোপিত তত্ত্ব কিছু ছিলনা ঠিকই তবে উপর থেকে আলো ফেলে দেখার প্রবণতা কিছু গল্পে প্রকট। যে অন্ত্যজ শ্রেণীকে নিয়ে লেখকরা কলম ধরেছিলেন শক্ত হাতে, তাঁদের অনেকেই ঐসব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন না। গল্প বিন্যাস ও ভাষা প্রয়োগে তাঁদের কোন ফাঁকি না থাকলেও ফাঁক ছিল। ফলে সেই সব গল্পে হৃদয় উত্তাপ, মানবিক লোকাচার আদান-প্রদানে অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক গল্প নয়, বহির্জগতের গল্প—যা শোনাতে গিয়ে অন্যের কথা নিজের মুখে বলার চেষ্টা করেছিলেন তৎকালীন বাংলা ছোট-গল্পের দিক্‌পালরা। ফলে, মধ্যবিত্ত জীবন পুরোপুরি উপেক্ষিত থেকে গেছে—যা পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকারদের সঠিক গাইড লাইন হয়ে ওঠেনি। তবে একথা অনস্বীকার্য, তিরিশের দশকেই রবীন্দ্রমোহমুক্ত গল্প লেখা হয়েছিল যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত করেছিল। যুগপথিক রবীন্দ্রনাথ তাই আশাবাদী হয়েছিলেন, বাংলা ছোট গল্পের স্বর্ণ ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামী', তারাশংকরের 'অগ্রদানী', বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' প্রভৃতি বাংলা ছোট-গল্প যোগ্যতর মর্যাদায় পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন দিতে সক্ষম হয়েছিল। তিরিশের দশক বাংলা গল্পের রূপ-রঙ রীতি পাল্টে দিতে সচেষ্ট ছিল। এই দশকটি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় একটি যুগান্তকারী দশক হিসাবে চিহ্নিত।

উপেক্ষিত 'লেখকদের লেখক' সতীনাথ ভাদুড়ী

সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী', 'ঢোঁড়াইচরিত মানস', ইত্যাদি বিখ্যাত

কালজয়ী উপন্যাসের পাশাপাশি অসাধারণ কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন। সতীনাথের অমর সৃষ্টি 'বৈয়াকরণ', 'ডাকাতের মা', 'রাজকবি', 'সাঁকের শীতল' 'চকাচকী', প্রভৃতি ছোটগল্প আজও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে অম্লান; পূর্নিয়া জেলার পটভূমিতে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, স্বার্থপরতা, অন্তর্দহন তাঁর অধিকাংশ গল্পের উৎস। ১৯৮২ সালে তার শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন প্রকাশিত হলেও বাংলা সাহিত্যের ডামাডোলের বাজারে এই উপেক্ষিত কথাকার আজও 'লেখকদের লেখক'। যাঁরা বিচিত্রধর্মী গল্পপাঠে আগ্রহী সতীনাথ ভাদুড়ী তাদের কাছে অপরিহার্য। বাস্তবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিষয়ের প্রতি বিশ্বস্ত, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, গভীর মনন ও নির্মোহ দৃষ্টির প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ছোট-গল্পের আঙিনায় তিনি অবতীর্ণ হন। বিহারের বিশেষ অঞ্চলের অন্ত্যজ-বাসীর জীবনধারার বাস্তব চিত্র, পরিবেশ সতীনাথের শৈল্পিক দক্ষতায় অবহেলিত গ্রামজীবনের যথার্থ সত্য সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশ শাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র, সরকারী অব্যবস্থা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা, অর্থলোলুপতা, স্বার্থপরতা, রাজপুত, ভূমিহার, কায়স্থ-হরিজন সমস্যা এগুলি পরবর্তীকালের তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্বেষণ : চষামাটি সোঁদা গন্ধ

চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে লেখকরা ছিলেন অতি বেশী বাস্তববাদী। স্পষ্টতা এবং ঋজুতা তাঁদের গল্পের মৌলিক গুণ। টানাটানি নয়, মন কষাকষি নয়, একেবারে ভেতরের সত্যকে বাইরে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়ে দেবার অদম্য প্রবণতা ছিল তাদের। সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি, রাজনৈতিক ভণ্ডামী, গ্রামীণ তথা সামাজিক অর্থনৈতিক অবক্ষয়, শোষণ নীপিড়ন নির্যাতন, ক্ষুধা-জ্বালা হাহাকার, বিক্ষোভ মিছিল সব কিছুই প্রাধান্য পেল তাঁদের লেখায়। প্রকৃতির মত রং বদলাল নিত্য পরিবর্তনশীল গল্প। বঙ্গদর্শনের কাল থেকে আরম্ভ করে ভারতী, বিচিত্রা, কালি-কলম, কল্লোল-এর সময়ে বাংলা সাহিত্যে যে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছিল সেখানে বাংলা ছোটগল্প থেমে থাকেনি, তারও সামানুপাতিক বিকাশ ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যে। সৃষ্টি হয়েছিল কিছু উল্লেখযোগ্য গল্পের, চুলচেরা আয়োজনে।

স্বাধীনতার পরে পশ্চিম-বাংলায় যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল তার বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন সাহিত্যে আলাদা একরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই পর্বের সুরু। এই সময়ের কোন নির্দিষ্ট নাম বাংলা সাহিত্যে তেমনভাবে উল্লেখ নেই। খরা-বন্যা-দাঙ্গা-মানবমনের নৈতিক অবনতি অধোগতি-বিচ্ছিন্নতা-সর্বোপরি ওপার বাংলা থেকে উৎখাত ছিন্নমূল মানুষের ব্যথিত হৃদয়ের কাতর আর্তনাদ-রিলিফ-ত্রাণ বণ্টন নিয়ে দলীয় পক্ষপাতিত্ব কালোবাজারী—এসবই ছোটগল্পের মূল রসদ হিসাবে প্রাধান্য পেল। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পকার হলেন সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, প্রমুখরা। এঁদের লেখায় প্রাধান্য পেল সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর চুলচেরা বিশ্লেষণ। ফলে আধুনিক গল্পের সাথে যোগাযোগ হ'ল নব্যধারার পাঠকের।

বিমল কর তাঁর গল্পে প্রতিষ্ঠা করলেন মানুষের দ্বান্দ্বিক মনকে, পাশা-পাশি প্রাধন্য পেল নর-নারীর আকাঙ্ক্ষিত প্রেম। আবর্তিত সুপ্ত সম্পর্কের জের টেনে নিয়ে তিনি গল্পকে দিলেন আলাদা মর্যাদা। প্রতিদিনের চেনা-জানা গণ্ডীবদ্ধ জীবন থেকে তিনি ছেঁকে তুললেন এমন সব বিক্ষিপ্ত ঘটনা—যেখানে মানুষের নির্লজ্জ বেঁচে থাকা প্রাধান্য পেল। সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত তাঁর গল্পের নিঃশ্বাস। 'আঙুরলতা' এমন একটি বিরলশ্রেণীর গল্প যেখানে সমাজের অপাংক্তেয় শ্রেণী মুখ্য চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাবলীল গদ্য লেখকের অহংকার। কিভাবে মানুষের তথাকথিত দুর্বল জায়গায় নাড়া দিয়ে গল্পকে সার্বজনীন মর্যাদায়, উন্নীত করা যায়—তা বিমল করের প্রতিটি লেখার মধ্যে বিরাজমান। তাঁর 'সোপান', 'আত্মজা', 'উদ্ভিদ', প্রভৃতি গল্পগুলি বিতর্কিত। ব্যক্তি জীবনের মহৎ আদর্শ প্রতিটি গল্পেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শিক্ষণীয় অনেক কিছুই তাঁর গল্পের উপাদান। মধ্যবিত্ত জীবনের সংঘাত, ফাটল, বিরোধ, সমস্যা, অবক্ষয়, শোষণ এসবই বিমল করের গল্পের মৌল উপাদান।

সমরেশ বসু সব অর্থে একজন রাজনীতি ও সমাজ সচেতন লেখক যাঁর লেখার বিষয় বিভিন্নখাতে প্রবাহিত। তাঁর গল্প বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এত বিচিত্র বিষয় আর কোন লেখকের লেখায় উদ্ঘাটিত হয়নি। বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষার মানুষ তাঁর ঐতিহ্যময় লেখনীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সমাজের মর্মমূলে তিনি আঘাত হেনেছেন, দূর করতে চেয়েছেন বৈষম্যের অভিশাপ। বাংলা গল্প প্রসূতিসদন থেকে এখন ম্যারাথন দৌড়ের মাঠে। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গল্প পরিণতির দিকে ঝুঁকে ছিল, সমরেশ বসু বাংলা গল্পকে বিভিন্ন ডায়মেনশনে প্রবাহিত করেছেন যা এর পূর্বে সার্থকভাবে

রূপায়িত হয়নি। 'আদাব', 'পাড়ি', 'ও আপনার কাছে গেচে', 'কিমলিস' ইত্যাদি অনেক গল্পেই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন বড় হয়ে ধরা পড়েছে। জীবনযুদ্ধ সেখানে উপেক্ষিত নয়। সমাজের বিভিন্ন কোণ থেকে উঠে আসা মানুষের নিরন্তর বেঁচে থাকার যুদ্ধকালীন তৎপরতা, শ্রমিক ঐক্যের আন্দোলন, সমস্যা, নির্যাতন, শ্রমিক শোষণ কিংবা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষের জীবন যাপনের ছবি অতি আন্তরিকভাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে গল্পময় হয়ে উঠেছে। সময় এবং পরিবেশ তাঁর গল্পে জেলের মৎস্য শিকারের মত সহজাত যা কখনো বানানো বা অতিরঞ্জিত মনে হয় না। আধুনিক গল্পের রূপকার হিসাবে সমরেশ সকলের অগ্রগণ্য। তার সৃষ্ট গল্পগুলি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। ছোটগল্প রচনায় সমরেশ বসু নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান।

রমাপদ চৌধুরী শহুরে মানুষের জীবনকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন তাদের বাহ্যিক অবয়ব। আশা এবং নিরাশার টানা পোড়েন তাঁর গল্পে ঘনীভূত। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নিভৃত মনের সুপ্ত কামনা-বাসনা, সর্বোপরি মানবতার জয়-পরাজয় তার গল্পগুলিকে দিয়েছে যুগপোযোগী উত্তরণ। এর বাইরেও তাঁর কিছু লেখা আছে যেখানে বাস্তব জীবনের ছবি প্রকট। ঘনায়মান অন্ধকার থেকে তিনি তুলে এনেছেন এমন কিছু স্মরণীয় গল্প যেখানে বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধহীনতা, তাদের বেঁচে থাকা, হতাশা-গ্লানি সব কিছুই লেখকের মনোজ্ঞ সহানুভূতিতে মিলেমিশে একাত্ম।

নিসর্গপ্রিয়তা, প্রকৃতিতন্ময়তা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ঘুরে ফিরে এলেও মানুষ থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন নন। সাম্প্রতিক অস্থির সময় এবং তার প্রভাব অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে উপস্থিত। তাই তাঁর গল্পে ঘুরে-ফিরে আসে সাধারণ মানুষের ক্ষুধা সহিষ্ণুতার কথা। মানুষকে বাদ দিয়ে তাঁর গল্প কখনোই—বিলাসবহুলতার দিকে অগ্রসর হয়নি। হয়ত এই একটি মাত্র প্রসাদগুণে তার গল্প একশ্রেণীর পাঠকের কাছে আদরণীয়।

৫০-এর দশক : নব নিরীক্ষার গল্প

পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে বাংলা গল্প খরার পোড়া ঘাস। একটি অনিশ্চিত অস্থিরতা গ্রাস করেছিল বাংলা গদ্যের বলয়। 'নবনিরীক্ষার' যুগ শেষ হতেই গল্পকাররা প্রস্তুত হয়েছিলেন নতুনভাবে বাংলা সাহিত্যকে কিছু

উপহার দিতে। তাঁরা চেয়েছিলেন বাস্তব থেকে কিছু গিরিমাটি নিয়ে প্রতিমা আঁকবেন। ফলে, ম্যাড়মেড়ে হয়ে গিয়েছিল বাংলা গদ্যের গতি। গল্প হারিয়ে ছিল তার প্রাণবায়ু এবং উজ্জ্বলতা। এই বন্ধ্যা সময়ের নাগপাশ থেকে গল্পকে মুক্ত করতে ষাটের দশকের শুরুতেই এমন কিছু লেখক এসেছিলেন যাঁরা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থাকে মাইক্রোস্কোপিক চোখে তুলে ধরেছিলেন পাঠকের দরবারে। এতে ফল হয়েছিল দুটো। পাঠক জানতে পেরেছিলেন ঘুণধরা সমাজ কাঠামো বুড়ো বেতো ঘোড়ার মত ধুঁকছে। এর মৌল রূপান্তর আশু প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, গল্পকে যে অবশ্যই জীবনমুখী, সমাজমুখী হতে হবে এ বিষয়ে নিশ্চিত একটা ধারণা। গল্পযে কেবল মনগড়া কথার কারুকার্য-খচিত শিল্প নয়, গল্পে যে প্রাণের স্পন্দন অপরিহার্য—এই সত্য উপলব্ধি ষাটের দশকের শুরুতেই বিশেষভাবে ছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, বরেণ গঙ্গোপাধ্যায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, দেবেশ রায় প্রমুখরা ষাটের দশকের গল্পকে দিল এক আলাদা মর্যাদা। এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য সাহিত্য সাজঘরের বাজার পোষাক ছেড়ে কুলি-কামিন জনমজুর ভাগচাষী কিংবা সর্বহারা মানুষের বেশ ধারণ করল। বাংলা ছোট গল্পের গায়ে কৃত্রিমতার যেটুকু সর ছিল তা চেটেপুটে খেয়ে নিল সময়ের পিঁপড়ে। প্রতিনিয়তই গল্প নিল নতুন বাঁক। নতুন ধারায় আবর্তিত হ'ল একটি গদ্য আন্দোলন। কালি-কলম এবং কল্লোল-এর সময়কে ছাড়িয়ে জন্ম নিল আর একটা নতুন সময়। সামাজিক অধঃপতনের ভেতর থেকে অমৃত এবং গরল দুই-ই তুলে আনলেন। যুক্তিও মেধায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। যা তাঁরা করছেন তার সবকিছুই বাস্তব সম্মত। অন্তর্বিশ্লেষণে ভরে উঠল বাংলা গল্পের পাতা। গদ্যের কাঠিন্য দূর হ'ল আংশিক। গদ্যকে সাজান হ'ল জাপানী পুতুলের চেয়েও সুন্দর করে। পাঠক পড়ে মুগ্ধ হলেন, বাহবা দিলেন। কিন্তু তাতে কি এসে গেল? দীন দুঃখিনী বাংলা গল্প তার চৌকাঠ ছাড়িয়ে রাজপথে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার মুখে রক্ত। কিছু লেখক তার দায়িত্ব থেকে সরে গেলেন বহুদূরে—কেননা অর্থপ্রতিষ্ঠানের 'BE ASS AND MAKE ASS'-এর চতুরনীতি তাঁদের শরীর নীল করে দিয়েছে। বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হ'লেন বাংলা গল্পের দিকপালরা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'মনীষার দুই প্রেমিক', 'নদীতীরে' কিংবা 'পলাতক বা অনুসরণকারীর' পথ ছেড়ে নারী শরীরের নগ্নতা উন্মোচনে ব্যস্ত হলেন। কিছু পাঠক চুকচুক করে রস পানে আমোদিত এবং উৎফুল্ল হলেন।

কিছু পাঠকের কপালে হাত। তাঁরা বুক চাপড়ে বললেন, হায়, সুনীল এ আপনি কি করলেন।

প্রতিষ্ঠানের শীতল বাতাস বাংলা সাহিত্যের যে বিশাল ক্ষতি করেছে তার হিসাব এ আলোচনায় নয়। এখানে শুধু একটা কথাই বলার আছে, পেটের জন্য মানুষ চুরি করে, সতীত্ব বিসর্জন দেয়, ভাইয়ের বুকে বিনা দ্বিধায় বসিয়ে দেয় ছুরি—এসবই মানুষের কাজ, মানুষই করে। যেহেতু লেখক সমাজ বহির্ভূত কোন জীব নয়, সেইহেতু লেখক পারেন অসামাজিক কোন কাজের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিতে। এটা তার লিগ্যাল রাইট। লেখকের ব্যক্তি স্বাধীনতায় এখানে বাধা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

সমাজ জীবনের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। তাকে অস্বীকার করলে যে মহাপাপ হয়।

এখানে গায়ে অতার মেখে ভণ্ড তপস্বী সেজে কোন ছলা-কলার প্রয়োজন আছে কি? বাংলা গল্প এখন চানাচুর ওয়ালাদের দখলে। টক ঝাল নোনতা মিষ্টি বিভিন্ন রকম চানাচুরের স্বাদে পাঠক তৃপ্ত করাই যাঁদের একমাত্র বাসনা—তাঁরা লক্ষ্মীর দয়া-দাক্ষিণ্য পেলেও সরস্বতী তাদের প্রতি বিরূপ।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ে ষাটের দশকের সুরু থেকে এ পর্যন্ত যা লিখেছেন তার ৯৫ শতাংশ লেখা বাদ দিলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হবে। ভাল-মন্দের সহাবস্থান নিয়ে মানুষ। ভালকে ছাপিয়ে যদি মন্দের ভাগ জুড়ে বসে তাহলে 'আগে ভাল ছিলাম এখন খারাপ'—এমন অজুহাত সময়ের কষ্টিপাথরে রক্ত বমি করবে। যে কোন সৃজন-শীল ক্রিয়া-কর্মই বড়াই-এর দুধ ফোটান'র মতই। পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগোতে গেলে আরো বেশী সংযমী এবং আন্তরিক হতে হয় লেখায়। জনপ্রিয়তা লেখকের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, অনেক সময় সৎ সাহিত্যের রাজমুকুট কেড়ে নিয়ে পরিয়ে দেয় মিথ্যে দাঁবেদারীর শতছিন্ন মলিন টুপী।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, অসীম রায়, দেবেশ রায়—এঁরা কখনো বাংলা গল্পের মর্যাদা কালিমালিপ্ত করেননি বরং বাংলা গল্পের প্লাস্টার ঘল রূপকে নিজের সংযম সততা এবং সাধনায় উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেছেন। প্রফুল্ল রায় তাঁর গল্পকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিহার বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্তে। সেখানকার মানুষের কথ্য ভাষা তার গল্পকে উর্বর করেছে। কখনও-সখনও তার গল্পে ঘটনার বাহুল্য পাঠককে সুখী করলেও অনেকাংশে ঈষৎ বিস্তারিত এবং একঘেয়ে বিরক্তিকর বলে মনে হয়।

'সাঁতার ও জলকন্যা' শীর্ষেন্দুর আধুনিকতর গল্প সংকলন। এমন গল্প পড়ুতে খারাপ লাগে না কিন্তু এর বাস্তবতা আমাদের যথেষ্ট ভাবিয়ে তোলে। গল্পের ফর্ম, বিষয় ইত্যাদি নিয়ে ষাটের দশকের প্রধানতম গল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এখনও গভীরভাবে চিন্তিত—এটা আশার কথা। তাঁর 'ট্যাংকি সাফ'—এতে প্রচ্ছন্ন জীবনদর্শণ, মানুষের মনুষ্যবোধ, মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয় এবং ক্ষতি'র পুঙখাণুপুঙখ চিত্র আছে তা সর্বাংেই হৃদয়স্পর্শী এবং যুক্তি গ্রাহ্য। নাগরিক জীবন নিয়ে শীর্ষেন্দু যে ভাঙা-গড়া করছেন তা আশাপ্রদ হলেও অনেকক্ষেত্রে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালী রমনী তাঁতের শাড়িতে যত বেশী নয়নাভিরাম শালোয়ার কামিজ বা টাইট জিন্‌সে ততটাই বেখাপ্পা। শীর্ষেন্দুর কাছে অনুরোধ সৌখিন কৃত্রিমতাকে বর্জন করে বাংলা গল্পের মুখে রং না ঘষে তার শরীরে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করুন।

উপেক্ষিত গ্রাম বাংলার আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে নানান অজ্ঞাত বিষয় নিয়ে কিছু অসাধারণ গল্প উপহার দিয়েছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। বিষয় নির্বাচনে সিরাজের অনুসন্ধিৎসু মন এখন আশার আলো দেখায়। হাল্‌কা চটক নয়, বৈচিত্র্যময় বিষয়েয় উপর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পকে কালজয়ী করেছে। দুঃখ হয়, শংকিত হতে হয়—যখন 'গোঘ্ন'-এর মত শক্তিশালী লেখককে থ্রিলার লিখতে হয় বাজার গরম করার জন্য কিংবা পয়সার জন্য।

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের কাহিনী শুনিয়েছেন, নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছেন পশ্চিমবাংলার প্রায় উপেক্ষিত এক শ্রেণীর নর-নারীর জীবন প্রণালী। মানুষের কাঁচা নিশ্বাস তাঁর লেখায়। তার শানিত কলম কখনোই মনে হয়নি ভোঁতা হয়ে যাবে। ইদানিং খুব কম চোখে পড়ে তাঁর লেখা। জানিনা, বিসের অভিমানে শ্লথ তার কলম?

ষাটের দশকের শুরুতেই ছোটগল্প লিখে যিনি তুমুল হৈ চৈ ফেলে-দিয়েছিলেন, সেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এখন ছোটগল্পের মাঠে একাই 'বল' নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। এ যেন 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদির গড়!' তাঁর 'পরী' এখনও বেঁচে আছে সেই অলৌকিক মোহময়ী নারী হয়ে। তাঁর রচিত 'অন্নপূর্ণার' এখনও 'দখল' নেবার অধিকার হয়নি কারোর। লেখকের মস্তিষ্কের 'উর্বরাশক্তি'র কাছে প্রতিষ্ঠানও হার মেনেছে, লেখক তাঁর স্বকীয়তা বজায় রেখে গ্রাম ও শহর পাশাপাশি দু'জনকে ডজ্‌ করে ঈর্ষণীয়ভাবে চষে বেড়াচ্ছেন বাংলা গল্পের কৃষিক্ষেত্র। লেখকের গদ্য শরীরের উপমা আমাদের মাথা নত করে দেয়, বাংলা গল্পের রক্তহীনতায় তাঁর এক একটি গল্প কড়া

ভিটামিনের মত কাজ করে। আগের তুলনায় অনেক কম গল্প লিখছেন শ্যামল। উপন্যাসের হাঙর গল্পের চুনো মাছকে সর্বদাই গিলে খায়। একথা শ্যামলও জানেন। তাঁর এই অনীহা বা উদাসীনতা ছোট গল্পের প্রতি— আমাদের অস্থির করে তোলে।

দেবেশ রায়-এর গল্পে সমাজ জীবনের নিষ্ঠুর নগ্নতা রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্য দিয়ে অন্য এক রাস্তা খুঁজে পেয়েছে—তা অনেকের কাছে অপ্রিয় হলেও সমাজ ও শ্রেণী সচেতন পাঠকের কাছে আদরণীয়। গল্পের গায়ে লেবেল এঁটে যাঁরা গল্পকে শ্রেণীচ্যুত করেন, ডান-বাম প্রশ্ন তুলে গল্পের শ্লীলতাহানি করেন—তাদের কাছে দেবেশ রায়ের গল্প 'ডিসটারবিং এলার্জি।' দেবেশ রায় সেই গোত্রের লেখক যিনি 'মা'-কে 'মাম্মি' না বলে 'মা' বলেন বাবাকে 'ড্যাড' না বলে 'বাবা'। যে কোন গল্পের পিছনে তাঁর যে সত্যনিষ্ঠ শ্রম, উত্তরণের চিন্তা তাতে উপর চালাকির কোন চিহ্ন নেই বরং লেখকের সততাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। লেখকের গদ্য সাবলীল, তবে মাঝে মাঝে ভাষার রূঢ়তায় হোঁচট খেতে হয় পাঠককে। গদ্যের কাঠিন্য গল্প শরীরের অহংকার হলেও অলংকার নয়।

অসীম রায়ের গল্পে ছিন্নমূল মানুষের দুঃখ দুর্দশার ছবি পাই। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত তাঁর লেখার উপজীব্য হলেও রক্ত মাংসের মানুষই তাঁর গল্পের প্রধান আকর্ষণ। তাঁর শেষ জীবনের লেখাগুলিতে পরিস্ফুট হচ্ছিল হতাশা বঞ্চনা আর নৈরাশ্যের ছবি যা থেকে হয়ত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও মুক্তি পায়নি। ক্ষমতাবান এই লেখকের কলম একান্ত নীরবে যেসব ধারাল সৃষ্টি রেখে গেলেন তা ভবিষ্যৎ পাঠকের কাছে একটি বিশেষ মূল্য নিয়ে উপনীত হবে।

এ সময়ের বিতর্কিত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পের পরিধিকে প্রসারিত করেছেন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সাঁওতাল পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ভূ-তাত্ত্বিকের মতই তিল তিল ধৈর্য, অধ্যবসায়, শ্রম এবং নিষ্ঠা দিয়ে তিনি তুলে এনেছেন অজ্ঞাত এক জগতের লোক গাথা, সংস্কৃতি ভাষা ও জনজীবন। তাঁর লেখায় নিষ্ঠার পাশাপাশি শ্রমের ইমারত গল্পকে দিয়েছে স্থায়ী বুনিয়াদ। যে জীবন বাংলা সাহিত্যে এতদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল তা মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় নতুন করে উজ্জীবিত হল। 'দ্রৌপদী', 'জল'—ইত্যাদি অনেক গল্পেই লেখিকা যে লোকাচার এবং জনজীবনের কাহিনী শুনিয়েছেন তা বাংলা গল্পে নিঃসন্দেহে অভিনব সংযোজন।

ছোটগল্পের অন্য একটি ধারার সার্থক রূপকার হলেন জনপ্রিয় কথাকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর গল্প কাহিনী প্রধান। যাঁরা নিতান্ত গল্প পাঠে তৃপ্ত থাকতে চান—তাঁদের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ষাটের দশকের শুরুতেই এমন কিছু গল্প লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা গল্পকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করতে চেয়েছেন। বিমল মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ এঁদের মধ্যে অন্যতম।

বুদ্ধদেব গুহ মূলত রোমান্টিক লেখায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের সাবলীল যাতায়াত যা একমাত্র নিমাই ভট্টাচার্যের লেখার সাথে তুলনীয়। শুধু শহর নয়, মফঃস্বল নয়—শ্রী গুহের গল্পে অরণ্য প্রকৃতি এবং অরণ্যবাসী মানুষের জীবন-যাপন প্রাধান্য পেয়েছে। তুলনায় বহির্বঙ্গের গল্পগুলি সাহিত্য রসঘন।

মতি নন্দীর গল্পের বাস্তবতা, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের সুখ-দুঃখ হতাশা শঠতা দুর্বলতা তার গল্পকে শক্তিশালী করেছে। ষাটের দশকের প্রধানতম লেখক মতি নন্দী মানুষের দৈনন্দিন সমস্যায় সাথে একাত্ম করেছেন নিজেকে। খেলাধুলাকে গল্পের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে বাংলা গল্পের আর একটি দ্বার উন্মোচিত করেছেন। তাঁর গল্পকে কখনই বানান মনে হয় না। গল্প শিল্পের সার্থক রূপায়ণ তার গল্পের অন্যতম সম্পদ। 'শয্যাগার' 'পাষাণভার' প্রভৃতি গল্পে লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পাঠকের একাত্মীকরণের সুযোগ ঘটে। তাঁর গল্পে কাঠিন্যের প্রলেপ থাকলেও নাগরিক পাঠককুলকে নাড়া দেবে।

নতুন রীতির গল্প

বাংলা গল্পের আসরে দিব্যেন্দু পালিত হঠাৎ করেই প্রবেশ করেন কিছু কাব্যময় গল্পে মানুষের বেদনা-বিধুর ম্লান অনুভূতি নিয়ে। তাঁর গল্প মূলত অনুভূতি প্রধান। মানুষের মন তাঁর কলমে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে বিচিত্র স্বাদ বয়ে আনে। 'প্রিয়জন', 'মুন্নির সাথে কিছুক্ষণ' 'মুকাভিনয়'—তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন। বাক্য গঠনের পরিমিতি বোধ দিব্যেন্দুর গল্পকে পাঠক মনে একটি স্থায়ী আসন পেতে দিয়েছে। এসময়ের অন্যতম প্রধান গল্পকার হিসাবে দিব্যেন্দু পালিত একটি সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় গল্প নিয়ে এবং গল্পের গদ্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—তাতে আধুনিক গল্প পাঠক কতটা উপকৃত হয়েছেন একথা

বলার সময় হয়ত আসেনি, তবে তার অধিকাংশ গল্পই নেশাগ্রস্ত কোন মানুষের মস্তিষ্ক বিকার। গদ্যের সাবলীলতা তাঁর গল্পকে সুখ পাঠ্য করলেও বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অসংলগ্ন প্রকাশ, ফিচার স্টাইল তাঁর গল্পকে রক্তহীন করেছে। 'বিজনের রক্তমাংস'ও এই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থভাবে নিশ্বাস নিতে পারেনি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সেই বিরল প্রতিভার লেখক যাঁর লেখায় মনো-বিশ্লেষণ, মধ্যবিত্ত মানসিকতার সফল উন্মোচন ঘটেছিল। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'আজ কোথায় যাবেন'-এর উল্লেখ্য গল্প হ'ল 'আজ কোথায় যাবেন' এবং 'সোনালী দিন'। এছাড়া, 'গিরগিটি', 'অলোর পাখি' প্রভৃতি গল্পে তিনি সাহিত্যকর্মের যে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা যে কোন সৎ গল্প লেখকের কাছে রীতিমতন ঈর্ষণীয়।

গৌরকিশোর ঘোষ এবং সন্তোষ কুমার ঘোষের ছোটগল্প বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তরতরিয়ে এগিয়েছে। তাঁদের গল্পে মানুষের জীবন থাকলেও তা জীবন সন্ধানী গল্প নয়। অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় তাঁদের গল্পকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে। সন্তোষ কুমার ঘোষের 'পাখি মরে গেলে' এই ধারার একটি অসাধারণ গল্প। গৌরকিশোর ঘোষের 'অবশুলা' সমমানের আর একটি ব্যতিক্রমী গল্প।

এই সময়ের আরেকজন শক্তিশালী লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথা সম্মত লেখার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ তীব্রতা লাভ করেছিল। গল্পকে তিনি নিছক গল্পের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেননি। গল্পকে উপনীত করেছিলেন সময় কালের বেড়া ডিঙিয়ে অন্য এক ক্ষেত্রে, যেখানে চিরায়ত কোন আখ্যান নেই, আছে কেবল জীবননিষ্ঠ গল্পের হীরক সমাবেশ। তাঁর 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'অশোক বন' এ থেমে থাকেনি। 'অদ্ভুত শুদ্ধতা' ও আর্ত সময়ের হাহাকার হয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল নিষ্ঠুর সমাজের অন্ধগলিতে।

বাংলা গল্পে কমল কুমার মজুমদার এবং অমিয়ভূষণ মজুমদার নিঃসন্দেহে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। দুর্বোধ্যতার দোহাই দিয়ে যারা কমল কুমারকে সরিয়ে রেখেছিলেন, তাঁরাই পরবর্তী সময়ে শ্রদ্ধা বিনীত চিত্তে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রথম থেকেই কমল কুমার তাঁর গদ্য ভাষা সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবিত। তার গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রীয় প্রথায় গড়ে উঠলেও তা পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তা বিরাজমান। জটিল বাক্যের ব্যবহার, ভাষাকে গল্পের প্রয়োজনে খেলানোতে তাঁর ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেকাংশে তাঁর গল্প শ্রুতিমাধুর্য হারালেও তা নিম তেতো নয় বরং সেই নিষ্ঠুর কাঠিন্যের ভেতর

থেকে গরল নিষ্কাশিত হয়ে 'অমৃত' স্তরে উঠে এসেছে। পাঠক ঠকানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না কোনকালেই, পাঠকের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলেই কমল কুমার পাঠককে এমন কিছু মৌলিক ছোটগল্প উপহার দিতে চেয়েছেন যা তাঁর পূর্বে আর কারোর কলম থেকে সৃষ্টি হয়নি। গ্রাম্য শব্দের যথাযথ ব্যবহার তাঁর গল্পে স্বর্ণালংকারের মত শোভা বর্দ্ধন করে। অতি কঠোর বাস্তবকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যা আমাদের মর্মমূলে বিদ্ধ করে জ্বালা ধরায় শরীরময়। তাঁর 'নিম অন্নপূর্ণা', 'লাল জুতো' বিশেষ স্মরণীয় গল্প যা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত।

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে উত্তরবঙ্গের মধ্যবিত্ত সংসারকে গল্পের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সমাজ সচেতনা, পারিপার্শ্বিক সমস্যা, তীক্ষ্ণ জীবনবোধ, মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও সংঘাতকে তীব্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে। লেখক তাঁর প্রত্যেকটি গল্পেই অমোঘ নিয়তির মত উহ্য রেখেছেন নিজেকে। কোন গল্পে তার জোর-জবর দোস্তি প্রকাশ ঘটেনি। তার গল্পের চরিত্ররা রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে ঘোরাফেরা করেছে যত্রতত্র। তাঁর অংকিত চরিত্রেরা নিজেই নিজের প্রতিভূ, ব্যক্ত করেছে নিজেদের সমস্যা ও জীবন সংগ্রামকে। অমিয়ভূষণের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন, নিম্নবিত্তের বেঁচে থাকা সব কিছুই সফলভাবে চিত্রিত হয়েছে।

বাংলা গল্পে হাস্যরস—

'হাস্যরস' বাংলা সাহিত্যের একটি প্রাচীন ধারা। এই ধারার থেমে থাকা নেই। বিচিত্র পথ ধরে এর বিচরণ। সাহিত্যের সেই আদিম যুগ থেকে হাস্যরসের ধারাটি উজ্জ্বল স্বকীয়তায় আজও প্রবাহিত। শিবরাম চক্রবর্তী থেকে শুরু করে এ যুগের অন্যতম প্রধান গল্পকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় হাস্য-রসের ধারাটিকে সযত্নে পালন করে চলেছেন। বলতে গেলে এই সুমহান দায়িত্বটি তিনি নিজের ঘাড়ে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন। তার সাথে কাঁধে কাঁধ মেলাবার মত যোগ্য ব্যক্তির বড় অভাব। পাঠককে যাঁরা সুড়সুড়ি দিয়ে হাসান সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তেমন গোত্রের লেখক নন। তাঁর পরিশীলিত ব্যঙ্গ প্রবণতা সমাজের অসাম্য, বৈষম্য এবং উগ্র আধুনিকতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে। সমাজ এবং সমাজবদ্ধ জীবের যাবতীয় ক্ষতকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। শুধরে দেন আমাদের যাবতীয় অসংগতি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্প নীতি শিক্ষার গল্প নয়—তাঁর গল্পে শিরদাঁড়া টানটান করে দাঁড়ানোর মন্ত্র

আছে। আমাদের জড়বুদ্ধিতে তিনি আঘাত হেনে উদ্দীপ্ত করতে চান মানবসত্তাকে। শিবরামের পরে সঞ্জীব নিজেই একটি বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রতিষ্ঠান। তাঁর এই জনপ্রিয়তার পিছনে বিশাল প্রচারযন্ত্র কাজ করলেও নিজস্ব রচনাশৈলীতে তিনি সমকালীন বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তাঁর 'শ্বেত-পাথরের টেবিল', 'ছাগল', 'অ্যাকোয়ারিয়াম', 'বামুনের গরু' উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, নবনীতা দেবসেন, ইন্দ্র মিত্র, তারাপদ রায়, হিমানীশ গোস্বামী হাস্যরসের ফল্গুধারাটিকে নতুন-ভাবে উজ্জীবিত করাব চেষ্টা করেছেন। বিভূতিভূষণ, বনফুল তাদের বিশ্লেষণ-মুখী ছোট-গল্পে হাস্যরসের যে ধারাটি প্রবাহিত করেছেন—তা বাঙালী জীবন বোধকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। বাঙালী তার ভাঙা আয়নায় মুখ দেখে নিজেকে পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছে।

ব্যর্থ গদ্য আন্দোলনে আপাত বন্ধ্যা ৬০-এর দশক

ষাটের দশকে শুরু হয় নতুন রীতির গল্প আন্দোলন। প্রথাচলিত গল্পের ছাঁচকে ভেঙে ফেলার জন্য এগিয়ে এলেন কিছু তরুণ গল্পকার যাঁরা গল্পের ট্রাডিসন্যাল ফর্মকে পুড়িয়ে চুরমার করে দিতে চাইলেন। 'নব্যরীতির' গল্প লেখায় নিয়োজিত করলেন নিজেদের। গল্পে বিষয় থাকবে না, থাকবে না বর্ণনার ঘনঘটা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম আঁচড় না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।

'এক ছিল রাজা, তার ছিল এক রাণী'—এই জাতীয় গল্পের গোড়ায় কুঠারাঘাত করলেন শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্যের প্রবর্তক রমানাথ রায়। তার সঙ্গে একই সুরে সঙ্গত করলেন শেখর বসু, অতিন্দ্রীয় পাঠক, বলরাম বসাক, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ, অমল চন্দ প্রমুখেরা।

এই ধারার বিতর্কিত লেখক রমানাথ রায় যিনি বাংলা গল্পে 'গল্পহীনতার' বদলে নিয়ে এলেন এক ভিন্ন প্রকরণের গল্প। হয়ত লেখক-পাঠক একাত্ম হ'ল না ঠিকই কিন্তু নিজস্ব উচ্চারণে রমানাথ বাংলা সাহিত্যের গদ্য ভাষাকে নিজের মত করে গড়ে নিলেন। তাঁর মস্তিষ্কে প্রগতিশীলতার জীবানু বহমান ছিল—তা তাঁর বলিষ্ঠ কলমের জোরে হয়ে উঠল মানবমনের অবসর-বিনোদনের খোরাক। গল্প সমাজকালের বেড়া ডিঙিয়ে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারল না। গল্প পিপাসু পাঠক গল্প না পেয়ে বিরূপ সমালোচনায় তীব্র হয়ে উঠলেন,

ব্যাহত গল্পহীনতার গল্পকে পাঠক অনাদরে বর্জন করলেন।

এখানেই ভেঙ্গে গেল শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের কাঠামো। পাঠকের পরিচ্ছন্ন বর্জন মেনে নেওয়া 'শাস্ত্র বিরোধী' অনেক লেখককেই ভাবিয়ে তুলল। শুরু হল আপস। গল্পহীন গল্পের মধ্যে রক্ত সঞ্চার করার জন্য, পাণ্ড করে দেওযা হল গল্পের ক্যাপসুল। ৫০% শাস্ত্র বিরোধী, ৫০% ট্রাডিশন্যাল— এই মিলিয়ে গল্পের খিচুড়ি রান্নায় মগ্ন হলেন হৈ-চৈ করে ক্লান্ত হয়ে যাওযা লেখকরা।

সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ, শেখর বসু প্রমুখে'র কলম থেকে উৎসারিত হ'ল নাগরিক সমস্যার কিছু গল্প। 'মাঝখান থেকে'—একটি আন্দোলনের গলা টিপে ধরল নিষ্ঠুর নিয়তি। এই ধারার অন্যতম লেখক বলরাম বসাক-এর 'নাগরদোলা' 'ডুব'-এ গেল পরিকল্পনাহীন আন্দোলনের পশ্চাৎ অনুধাবন করে।

লেদের সুইচে হাত রেখে, জীবনের নাড়ি খুঁজতে খুঁজতে একদিন হঠাৎ লেখক বলেছিলেন - "আমি কি বেঁচে আছি?" 'নিম জেনারেশনের' অন্যতম পিলার মৃণাল বণিক এর এই প্রশ্ন আমাদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। কিন্তু জীবনে আন্দোলন-ই সব নয, তার ফলাফলও প্রয়োজন। নিম সাহিত্যের এক-মুখীনতা, নিম জেনারেশনকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছে দিতে পারত যদি সেই সময় একত্রিত একটি সাহিত্য আন্দোলনের পরিবেশ গড়া যেত। চিৎকার-চেঁচামেচি লম্ফঝম্প করে হাত-পা-ই ভাঙে— তাতে গল্প আন্দোলনের তেতো সিংহাসনে ওঠা যায় না। নিম জেনারেশন দাবী করেছিলেন সাহিত্যের সবুজ বিপ্লব, সম্প্রসারিত ভূগোল, না-সাহিত্য, অল্প-সাহিত্য, তিক্ত-বিরক্ত-সাহিত্য এবং সর্বোপরি নিম-সাহিত্য।

ষাটের দশকে হাংরি জেনারেশান-এর গল্প নিয়ে যে তুমুল হৈচৈ হয়েছিল তা এখন অস্তমিত। এই ধারায় সুভাষ ঘোষ তাঁর বই 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রণ্টে' সমগ্র সভ্যতার কান ধরে টেনেছেন হিড়হিড় করে। মানুষের নগ্নতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। কোনভাবে হাংরি জেনারেশনের লেখকরা যেন বুর্জোয়া বা শ্রেণী শত্রু হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে লক্ষ্য ছিল তীক্ষ্ন। এই লেখকের আর একটি বই 'আমার চাবি'। এই বইয়ের প্রধান আকর্ষণ তার অবয়বহীনতা····· এবং গতিহীন বাংলা ভাষাকে নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতার পারম্পর্যহীনতার সংগে এক করে মিশিয়ে দেওয়া। জীবনকে জীবনের মধ্যে খোঁজা। অন্বেষণ, মন্থন।

বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধন শালা' সেদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হাংরি জেনারেশন-এ গদ্যে নগ্নতা, ক্রূরতা এবং পারভারশন্ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা কখনই এক হতে পারেনি। ফলে, সাহিত্যের অন্যান্য MOVEMENT গুলোর মতই হাংরি জেনারেশনও পরিণতির দিকে এগোয়নি। ১৯৬০-এর এপ্রিলে 'শ্রুতি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'শ্রুতি আন্দোলন'। কবিতা নির্ভর এই আন্দোলনও সাহিত্যে সামগ্রিক রূপ নিতে পারল না। ১৯৬০ সালের শুরুতেই গল্প নিয়ে যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল তা বাংলা গল্পকে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেনি। পাঠক হতাশ হয়েছিলেন এইসব অন্তঃসারশূণ্য ফাঁকা চিৎকারে, তিতি-বিরক্ত পাঠক তাঁদের সমূলে উৎখাত করেছেন। গল্পে 'গল্পহীনতার' অজুহাত তার জন্য একমাত্র দায়ী নয়,— দায়ী সেই সময়েব উদ্ভট মানসিকতার লেখকরাও।

সত্তর দশক মুক্তির দশক

সত্তর দশকের অস্থির সময়ের ভেতর লেখকরা রসদ খুঁজে নিয়েছেন গল্প লেখার! বর্ষার জলের স্পর্শ যেমন অবশ্যম্ভাবী—তেমনি এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনার আঁচ থেকে গা বাঁচিয়ে কলম উঁচিয়ে লিখে গিয়েছেন এমন লেখক খুব কমই আছেন।

সেদিক থেকে সত্তর দশকও এক বিতর্কিত দশক। এই দশকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয় তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিযা। খরা-বন্যা পশ্চিমবাংলার গলার হার—প্রতি বছর কোন না কোন জেলায় তার মোক্ষম কামড় বসাতে পিছপা হয় না। বাংলার জনজীবন নতুন আস্বাদন পেল কমিউনিষ্ট শাসনে। গ্রামে-গঞ্জে কায়েম হ'ল পঞ্চায়েতী শাসন। অতর্কিত হায়নার থাবার মত নেমে এল জরুরী অবস্থা, যার সুফল-কুফল ভাবিয়ে তুলল শান্তিপ্রিয় জনগণকে। নকশাল আন্দোলন, বর্গাদার প্রথা সবকিছুই শেকড় চালিয়ে দিল সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। লেখকরা সবকিছুই দু'চোখ মেলে দেখলেন। যা যা দেখলেন তার অধিকাংশই উঠে এল তাদের লেখায়।

সত্তর দশকের শুরুতেই যে অনতিক্রান্ত সামাজিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছিল মুক্ত আবহাওয়ায় তার প্রভাব কাটিয়ে কলমকে অন্য পথে চালিত করা আদৌ সম্ভব হয়নি সত্তর দশকের লেখকদের পক্ষে। লোভ-লালসা-ঘৃণা-ক্রোধ, কামনা-বাসনা অবিশ্বাস, সন্দেহ, অনাচার. ভ্রষ্টাচার, শ্রেণী বৈষম্য, সামাজিক

অবক্ষয়, রাজনৈতিক মতবিরোধ, উচ্ছৃঙ্খলতা সব কিছুই গল্পের উপাদান হয়ে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ব্যক্তি সত্তার উপরে কোন সত্তা নেই—এই নীতিতে বিশ্বাসী মানুষ। সাধারণের দুঃখ, সুখ হীনতা, দীনতা এড়িয়ে যেতে চায় সুখকাতর কিছু মানুষ। যারা একদম সূচনাতেই মানুষের গল্প শোনাতে চেয়েছেন, তারা মানুষের মনকে চুলচেরা বিশ্লেষণে বিধ্বস্ত করলেন। গল্প হারিয়ে ফেলল তার স্বাভাবিকতা! স্থূল হয়ে গেল গল্পের গঠন। হোঁচট খেলেন সেই সময়ের আলোচিত কিছু গল্পকার! আত্মকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে যাঁরা গল্পকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যাঁরা গল্পের মধ্যে বিগতদশকগুলির না-বলা কিছু প্রতিবেদন উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন, গল্পের মাধ্যমে যারা সাধারণের জীবনকাহিনীকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেক্ষ্য হলেন, শচীন দাস, শৈবাল মিত্র, অমর মিত্র, অভিজিৎ সেন, কানাই কুণ্ডু, জয়ন্ত জোয়ারদার, সৈকত রক্ষিত, রাধানাথ মণ্ডল, তীর্থংকর নন্দী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীরণ দাস, নলিনী বেরা, কমল চক্রবর্তী ও ভগীরথ মিশ্র প্রমুখ।

'সত্তর দশক মুক্তির দশক' এই আপ্ত বাক্যে বাংলা গল্পের যে আন্দোলন সংগঠিত হল তার নিষ্ফল-চিৎকার চেঁচামেচি ভেদবমি করে হারিয়ে গেল কতকগুলি লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়! পণ্য সাহিত্যের মৌসুমী বাজারে আন্দোলন সব ধুলিস্যাৎ হল প্রাতিষ্ঠানিক হাতছানির কাছে। যারা লোভ সম্বরণ করতে পেরেছিলেন তারা পরবর্তীতে শক্ত হাতে কলম ধরে নিজেদের অস্তিত্বকে এখনও টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন। ষাটের দশকের হৃত ঐতিহ্য সত্তর দশকের প্রথমভাগে কিছুটা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন সত্তরের লেখকরা। একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়, যে খামতি বাংলা গল্পের বনিয়াদকে টলিয়ে দিয়েছিল—সেই সমস্ত দিকের উপর বিশেষ নজর রেখে সত্তর দশকের পথ চলার সূচনা। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে যে ক'জন লেখক উঠে এসেছেন তাঁদের কলমে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল, সেখানকার সমস্যা, রাজনৈতিক উত্থান পতন, ভাষা, ভৌগলিক অবস্থান সবকিছুকে 'ডকুমেণ্টারী' উপস্থাপন যথাযথভাবে বর্নিত হয়েছে।

এই ধারার অন্যতম লেখক হলেন শৈবাল মিত্র। সত্তর দশকের গোড়া থেকে শৈবালের গল্পে পরিণতি দেখা যায়—যা পাঠক সমাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল, নিজস্ব গদ্য রীতি এবং রচনা কৌশলের মাধুর্য গুণে। তাঁর লেখায় সমকালীন রাজনীতি, গ্রামীণ অর্থনীতির আলোকপাত বিশেষভাবে

প্রভাব ফেলেছিল। একদা নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত শৈবালের লেখায় ঐ বিশেষ একটি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মূল্যায়ণ, মতাদর্শের ব্যাখ্যা খুব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থাপিত হয়েছিল। পাঠক তথা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল ভিন্ন ভাবধারার কিছু গল্পের আঁচ পেয়ে। শৈবাল মিত্রের প্রথম গল্প-সংকলন 'আতর আলির রাজসভা' বিষয় বর্ণাঢ্যে একটি অভিনব গল্প সংকলন যার প্রতিটি গল্পে মানুষের বেঁচে থাকা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম দানা বেঁধেছে। ভাষা এবং ঘরোয়া বাক্য ব্যবহারে শৈবালের পটুতা লক্ষণীয়। তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'মা বলিয়া ডাক'-এ শৈবাল আগের থেকে অনেক বেশী পরিণত। তাঁর দেখার চোখ, বাস্তব উপলব্ধি, ঘটনার গভীরে ঢুকে গল্পকে আন্দোলিত করা সর্বোপরি গল্পকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁৗছে দিতে তিনি সফল। 'মা বলিয়া ডাক'-এর বাস্তবতা সম্পর্কে পাঠকের সন্দেহ জাগলেও লেখাটি বিশেষ একটি দিক থেকে সার্থকতার দ্বার ছুঁয়েছে।

শৈবালের গল্পে সংগতির পাশাপাশি অসংগতিগুলো মোটেই দৃষ্টি শোভন নয়। 'ফার্স্ট লিটারেচার জীবন ও পৃথিবীকে ডান চোখে দেখে, সেকেন্ড লিটারেচারের দৃষ্টিপাতের একমাত্র সম্বল হ'ল বাঁ চোখ। থার্ড লিটারেচার দু'চোখ উন্মীলিত রেখে পৃথিবী, মানব সমাজ এবং ইতিহাসের সারাৎসার অন্বেষণ করে।' তার এমন যুক্তির সাথে একমত হতে গেলে পাঠকের মনে ঘোর সংশয় দেখা দেয়। তখন সন্দেহ হয়, যে শৈবাল মিত্র 'বরাহ পুরাণ', 'কমলি, তুই ঘরে যা' লেখেন এ কি সেই শৈবাল মিত্র?

সাহিত্যের আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকা অন্যায় নয়—কিন্তু তা যদি তাঁর অর্জিত সম্মানকে ধূলিস্মাৎ করে তাঁর সাহিত্য ভবিষ্যৎকে দ্বিখণ্ডিত করে—তা হ'লে দ্বিখণ্ডিত সত্তা নিয়ে তিনি কতদূর এগোতে পারবেন?

সত্তর দশকের শুরুতেই 'মাঠ ভাঙ্গে কাল পুরুষ-এর' লেখক অমর মিত্র-এর আবির্ভাব নতুন বাংলা গল্প পাঠককে মেদিনীপুরের গাঁ-গঞ্জের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। গ্রামীণ নানাবিধ সমস্যা, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, মানবিক নিরাপত্তাহীনতা, খরা-বন্যা, লোকাচার, গাঁওবুড়ো তাঁর গল্পের মূল বিষয়। অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতায় মানুষ যে কত অসহায় তার বিবরণ অমর মিত্রের গল্প। চাল থেকে ভাত হ'য়ে ওঠার মত আন্তরিক বিভিন্ন মানসিকতার গল্পকে নিজের মত করে বলার যে সৎ গুণ তা অমর মিত্রের আয়ত্তে। ফলত তাঁর গল্প তরতরিয়ে পরিণতির দিকে এগোয়। অমরের গদ্য ভাষা একান্তই অমরের। নিজস্ব গদ্য রীতিতে অমর এখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠার দিকে

এগোচ্ছেন। তবে, সময়মত রাশ টেনে ধরতে না পারলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রলোভনের ফাঁদে আটকে তাঁর প্রতিভার হরিণ শাবকটি ফাঁদমালিকের হাতের ক্রীড়নক হয়ে যেতে পারে। 'মাঠভাঙে কালপুরুষ' থেকে শুরু ক'র 'দানপত্র' পর্যন্ত অমর মিত্রের গল্পে একটি বন্ধ্যা সময় লক্ষ্য করা গেছে—যা একটি নতুন লেখকের পক্ষে সুখকর নয়। কোয়ানটিটি নয় কোয়ালিটির দিকে অমরের সুতীক্ষ্ন নজর থাকবে এটা আশাকরা নিতান্ত অমূলক নয়।

এই সময়ের আর একজন ব্যতিক্রমী গল্প লেখক কানাই কুণ্ডু। যদিও কবিতা নিয়ে সাহিত্য জগতে তার প্রবেশ তবু গল্পের প্রতি আছে তার বন্য টান। 'ছত্তিশ গড়ের মানুষ'-ই কানাই কুণ্ডুর লেখার মূল পটভূমি—যে পটভূমিতে লেখকের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ কানাই কুণ্ডুর গল্পকে গঙ্গাজলের শুদ্ধতা দিয়েছে। ছত্তিশগড়ের নিঃশ্বাস কানাই কুণ্ডু সাহিত্য বাতায়ণে বইয়ে দিয়েছেন যা এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে তেমনভাবে কেউ তার করেননি। সে দিক থেকে কানাই কুণ্ডু একটি নতুন জগতের সাথে বাংলার গল্পভুক পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন। কানাই-এর গদ্য অহংকারী ভাষাশৈলীর দক্ষতা পাঠককে বিস্মিত করে। তাঁর 'বনশি বাইগার অভিষেক' একটি অসাধারণ গল্প সংকলন যেখানে ছত্তিশগড়ের ভূগোল, সেখানকার মানুষের ব্যথা বেদনার চিরকালীন দলিল হয়ে অতি নিপুণভাবে উঠে এসেছে। এতকিছু বলার পরেও তার গল্প সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলার থেকেই যায়। গল্পের বিষয়বৈচিত্র্যহীনতা ক্রমশ তাঁর গল্পকে এক পেশে করে ফেলবে যদি কানাই তাঁর পরিচিত ব্যারিকেড না ভেঙ্গে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারেন। গল্পকে অতি বাস্তবের ছোঁয়া দিতে গিয়ে কানাই যে জগৎকে তুলে আনেন তা অনেক সময় মনে হয় কাঁচের ঘরে বসে সবুজ গ্রাম দেখা নয়ত এরোপ্লেন থেকে গ্রামের প্রকৃতি উপলব্ধি করা। একই শব্দ তাঁর গল্পে বিভিন্নভাবে একই অর্থ নিয়ে ফিরে এসেছে—এটা দূষণীয়। বারংবার একই শব্দের অংকার লেখকের ভাষা প্রয়োগের অক্ষমতাকে প্রকাশ করে যা অমর মিত্রের 'মাঠভাঙ্গে কালপুরুষী'-এর মধ্যেও রয়েছে। কানাই কুণ্ডু অমর মিত্র শৈবাল মিত্র এ'রা আধুনিক বাংলা গল্পের হাল ধরতে পারবে বলেই এই নানাবিধ সতর্কীকরণ। পিঠচুলকানী নয়, গা শোঁকাশুঁকি নয়, তোষামোদ এবং প্রসংশা এড়িয়ে যদি স্বক্ষেত্রে এ'রা এ'দের নিজস্বতা বিকিয়ে না দেন—তথাকথিত বিজ্ঞাপন প্রচারযন্ত্র এ'দের যদি মাথা ঘুরিয়ে না দেয় তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে এ'দের মস্তিষ্কক্ষরিত চিন্তা ভাবনার

ফসলে বঙ্গসাহিত্য জননী লাভবান হবেন।

সত্তর দশকে বাংলা গল্পকে সমৃদ্ধশালী করেছেন ভগীরথ মিশ্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ মণ্ডল, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত, সমীরণ দাস, কমল চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, অভিজিৎ সেন, তীর্থংকর নন্দী প্রমুখ। এঁদের লেখায় সমকালীন জনজীবন, গ্রামীণ সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, লোকাচার, ভূগোল, পরিবেশ গত মাধুর্য, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, কাম-ক্রোধ-ঘৃণা-ভালবাসা, আত্মজৈবনিকতা, সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব লোভ-লালসা-প্রতারণা, পরিবেশগত সমস্যা, খরা-বন্যা-আকাল, পঞ্চায়েত-শোষণ, রাজনৈতিক দলাদলি—এই সবই প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমান সময় সম্পর্কে এরা সকলেই সচেতন। এই দশকের অন্যতম প্রধান গল্পকার ভগীরথ মিশ্র তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষার কথাই বারবার বলেছেন। তার গল্প শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা জাগায়। আছে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নিখুঁত কাহিনী চিত্র এবং তার বর্ণনা। গল্পের পটভূমি গ্রাম হলেও ভগীরথ মিশ্রের কলম গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। তাঁর 'জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প' এবং সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'লিবারণ বাদ্যিগর' দুটি অসাধারণ গল্প সংকলন, যেখানে তাঁর ক্ষমতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'হুল মারার ভমরা মাঝি', 'পাঁঠার চোখ', 'ঝোরবন্দী', 'ইন্দুর বাগ', 'পথ', 'জাইগেনসিয়া', ভগীরথ মিশ্রের বিতর্কিত গল্পগুলির অন্যতম। শ্রী মিশ্রের কাছে আমাদের অনেক আশা। সৈকত রক্ষিতের গল্প একটি নির্দিষ্ট এলাকার কথা বলে। তার গল্পে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ছবি তাদের বেঁচে থাকা প্রকট হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়, উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা মানুষ তাঁর গল্পে গুরুত্ব পায়।

'সাঁকো'-র পর 'এক জন্মের ঋণ' দীপঙ্কর দাসের সাম্প্রতিক গল্প সংকলন। সত্তর দশকে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার জীবননিষ্ঠ চিত্র তাঁর প্রায় সব গল্পেই ঘুরে ফিরে আসে। সাংসারিক চাপা অসন্তোষ, মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙন কৃষ্ণপক্ষের ম্লান বিধুর চাঁদের মত উঁকি ঝুঁকি মারে তার গল্পে। উপভোগ্য ভাষা আর তাজা উপমা প্রয়োগ তাঁর গল্পকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। 'মজুরি', 'চোখ', 'সুবলের অভিষেক', 'জলের শব্দ' ও 'শবযাত্রা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে লেখকের মুন্সিয়ানা পরিস্ফুট। একটি নির্দিষ্ট বৃত্তকে আঁকড়ে ধরার জন্য অনেক সময় তার গল্প একঘেয়ে মনে হয়। তাঁর গল্পের পটভূমি অত্যন্ত ঘরোয়া। মাঝে মাঝে বিষয় অভিনবত্বের অভাব

পীড়িত করে।

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে 'শচীন দাস' তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রামজীবন, নোনাজল আর গহন জঙ্গলের গল্প শুনিয়েছেন। মানুষই তাঁর গল্পের প্রধান বিষয়, সেখানে সহর বা গ্রাম এই জাতীয় কোন ছুৎমার্গীয়তা নেই। তাঁর লেখায় যে জীবন যুদ্ধের চিত্র আছে তা কিন্তু অনেক সময় অতি-কথন দোষে দুষ্ট।

'সড়কের উপর নিম গাছ' তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচিত্র স্বাদের গল্পের সংকলন। কবিতার পাশাপাশি লেখক ছোট-গল্পেও তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। বিচিত্র পেশার মানুষ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মিছিলের মত ভিড় করে। সাপুড়ে, মাঝি, মধু সংগ্রহকারী, লাশকাটা ঘরের ডোম, ইঁট ভাটার রেজা, রাজ্যপাল, আমলা কেউই বাদ পড়েন না। তাঁর সৃষ্ট গল্প-গুলিতে পরিশ্রমের চিহ্ন আছে। শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্ব, নারী এবং নারী-মনের চিরন্তন আকুলতা, প্রশাসন এবং তার অসুখ, সাম্প্রতিক সময়ের রিপোর্টাজ, নীচুতলার মানুষের চাপা ক্ষোভ—এ সমস্তই তাঁর গল্পের অন্তর্নিহিত উপাদান। যে বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখকের আনাগোনা, অনেকাংশে মনে হয়েছে সেগুলো তার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। 'ব্যভিচারিণী' গল্পে যে বাস্তবতার অভাব দেখি তা 'বনদেবীর করে'ও ধরা পড়ে।

অভিজিৎ সেন, জয়ন্ত জোয়ারদার, স্বর্ণ মিত্র ও শংকর বসু এই পর্যায়ের চারজন বিশিষ্ট গল্পকার বাংলা গল্পকে কিছু তেজী ও রাগী গল্প উপহার দিয়েছেন। একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের ছায়ায় এঁদের গল্পগুলি লালিত। গল্পের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এঁরা তিনজনই স্বাতন্ত্রের দাবী রাখেন। শুধুমাত্র নিটোল কাহিনী নয়—রক্ত-মাংসের মানুষের জটিল জীবন যন্ত্রণা এঁদের গল্পের ভিত্তিভূমি। স্বর্ণ মিত্র ও শংকর বসু বাংলা গল্প থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেও অভিজিৎ সেন, জয়ন্ত জোয়ারদার এখনও কলম আঁকড়ে গল্পের ভাঙ্গা-গড়ায় ব্যস্ত। জয়ন্ত'র সংবেদনশীল কলম শহুরে চতুরতায় ক্রমশ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, এটা ভয়ের কারণ।

নলিনী বেরা, রাধানাথ মণ্ডল—এই দুই নবীন লেখকই মেদিনীপুরের পটভূমিতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন। নলিনীর গল্পের হাতটি চমৎকার কিন্তু বিষয়বস্তুর গভীরতা গল্পে বড়ই ম্লান। তার 'হাঁসচরা', 'বাবার স্মৃতি' প্রভৃতি গল্প অসাধারণ না হলেও পরিচ্ছন্ন। গল্পের গদ্য নিয়ে নলিনীর ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসেছে। এ বিষয়ে তাঁকে আরো সতর্ক এবং আন্তরিক

হতে হবে। প্রতিষ্ঠানের মোহ ভেঙে শক্তভাবে কলম না ধরলে তাঁর গল্পের দীনতা ঘুচবে না। সে তুলনায় রাধানাথ অনেক বেশী পরিণত। তাঁর 'চালে যখন কাক গলছে', 'আট ঘরার মহিম হালদার', 'শীতের মানচিত্র' পাঠকের সংবেদনশীল মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তার গ্রামীণ গল্পগুলি শহুরে গল্পের তুলনায় সপ্রতিভ। বিজ্ঞাপন, মিথ্যা প্রশংসা, সস্তা প্রলোভন যদি রাধানাথের মাথা না খেয়ে নেয় তাহলে বাংলা সাহিত্য অবশ্যই লাভবান হবে।

কল্যাণ মজুমদার, সুতপন চট্টোপাধ্যায় বা শ্যামল মজুমদার এঁরা মূলত নাগরিক মানসিকতায় গল্প লিখতেই অভ্যস্ত। শহর এঁদের গল্পের পটভূমি হলেও মাঝে মাঝে 'ভাত' ছেড়ে রুটি খাওয়ার মতই অন্য কোন বিষয় এঁদের গল্পে আধিপত্য বিস্তার করে। কল্যাণ মজুমদার তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন সামাজিক অবক্ষয়কে গল্পে চিত্রায়িত করে। তবে বিষয়হীনতার গল্প অনেক সময় তার গল্পে হাল্‌কা করে দেয়। সুতপনের লেখায় যে চাপা অসন্তোষ, দুঃখ বা নৈরাশ্য আছে—তা কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট নয়। তবে, সময়-কালের নির্যাস তাঁর লেখায় নেই এটা তাঁর বড় ত্রুটি! শ্যামল মজুমদার অনেক সময় গল্পের বুড়ি ছুঁতে গিয়ে গন্তব্য থেকে সরে যান দূরে—তাঁর এই উদ্দেশ্যহীন হাঁটা-চলা গল্পের ক্ষেত্রে স্থূল এবং অপ্রাসংগিক।

মিহির মুখোপাধ্যায়, তুলসী সেনগুপ্ত, সমীর মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, অভ্র রায়—প্রমুখের গল্পে গতানুগতিকভাবে উঠে এসেছে বাস্তব সমাজ, নারী-পুরুষের বিভিন্ন অলক্ষণীয় সমস্যা, সমকালীন রাজনীতি এবং নাগরিক জীবনের বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস। অভ্র রায়ের গল্পের পরিধি বিস্তৃত হলেও তার গল্প ভাষার কাঠিন্য দোষে দুষ্ট। তুলসী সেনগুপ্ত কলকাতার ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে কোথাও তেমনভাবে বেরুতে পারছেন না। ফলে, অতৃপ্তি বদহজম তার গল্পে মাকড়সার জালের মত ছড়ান...যাতে ফুঁ দিলেই লেখকের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার ভয় থাকে। মফঃস্বলীয় কিছু গল্প এদের লেখায় আছে কিন্তু সেগুলো এতই গতানুগতিক যে উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে না।

সত্তর দশকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যে সমরেশ মজুমদারের আবির্ভাব। বলতে দ্বিধা নেই তাঁর আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য ধনী হয়েছে। 'বড় পাপ হে' তাঁর প্রথম গল্প সংকলন বিষয়ের অভিনবত্বে, লেখার প্রসাদগুণে তা শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসন ছুঁয়েছে। আশির দশকের এই সময় পর্যন্ত তাঁর 'আগুনের খেলা' বাস্তবের জল-মাটির দশ হাত উপরে অথচ, একদা এক সময়ে, সমরেশের কলমের ফসল বাস্তবের পলিতে উর্বর হয়েছিল...সেই সমরেশ এখন কোথায়?

কবিতার পাশাপাশি কমল চক্রবর্তী নিজেই 'প্রচ্ছদ কাহিনী' হবার বাসনায় যেভাবে বিক্ষিপ্ত গদ্য লিখেছেন তা আদৌ বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় নিমতেল, জাফরান, অ্যাকাশিয়া ও আমলকি চূর্ণের বিচিত্র 'পিটারা' কিনা তা ভেবে দেখার সময় এখনও আসেনি। ফলে, এভাবে নিজের ঢাক নিজে পেটাবার যুক্তি আছে কিনা সেটা কমলেরই বিবেচনার বিষয়। আধুনিকতার নামাবলী গায়ে দিয়ে যারা লিখনশৈলীর সুপার ফাস্ট ট্রেন চালায়...কমল হয়ত সেই দক্ষ ড্রাইভারদের একজন। কিন্তু তাতে কি এসে যায় বাংলা সাহিত্যের বা আগামী প্রজন্মের গল্পকারদের? গদ্যই যদি গল্প হ'ত তাহলে সাহিত্যের গল্প শাখাটির অনেক আগেই মৃত্যু হোত। নিতাই ধর বা হরিদাস সাউ যে-ই হোন না কেন গল্পকে গল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা না করলে কালো কালির উদ্দাম নৃত্য নিছকই জাবদাখাতায় পর্যবসিত হবে। কমলের গল্পে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্নতার কথা আছে, বিশ্লেষণ নেই। ধরানো তুবড়ির ফুলঝুরি আছে...কিন্তু তার আয়ু কতক্ষণ?

সুতীর্থ রায় নামের আড়ালে সমীরণ দাস সত্তর দশকের একজন গল্পকার। তাঁর 'মৃত্যু', 'বাঁচা', 'শূন্য করতল', 'ফিরে দেখা' ইত্যাদি গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন, সাংসারিক জটিল আবর্ত এবং তার আভ্যন্তরীণ কুটিল পরিবেশ প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের গদ্য লেখকের আয়ত্তে থাকলেও গল্পগুলি নিতান্তই কথামালা কিংবা বিরক্তিকর আত্মবিশ্লেষণের নামান্তর। মৃত্যু চেতনাকে ঘিরেই লেখা 'মৃত্যু' গ্রন্থের সব গল্পগুলি। অমলেন্দু চক্রবর্তী, তপোবিজয় ঘোষ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমল আচার্য, মিহির আচার্য, সরোজ দত্ত, সৌরী ঘটক, সলিল চৌধুরী প্রমুখের গল্পে প্রগতিবাদী ধারাটি অক্ষুণ্ণ। সাম্যবাদী আন্দোলন বামপন্থী লেখক শিবিরে যে পতাকা উড়িয়ে দিল তা আজ নিষ্ঠুর সময়ের যূপকাষ্ঠে অর্ধনিমীলিত। অমলেন্দু চক্রবর্তী তার গল্পে মধ্যবিত্তের চেনা মুখগুলিকে মুখোশহীন পরিচয় করিয়ে দেন। প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি, গভীর মনোবিশ্লেষণ অমলেন্দু চক্রবর্তীর হাতে তুরুপের তাস। তাঁর গল্পে মানুষ ও মনুষ্যত্ব দুই-ই সম্মানের সাথে প্রাধান্য পেয়েছে। এ ধারার আরেকজন শক্তিমান লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়; তাঁর লেখায় গ্রাম এবং শহর যমজ ভাই-এর মত এসেছে। সমাজ সচেতন এই লেখকের কলম থেকে বেশকিছু ভাল গল্প আমরা পেয়েছি। মাঝে বড়ই ঝিমিয়ে পড়েছিল তাঁর কলম, বড় বেশী কাটখোট্টা লাগছিল তাঁর গল্পের ভাষা। গল্পকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পেঁছে দেওয়া লেখকের অন্তিম উদ্দেশ্য হলেও তার মধ্য দিয়ে সমকালীন ভাবধারাকে ফুটিয়ে তোলার

দায়িত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সাধনের কাছ থেকে আমরা আরও বেশী শক্তিশালী গল্প পাবো যদি তা শিবির কেন্দ্রিক দোষে দুষ্ট না হয়।

ষাটের দশকের আপাত বন্ধ্যা সময় সত্তর দশকের ছোঁয়ায় কিছুটা প্রাণের স্পর্শ পেয়েছিল। সত্তর দশকের গল্পকাররা তুলনায় ষাটের চেয়েও বাস্তবের মাটি জল হাওয়ার সাথে সংযোগ রেখেছিল বেশী। মানুষের জীবন এবং দর্শন তাঁদের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছিল। জীবন এবং জগতকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না এই উপলব্ধি সত্তরের কলমে বহুবার নিঃসৃত হয়েছে। যদিও বিভিন্ন আন্দোলন এবং তার ব্যর্থতা সত্তরের কিছু প্রতিভাকে বিপথে চালিত করেছিল, তবু মোহাচ্ছন্ন সময়ের রেশ কাটিয়ে তাঁরা আবার ফিরে এসেছিলেন ভারতীয় গল্পের শৈল্পিক গুহায়।

গল্পের দশক আশির দশক

সত্তরকে বিদায় জানিয়ে এল আশির দশক। ষাট-সত্তরের মিশ্র ফসল ভাবিয়ে তুলল আশির লেখকদের। আর তফাৎ-এ দাঁড়িয়ে নয়.. একেবারে নিকটে থেকে তুলে আনলেন গল্পের আদি সুষমাকে। গল্পের শরীর জড়িয়ে ফুটে উঠল ছোট-গল্পের বিচিত্র সব ফুল...যার রূপে গন্ধে বিস্মিত হল পাঠক, সমালোচক। সত্তর দশকের মতই আশির দশকেও এলো রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, রাজীব সরকার, পাঞ্জাব সমস্যা, গোর্খাল্যান্ড ইস্যু, খরা-বন্যা, পঞ্চায়েত, বামফ্রন্টের বিজয় অভিযান, বফর্স। শুরু থেকেই টালমাটাল হয়ে উঠল শিক্ষাক্ষেত্র, সবুজ গন্ধমাখা গাঁ-গঞ্জ। কলকাতা হয়ে উঠল মিছিল নগরী। ঝাড়খন্ড আন্দোলন, কালাহান্ডির রাজনৈতিক লড়াই...এসব কিছুতেই মেতে উঠল বারুদ মহানগরী। এর মধ্য দিয়েই ভূগর্ভ রেলের বিজ্ঞাপিত সেই হরিণের মত ছুটে চলল আশির দশকের গল্প চর্চা। আশির দশকে বাংলা গল্পকে যারা বৈচিত্র-ময়তার দিকে এগিয়ে দিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অনিল ঘড়াই, আফসার আমেদ, শিবতোষ ঘোষ, আবুল বশার, প্রিতম মুখোপাধ্যায়, দেবর্ষি সারগী প্রমুখ। অনিল ঘড়াই এবং স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে গ্রাম জীবনের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত জলবায়ুর মত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

অনিলের গল্পে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুরের গ্রাম-গঞ্জের পোড় খাওয়া মানুষের ছবি দেখতে পাই। তাঁর লেখা কখনো বাস্তবের মাটি ছেড়ে অলৌকিক, অতি কাল্পনিক চিন্তা-ভাবনায় কম্পিত হয়ে ওঠে না। মানুষের

জীবন যন্ত্রণায় যে নির্লজ্জ ছবি অহরহ আমাদের চোখকে নষ্ট করে সেই অবাঞ্ছিত বিষয়বস্তু অনিলের মরমী কলমের সূক্ষ্ম নিদর্শন। তার চেষ্টা এবং দেখার মধ্যে ফাঁকি নেই। গ্রামের কথ্যভাষা অনিলের গল্পে এক অনন্য স্বাদ এনে দিয়েছে। তার প্রথম গল্প সংকলন 'কাক' পাঠক সমাজের সুখ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়। 'কালকেতু', 'অনিলেন্দু ভালো আছ', 'সাইবেরিয়ার পাখি', 'বালিগড়', 'পরীযান', 'আগুন' ইত্যাদি গল্পে অনিল তাঁর যোগ্যতার নিদর্শন রেখেছেন। তার গল্পের ভাষা অনেকাংশে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। জনপ্রিয়তার শিকে ছেঁড়া যদি তার উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তাঁকে আরো সহজ সরল এবং যুগোপযোগী হতে হবে। নচেৎ "পরীযান"-এর মত বলিষ্ঠ গল্প সংকলনও লেখক-পাঠক সেতুবন্ধনে পথ হারাবে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী সেই বিরল গোত্রের লেখক—যিনি প্রথম থেকেই উপেক্ষিত মানবজীবনের 'ভূমিসূত্র' নির্ধারণে আত্মমগ্ন। 'রত্নাকরের পাপের ভাগ' 'নক্সি কাঁথার মাঠ' 'তথ্যচিত্র' প্রভৃতি গল্পে তাঁর মুন্সীয়ানা তারিফ করার মত। তাঁর গদ্য সংযত, প্রাণস্পর্শী, সর্বোপরি মাটির কাছাকাছি আবেদনে সক্ষম। গল্পকে চিরন্তন শিল্পমানে পৌঁছে দিতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তা স্বপ্নময়ের আছে। সততা এবং শ্রম দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর এগিয়ে যাবার পালা। যাঁরা বাংলা গল্প সম্বন্ধে সুতীব্র আশাবাদী, যাঁরা আধুনিক বাংলা গল্পের উষ্ণতায় নিজেদের সেকে নিতে চান তাঁদের স্বপ্নময়ের গল্প ভাল লাগবে। অতি সম্প্রতি স্বপ্নময়ের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি লেখা পত্র-পত্রিকায় পড়ে রীতিমতন হতাশ হয়েছি। গল্পের 'পিক' পয়েন্ট থেকে সরে এসে তিনি ভণিতার আশ্রয় নিয়ে গল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে গল্পকে দিয়েছেন মৃদু 'স্টার্ট' যা তাঁর কাছে আশা করতেও কষ্ট হয়।

শিবতোষ ঘোষ একজন নতুন লেখকের নাম যিনি গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতায় শক্তিশালী। অপেক্ষাকৃত নীচুতলার জীবন থেকে তিনি মুক্তো কুড়োনোর মত কুড়িয়ে নিয়েছেন গ্রাম জীবনের নিটোল সব গল্প যা তাঁর গভীর মমতাময় আঁচড়ে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তার গল্পে কৃত্রিমতার স্থান নেই, আছে সরল সাদাসিধে গদ্যের সাবলীল বিচরণ। লেখকের দৃষ্টিশক্তি প্রচ্ছন্ন, কব্জির জোরে অতি সাধারণ ঘটনা তাঁর গল্পে পেয়েছে আলাদা ব্যাপ্তি। তাঁর গল্প নিঃসন্দেহে বাংলা গল্পের ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন। আত্মতুষ্টি আর গল্পহীনতা যদি তাঁকে না পেয়ে বসে তাহলে লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তার একটি অসাধারণ গল্প

গ্রন্থ 'খেলনাপাতি' সম্প্রতি আনন্দ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আফসার আমেদ এবং আবুল বশারের গল্পে প্রায়শ মুসলমান সমাজের ছবি ফুটে ওঠে। সামাজিক অবক্ষয়, নৈরাশ্য, স্বার্থপরতা, ধর্মান্ধতা এবং প্রথা বিরুদ্ধ মনোবিশ্লেষণ তীব্রতা লাভ করে এঁদের গল্পে। কৃষিক্ষেত্র এবং গ্রামীণ আবহাওয়া তাঁদের গল্পের পটভূমি—যেখানে সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, পঞ্চায়েতী শাসন কোন কিছুই এড়িয়ে যায় না। আবুল-এর গল্পে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা কখনো সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প-স্নেহ-ছায়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর গল্প বিস্তৃত পরিসরের হলেও তা পাঠকের কাছে কখনও বিরক্তি-কর মনে হয় না। অতি কথন আবুলের একটি দোষ—যার থেকে তিনি মুক্ত হতে পারলে তাঁর গল্প মেদহীন রমণীর মত রমণীয় হয়ে উঠতে পারে।

আফসার প্রথম থেকেই তাঁর গল্প সম্পর্কে সচেতন হলেও গল্পের ভাষা নিয়ে তাঁকে আরো বেশী ভাবতে হবে। 'ডিপ টিউবওয়েলের কত দাম' এ রকম দীর্ঘদেহী গল্পেও আফসার তাঁর ক্লান্তিকর পদচারনার রাশ টেনে ধরতে পারেন নি। পারলে আফসার আমেদ বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা পাবেন বাংলা গল্প সাহিত্যে।

ভারতের স্বাধীনতার চেয়েও চার বছরের ছোট প্রিতম মুখোপাধ্যায়ের 'সম্পূর্ণ রঙিন' গল্পগ্রন্থে মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি যুবকের জীবন জুড়ে জটিলতার কথা বলা হয়েছে। তাঁর গল্পে চারপাশের ভাঙচুর, ক্ষয়, মেকী বিপ্লব আর শ্বেত সন্ত্রাসের কথা আছে। প্রিতমের গদ্য তাঁর নিজস্ব গদ্য। গল্প গঠন শৈলীও একান্তই নিজের। 'মরণোত্তর', 'বন্দেমাতরম', 'রিক্সাওয়ালা', 'সম্পূর্ণ রঙিন' কয়েকটি ভাললাগা গল্প। বাংলা গল্পে প্রিতমকে নিজস্ব জায়গা করে নিতে হলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তাধারা বাদ দিয়ে গল্পকে দিতে হবে সার্বজনীন রূপ। নচেৎ ভাষার কচকচি তাঁর গল্প হয়ে উঠবে ফ্যাকাসে।

আশির দশকের আরো কয়েকজন দীপঙ্কর রায়, স্বপন সেন, সৌমিত্র লাহিড়ী, রাধাপ্রসাদ ঘোষাল, দেবর্ষি সারগী, কংকাবতী দত্ত, নবারুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। দীপঙ্করের 'কার্ল মার্কসের বউ ও অন্যান্য গল্প' ভাষায়, রচনায়, বক্তব্যে চটুল চালাকি, বাগাড়ম্বর অহেতুক নগ্নতা ঘুরে-ফিরে আসে। নবারুণ ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে কিছু অন্য বিষয়ের গল্প লিখে নিজেকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'হালাল ঝাণ্ডা' সামাজিক অবক্ষয় রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারকেই বিশেষভাবে ফোকাশ করে। প্রাচীন কথকতা, রূপক লোককাহিনী, মিথ, প্যারাবল্ এসবের সাথে সাহিত্যের 'হিং-এলাচ' মিশ্রণে

নতুন লেখক দেবর্ষি সারগীর 'রাজার জ্ঞানতৃষ্ণা'। এতে রাজার জ্ঞান তৃষ্ণা মিটলেও সৎ পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণে তিনি এত উদাসীন কেন? সম্ভাবনাময়ী লেখিকা কঙ্কাবতী দত্ত তার প্রথম গল্পগ্রন্থে যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছিলেন তা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হতে চলেছে। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, প্রতিভা বসু, নবনীতা দেবসেন-এর প্রদর্শিত পথে কংকাবতী যদি না হাঁটতে চান—তাহলে তাঁকে নিজেকেই পথ খুঁজে নিয়ে এগোতে হবে। এ দেশে মেয়েদের কপালে যে রকম অযাচিত প্রসংশা জোটে—তা অনেক সময় তাঁদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আশা করব, সাহিত্যের 'সাইড এফেক্ট' উপেক্ষা করে কংকাবতী ক্রমশ পরিণতির দিকে এগোবেন। সৌমিত্র লাহিড়ী নতুন লিখছেন। তাঁর 'আমার অথবা আপনার গল্প'—বইতে গতানুগতিক সুর থাকলেও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে গল্পগুলি নিতান্তই সাদামাটা। অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ভাল কিছু গল্প লেখার চেষ্টা করছেন। লেখা সম্বন্ধে তাঁকে আরো অনেক যত্নশীল হতে হবে। স্বপন সেনের 'ঝুপড়ির বাসিন্দা' ভাল লেখা। দীর্ঘদিন এই লেখকের কোন গল্প চোখে পড়েনি।

'ষাটের দশকের শুরু থেকেই যে সমস্ত সাহিত্য আন্দোলন দানা বেধেছিল তাকে অস্বীকার করলে সময়'কে অশ্রদ্ধা জানানো হয়। শাস্ত্র বিরোধী, নিম, হাংরি ইত্যাদি যে সব আন্দোলন সে সময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তার সময়রেখা সত্তর দশককে ভাবিয়ে তুলেছিল। ষাটের দশকে বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সাহিত্য নির্যাস উঠে এসেছিল তা 'বাজনার চেয়ে খাজনা বেশী'র নামান্তর। ফলে, ষাটের দশক 'আপাত বন্ধ্যা' দশক। বাংলা সাহিত্যের 'TENT MOVEMENT' সত্তর দশকে ঘনীভূত হয়নি। এই দশকে লেখকরা ছিলেন স্বাধীন। তাঁদের কলম ছিল আপোষহীন। মাটির কাছাকাছি তাদের যাতায়াত ছিল। আশির দশক সত্তরের দশককেও ছাড়িয়ে গেল উৎকর্ষে, অভিনবত্বে, চমৎকারিত্বে। সত্তর দশক যদি গল্প মুক্তির দশক হয় তাহলে আশির দশক গল্প নির্যাসের দশক। এই দশকের লেখকরা বস্তুনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও আপোষহীন। তাদের কলম মাটি থেকে রস তুলে নিয়ে ছোটগল্পের চারা গাছকে বৃক্ষে রূপান্তরিত করছে। একাজ সাহসের, পরিশ্রমের, মেধাও প্রতিভার।

আশির দশকের প্রথম ভাগে শৈবাল মিত্র, অমর মিত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'থার্ড লিটেরেচার' আন্দোলনের (পাশ্চাত্যে ৪০ দশকে ব্যর্থ) সূত্রপাত ঘটালেন—যার বাস্তবতা 'অলীক গাছের ফল'। বলতে দ্বিধা নেই—বাংলা

সাহিত্যের অন্যান্য আন্দোলনের মতই 'থার্ড লিটেরেচার' আন্দেলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল।

কল্লোল-এর পরে ষাটের দশকে বাংলা গল্পে যে খরা চলছিল—সত্তরের দশকের জলসেচে তাতে প্রাণের স্পন্দন এলেও যৌবনের হিল্লোল ছিল না। আশির দশকের তারুণ্যে বাংলা গল্প এখন বেগবতী নদী—বিগত সাত বছরের মৌসুমী বৃষ্টিপাতে সে এখন কানায় কানায় পূর্ণ। আশাবাদী পাঠক ভবিষ্যৎ উন্মুখ সময়ের দিকে তাকিয়ে, যেখান থেকে উঠে আসবেন আর একজন রবীন্দ্রনাথ, মাণিক, তারাশংকব।

। ১০০ বছরের বাংলা গল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ণ নিয়েই এই প্রবন্ধটি। বাংলা গল্পের হালফিল সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তার অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন বিশ্লেষণাত্মক লেখা সচরাচর খুব কম দেখা যায়। এ ধরণের যে কোন বিতর্কিত লেখাই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। লেখকের নিষ্ঠা ও সততার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। তবুও যদি কোন মন্তব্য কাউকে কষ্ট দেয়, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থী।—**সম্পাদক**]

প্রসঙ্গ : এই সময়ের ৪ জন বিশিষ্ট গল্পকার

সমীরণ মজুমদার

বাংলা ছোট গল্পের অমৃতধারা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আশির দশকেব এই বিক্ষিপ্ত সময় পর্যন্ত ক্রমাগত ভাঙ-চুর এর মধ্য দিয়ে আজ যেখানে দাঁড়িয়ে সে সমস্ত কিছুরই বিক্ষিপ্ত আলোচনা বহু পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। কল্লোল, কালি-কলম-ভারতী ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্পের সাগর মন্থন যখন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত তখন গরল নিষ্কাষিত বঙ্গ সমাজের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, খরা বন্যা, আকাল-মহামারী গর্ভস্থ ভ্রূণের আকার নিয়ে ফিরে এসেছে প্রকৃতির অলিখিত শর্তে। তিরিশ দশকের পর থেকে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় অবধি বাংলা ছোট গল্পের মর্মমূল জীবন তত্ত্বের গভীরে প্রোথিত ছিল। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এল তার আমূল পরিবর্তন। ষাটের দশকের শেষ থেকে শুরু হল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন যন্ত্রণার তথ্য সমৃদ্ধ গল্প অনুসন্ধানের পালা। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গল্পকে নতুন আঙ্গিকে নতুন গদ্য প্রকরণের মধ্য দিয়ে উত্তবণের রাজকক্ষে পৌঁছে দেওয়া। নিম, হাংরি, শাস্ত্র বিরোধী ইত্যাদি গদ্য আন্দোলনের পর এল সত্তরের দশক। পরীক্ষা-নিরীক্ষার খোলোস তখন উঠে গেছে, গদ্য বাতায়নে বইতে শুরু করেছে জীবন গন্ধী মৃত্তিকাস্পর্শী মনন সমৃদ্ধ গল্প। সত্তরের শুরুতে আমরা প্রতিভাবান অনেক লেখকই পেলাম, যাঁরা তাঁদের বলিষ্ঠ লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন—বাংলার ছোট গল্প অ্যামিবা হাইড্রার মত ক্ষীণজিবী নয়, তার ব্যাপ্তি এবং বিশালতা অনেকট। বঙ্গোপসাগরের মতই। এই সময অনেকের সাথে যাঁরা বাংলা ছোট গল্পকে একটি পরিমার্জিত সীমারেখার কাছাকাছি দাঁড় করালেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হলেন ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র এবং তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এ'রা সকলেই

সত্তরের যুগ সচেতন বস্তুনিষ্ঠ লেখক। এল আশির দশক। এই দশকের একমাত্র আন্দোলন থার্ড লিটারেচার যখন ব্যর্থ, ঠিক সেই সময় আমরা পেয়ে গেলাম আশির দশকের একজন তরুণ গল্পকার অনিল ঘড়াইকে।

যারা যৌনগন্ধী, সুড়সুড়ি, বুকের ডায়মেনশান, নিতম্বের প্যারামিটারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে কলম ধরেছেন ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বা অনিল ঘড়াই-এর লেখা তাদের কাছে কচি নিমপাতা এবং কাঁটা বেগুনের চচ্চড়ি। খেলে বদহজম হবার আশঙ্কা। এমনিতে যাঁদেব শরীরের পিত্তের পরিমাণ আগে থেকেই কম, তাঁদের কাছে জোর করে এর আস্বাদন নেবার কথা বলা বাতুলতা মাত্র। এই সময়ের বিতর্কিত এই চারজনকে আমরা আলোচনাব যোগ্য বলে বেছে নিয়েছি কেননা এঁদের আত্মনিমগ্ন লেখনীর সততা, সাহিত্য উপাদান, মৌলিকত্ব আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। এঁদের লেখায় সমাজ এবং গ্রামজীবন—দুধ এবং দুধের সরের মত অবিচ্ছেদ্য, সমধর্মী। এঁরা জানেন নিম্নজ শ্রেণীর দুরারোগ্য জটিল সমস্যা, নিম্ন-বিত্ত আর উচ্চবিত্তের দ্বন্দ্ব, পাশাপাশি ক্ষুধা এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি নিরূপণের কৌশল। সৎ পাঠকের যা Requirement তা অস্বীকার করার ইচ্ছে এঁদের নেই। ৬০% প্রেম, ২০% সুড়সুড়ি, ১০% যৌনতা, ১০% সেণ্টিমেন্ট দিয়ে যে কাগজে গল্প লেখা হয় এঁদের গল্পগুলি সেই জাতের নয়। এঁদের কলম দুঃখী মানুষের দুঃখে মর্মাহত হয় আবার প্রতিবাদেও গর্জে ওঠে। এঁদের লেখায় গ্রাম-শহর পাশাপাশি, মাখামাখি, কোন লেবেল আঁটা পার্টির ইস্তাহার নয়।

সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের গল্প আঙ্গিনায় ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র এবং তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভাগমন। অনিল ঘড়াই আশির শুরুতেই নদীয়া, মুর্শিদাবাদের অবহেলিত গ্রামকে তুলে আনেন সাহিত্যে। বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক এঁদের পিছনে ছিল না। মুষ্টিমেয় পাঠকের আনুকূল্য ছাড়া এঁদের ভাগ্যে এখনো প্রকাশনা জগতের শিকে ছেঁড়েনি। মুষ্টিমেয় কতগুলি পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত ছড়ান-ছিটান কিছু গল্প ছাড়া এঁরা তেমনভাবে নিজেদের সাহিত্য সম্পদ নিয়ে বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর কাছে পেঁছাতে পারেননি। আশির দশকের প্রথমদিকে 'অমৃতলোক' প্রকাশন সংস্থা থেকে ভগীরথ মিশ্রের প্রথম গল্প-সংকলন 'জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশিত হয়। এবং প্রকাশের সাথে সাথে লাভ করে বিদগ্ধ পাঠক সমাজের বিপুল অভিনন্দন। চকচকে প্রচ্ছদ ই যে আদর্শ বই-এর সব কিছু নয় একথা দ্বিতীয় দফায় প্রমাণ করেন এ সময়ের শক্তিমান গল্পকার ভগীরথ মিশ্র। 'লেবারণ বাদিগর' তাঁর দ্বিতীয় গল্প-সংকলন।

'বাঘের ডাক', 'জাইগেনসিয়া' 'কাত্তিকের কড়চা', 'পোকা মাকড়' ও 'দুভিক্ষ ও বেহালা বাদক' ইত্যাদি গল্প তাব প্রথম গল্প গ্রন্থের মান বাড়িয়েছে। 'জাইগেনসিয়া' একটি অসাধারণ গল্প। গোপেশ্বর শোষণের প্রতিভূ। নকুল শোষিতের জ্বলন্ত উদাহরণ। শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্ব এ গল্পে সার্থকভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। 'এ দুনিয়ায় কতো দূর পর্যন্ত মথুর পালের এলাকা' নকুল জানে না। আর জানে না বলেই তাঁর জীবন সংগ্রাম নিরন্তর প্রবহমান। 'বাঘের ডাক'-এ বিন্দো জানে 'আজ আর উত্তুরে হাওয়া বইছে না'। তার পেছনে শীতার্ত জগুয়ার অসংখ্য উপস্থিতি সে উপলব্ধি করে। জন সমর্থনের উষ্ণতায় নিজেকে মুড়িয়ে বিন্দো ভকত একনাগাড়ে বাঘের ডাক ডেকে যায়। কারণ 'ন্যাপের মধ্যে ভয়ে-ডরে পেরাণটি একেরে আধমরা, বাঘ বলে কতা !' চক্ষু কর্ণ লেপে ঢাকা উপোসী বাঘেরা, সংঘবদ্ধ বাঘেরা যে এগিয়ে আসছে থাবা মারতে সেকথা এখনও নিদ্রিত বাবুদের অজানা। 'কাত্তিকের কড়চা', 'পোকা-মাকড় ও 'দুভিক্ষ ও বেহালা বাদক' গল্পে বাস্তব জীবনের করুণ রসধারাটি প্রাণময় হয়ে উঠেছে। ভগীরথের মুন্সিয়ানা তিনি গ্রাম গঞ্জের মাটি গাছপালা কথ্য ভাষা ভাল মতন জানেন, মনে হয় এখানে যেন তাঁর জন্মগত অধিকার। মানুষের মনের গভীরে ঢুকে স্বচ্ছ চোখে সব কিছু দেখে নিতে পারেন ভগীরথ, তাঁর এই দেখায় কোন কষ্টকল্পিত ধারাভাষ্য নেই।

'লেবারণ বাদিগর'-এ ভগীরথ অনেক বেশী পরিণত, তাঁর 'পথ', 'কদমডালির সাধু', 'ইন্দর যাগ', 'লাবণের বয়স', 'ঝোর-বন্দী', 'হুলমারার ভমরা মাঝি' ও 'সে ফেরেনি' এই সমস্ত বিখ্যাত গল্পগুলি স্থান পেয়েছে। 'লেবারণ বাদিগর' ডোমের ছেলে। তার মনের মানুষ শশী বাগলার মেয়েটা হলুদ জলে ছাপানো লাল পেড়ে শাড়ি পরে। দু' পায়ে রুপোর মল পরে ঘুরে বেড়ায় ঘরময়। তারই নিষ্করুণ কাহিনী এ গল্পের উপপাদ্য। লেবারণের বিয়ে করা বৌ মাত্র কুড়ি টাকার জন্য বৌ হয়ে যায় কেদার বুড়োর। এই জটিল মনস্তত্ব নিয়ে ভগীরথের 'লেবারণ বাদিগর'। নারীমন এখানে খোটায় বাঁধা গোরু। সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই শক্ত। ভোজ বিদ্যা, কুহক বিদ্যা, মধু বিদ্যা, ডাকিনী বিদ্যা, কাক চরিত্র কতই না বিদ্যে আছে এ সংসারে। এসব বিদ্যে পাকাপোক্তভাবে রপ্ত করেছে লখীন্দর। তার রক্তে জ্ঞান-পিপাসার টান। গ্রাম যখন খরায় জ্বলছে 'ইন্দ্র যজ্ঞের' আয়োজন করতে চায় ভৈরব গাঙ্গুলী। যদি বৃষ্টি ধারায় শান্ত হয় ধরণী এই আশায়! কিন্তু সমস্ত মানব কল্যাণের কথা না ভেবে সে কেবল চিন্তা করেছে নিজের 'শুখা খেতটার' কথা। চরম স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত এমন বুঝি আর

হয়না। লখীন্দর রাজী হয়না সেই 'ইন্দর যাগ' করতে। ভৈরব গাঙ্গুলীর সমস্ত জমিতে ঘুরে ঘুরে পেচ্ছাপ করে লখীন্দর। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পিছনে তার কোন মোহ নেই, জাগতিক কল্যাণের জন্য সে তার সমস্ত শ্রম এবং নিষ্ঠাকে বিনিয়োগ করতে চায়। এমন একটি অসাধারণ লৌকিক চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন, প্রায় অলৌকিক বিষয়কে পাঠকের কাছে লেখনীর গুণে বিশ্বস্ত করে তোলেন. প্রতীকি ব্যঞ্জনায় বাস্তবায়িত করার এমন আধুনিক প্রক্রিয়াই প্রমাণ করে লেখকের প্রখর শক্তিমত্তার রূপটিকে। প্রতিটি পংক্তি পাঠককে আপ্লুত করে। কাব্যময়তায় গদ্যের স্বাদ আরো সুন্দর, ধারালো হয়ে ওঠে। প্রকৃতির রূপ চিত্রায়ণে দক্ষ তাঁর কলম। ভাষা ও বাকরীতিতে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সার্থক। তারাশঙ্কর বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত থাকলে ভগীরথকে নিয়ে এতদিনে হৈ চৈ ফেলে দিতেন। বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছাতে এত বেগ পেতে হোত না।

'তিরিশ বচ্ছর স্বাধীন হলাম আমরা। ইখন তক্ একটা পথ পেল্যাম নাই হাটা-চলার!' 'পথ' গল্পের এই বক্তব্য আমাদের ভাবিয়ে তোলে। ঘুমন্ত গ্রামগুলোর বুকে অশিক্ষা-কুশিক্ষার বদ নিঃশ্বাস এখনও প্রবাহিত। এর থেকে মুক্তি কোথায়?

'বগমডালির সাধু' ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বিসর্জন দেয় তার নিজের চালা-ঘরে। যে ভাতের জন্য তার তীব্র আকুতি ছিল সেই লাল চালের ভাতই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'হুলমারার ভমরা মাঝি', 'ঝোর-বন্দী', 'সে ফেরেনি' সর্বত্রই ক্ষুধার তাড়না গ্রাস করে, যদিও ঘটনা বিন্যাস অন্যখাতে বহমান। ক্ষুধার রাজ্যে ক্ষুধাই প্রকট হয়ে উঠেছে ভগীরথের গল্পে। কুয়োকাটা মানুষের গল্প 'ঝোর-বন্দী'। 'বহু কষ্টে উপরের দিকে তাকাল গগন। চোখ দুটো আবার ধাঁধিয়ে গেল তার। ঝকঝকে কাঁসার থালা বলে মনে হল আকাশটাকে।' ঝোর-বন্দী গল্পের সূচনা হয় এইভাবে। কুয়ো কাটতে গিয়ে গগনের মৃত্যু আমাদের বোধকে নাড়া দিয়ে যায়। লেখকের অভিজ্ঞতার পরশ আমাদেরকে স্নিগ্ধ করে।

এমনই একটি অসাধারণ গল্প 'অন্নপূর্ণা গাছ'। ক্ষুধার তাড়নায় হেরে যাওয়া এক দুঃখী মানুষের জীবন সম্পৃক্ত গল্প। পবন শিকারী'র আত্ম বিশ্লেষণ এ গল্পের সম্পদ।

ভগীরথ মিশ্রের গল্পে চিত্রকল্প, উপমা, ভাষাশৈলী অসাধারণ। প্রায় প্রতিটি গল্পেই ঘটনার সাথে বর্ণিত মানুষের জীবনের একাত্মীকরণ এক দুর্লভ সমন্বয়।

বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর গল্পগুলি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ। বাংলা গল্পের দুর্দিনে ভগীরথ মিশ্রের গল্পগুলি অবশ্যই স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার।
তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি অন্ত্যজ শ্রেণীর। মার খাওয়া মানুষ, কিন্তু বেঁচে ওঠার প্রাণ শক্তিতে তারা ভরপুর। শহরকে চেনেনা। শহুরে মানুষ সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা, বিষাদ ও জেহাদ। 'হুলমারার ভমরা মাঁঝি'-র মফঃস্বল শহরের কৃষি মেলার অভিজ্ঞতা বড়ই মর্মস্পর্শী। 'এ কুন দ্যাশের চাষা আইজ্ঞা। কি খাইয়েঁ অমন পাকা কাঁঠালের পারা গতরটি বানিয়েছে? ···· এই ঐশ্বর্যময় স্বর্গোদ্যানকে একটা নির্বান্ধব ভয়ংকর শ্মশানভূমি মনে হয় ভমরা মাঝির। ক্ষুধায় তার বউ টলে পড়ে. —বস্তুত এই বৈপরীত্যই ভমরা মাঝিকে ঠেলে দেয় সেই মুহূর্তের দিকে·······।' আবহমান কালের সঞ্চিত ক্রোধ, ক্ষোভ, বঞ্চনা, ঘৃণা ও আক্রোশে ফেটে পড়ে ভমরা মাঁঝি। খুন করতে বাধ্য হয় নকল সেরিয়া (সেরা) চাষীকে। ভগীরথ মিশ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি কখনই কাল্পনিক মনে হয় না। গল্পে তারা নিজেরাই কথা বলে নিজেদের অস্তিত্বকে সকলের কাছে সঠিক মূল্যায়নের সঙ্গে তুলে ধরে। তারা মার খায় বারবার, এই সমাজে তাদের সংখ্যাই বেশি। সমাজ তাদের বাঁচতে দেয় না। সভ্যতা, শহর, আইন, প্রশাসন তাদেরকে হত্যা করে। গ্রামীণ পটভূমির নির্দিষ্ট ছকের বাইরেও তাঁর গতায়াত সাবলীল। 'ফ্যামিলি প্যাশন', 'বনসাই পাল ও পুজো ৯২'. "রাজার গোঁফ", "দুর্ভিক্ষ ও বেহালা বাদক" ইত্যাদি গল্পগুলি সেকথাই প্রমাণ করে।

এঁরই সমসাময়িক আর একজন সত্তরের কবি তথা আশির গল্পকার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম ও শহর দুদিকেই প্রসারিত করেছেন তাঁর কলম। প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত রেখে সেই অভিজ্ঞতাকেই তাঁর লেখনীতে তুলে ধরছেন। সাধারণ মানুষের জীবন, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, লোভ, প্রেম হীনতা, ক্ষুধা ইত্যাদি তাঁর গল্পের মুখ্য উপজীব্য। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা বেশির ভাগই গ্রামীণ সমাজের মানুষ। মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই, প্রশাসনিক ব্যর্থতা তার গল্পে নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়।

আলোচ্য চারজনের মধ্যে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অধিক পরিচিত লেখক। বিষয় বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব তাঁর লেখাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মাত্র গল্প সংকলন "সড়কের উপর নিমগাছ"।
এই গ্রন্থে বেশ কিছু ভাল গল্প স্থান পেয়েছে। 'ব্যভিচারিণী' তার অন্যতম। পদ্ম-লখীন্দরের জীবনযাত্রা এর আগে জানা ছিল না, সাপের সাথে পূর্ণাঙ্গ

মানুষের আত্মীয়তা, প্রেম, কাম, ক্রোধ এমন সাবলীলভাবে এর আগে পড়িনি। পদ্ম একটি পদ্মগোখরো সাপের নাম। তার সাথে প্রেম জমেছে লখীন্দর ওঝার। লখীন্দর সাংসারিক জীবনে অসুখী, অতৃপ্ত। বেঁচে থাকার সৌন্দর্যটুকু সে কুড়িয়ে নেয় পদ্ম নামের সেই বিষধর সাপের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত পদ্মও বেইমানী করে তার সাথে। পদ্ম এবং তার বিবাহিত স্ত্রী গোলাপীর সাথে কোন পার্থক্য নেই। সবাই এখানে বিশ্বাস ভঙ্গের অজুহাতে দায়ী। —'তা'লে তুইও গোলাপীর মতো!' লখীন্দরের এই মন্তব্য আমাদের এতদিনের সঞ্চিত বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। লেখক খুবই দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন এমন এক জীবনের কাহিনী যা এতদিন বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল। লাশকাটা ঘর' বদ্রু ডোমের জীবন যন্ত্রণার দলিল। এ লেখায় কোন ফাঁকি নেই। 'লাশকাটা ঘরের বর্ণনা পাঠক-কে দ্বিতীয়বার বিস্ময়ের রাজ্যে পৌঁছে দেবে। 'অওরৎটা কি বেওয়ারিশ নাকি রে!' বদ্রুর এই আশ্চর্য উক্তি বদ্রুর জীবনের সততাকে প্রমাণ করে। দুঃখী, অভাবী মানুষের চরিত্র চিত্রণে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি পাওয়া ভার। তাঁর গল্পে বিভিন্ন পেশার মানুষ এসেছে ভিড় করে। তারা কেউ মাছ ধরতে চলে যায় খাড়ি মোহনায়, কেউ মধু সংগ্রহ করে কেউবা আস্টেপৃষ্টে সাপের মালা পরে ঘুরে বেড়ায়, জীবিকা নির্বাহ করে। কাউকেই বানান বা মনগড়া চরিত্র বলে মনে হয় না। এই একটি মাত্র গুণের জন্য লেখকের বিরাট সম্ভাবনা ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজ্য প্রশাসন, সমসাময়িক বাস্তব পরিস্থিতি তাঁর গল্পে প্রায়শঃ চোখে পড়ে যা বিরক্তিকর বিবৃতি নয়, অভিজ্ঞতার আলোকে সাহিত্যস্নাত। 'বনদেবীর কর', কিংবা 'হরিণের মাংস' - এ লেখকের মর্মস্পর্শী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে যা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে অন্য কারোর লেখনীতে এত তীব্রভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। বিষয় বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব একটা খাঁটি গল্পকে অনেক সময় বিশেষ মর্যাদা দেয়। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গল্পগুলি প্রথাবহির্ভূত। তাঁর 'রাজ্যপালের অসুখ', 'ইঁদুর', 'মুখ্যমন্ত্রীর উপহার' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে প্রশাসনের সুচতুর শোষণের কৌশল, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, সর্বহারা মানুষের সঙ্গে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ব্যর্থ শাসন ব্যবস্থার দিকটিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সঙ্গে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। রাজ্যপালের অসুখ গল্পে—রাজ্যপাল জল-জঙ্গলের দেশ সরজমিন দেখতে এসেছেন। জেলার সব আমলারা ল্যাংবোট হয়ে ঘুরছে। জেলা প্রশাসন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে রাজ্যপাল সামলাতে। রাতের বেলায় চাপাটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে রাজ্যপাল বলেন—বহুত তকলিফ হুয়া। এম. পি., এ. ডি. কং মারফৎ

ডি.এম.কে নির্দেশ দেন—'কাছেই তো হাসপাতাল আছে. একবার প্রেসারটা দেখে নিক না।' রাজ্যপাল বিরক্ত হয়ে ডাক্তারকে বলেন—'ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি। আয়্যাম অফলি টায়ার্ড'। ডাক্তার তার পালস্ রেট ভালো মনে হচ্ছেনা বলেন। মুহূর্তে এ সংবাদে ডি.এম থেকে সব আমলারাই সন্ত্রস্ত এবং চিন্তান্বিত হয়ে ওঠেন। গভর্ণরের হাউস ফিজিসিয়ানকে ওয়ার মেসেজে মেডিক্যাল টিম সহ আসতে খবর দেয়। অনেক উৎকণ্ঠা অপেক্ষার পর ডাক্তার মাত্রে আসে। গালাগালি খেয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে থাকে ব্লকের ডাক্তার চৌধুরী। ভি. আই. পি-দের মফঃস্বল পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়, প্রশাসনের বাস্তবতার নিখুঁত চিত্রটি তপন তার গল্পে টো টো তুলে ধরেন অথচ সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের আকারে দেখিয়ে দেন সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপনের নগ্ন রূপটিকে। অসহায় ভাবে বেঁচে থাকার চিত্রটিকে এ. ডি. কং, ডি. এমকে রাজ্যপালের জন্য কার্ডিওলজিস্ট ডাকতে বলেন। ডি. এম. চিন্তিত হয়ে বলেন—এখানে হাসপাতাল কোথায়, ওই একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার। এম. পি. শুনে বলেন সে কি! এখানকার লোকের কি হার্টের ট্রাবল হয় না? তাদের চিকিৎসা হয় কি করে? এম পি বিরক্ত—বলেন এখানকার হাসপাতালে এতো খারাপ অবস্থা আগে কখনো জানানো হয়নি আমাকে। কোলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট ডাকতে বলে তিনি হাই তুলে পাশের ঘরে শুতে যান। তপন তাঁর গল্পে খুব নিখুঁতভাবে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ যে আজও চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত, দেশের যা কিছু উন্নতি, অগ্রগতি তা রাজনৈতিক দাদাদের কৌশলে মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তের দিকেই তাকিয়ে হয়েছে, গ্রামবাংলার চির অবহেলিত অসহায় ভাবে বেঁচে থাকার এই চিত্রটি নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছেন অথচ বিষয় এখানে শুধুমাত্র প্রশাসন এবং আমলা থেকে ভি. আই. পি-রা যেখানে মুখ্য চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অর্থাৎ প্রশাসনে থেকে তৃতীয় নয়ন দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন আর্ত দুঃখী মানুষের তথা ঘুন ধরা সমাজের বাস্তব চিত্রটি।

বাজার চলতি গল্পের স্টান্টবাজী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নেই। গল্পের চরিত্রের ভিতরে ঢুকে তাকে নাড়াচাড়া করে সাহিত্য উপযোগী করে তোলাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এ কঠিন কাজে লেখক সিদ্ধহস্ত। ভগীরথ সম্পূর্ণ-রূপে গ্রামবাংলার রূপকার কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচরণ গ্রাম থেকে শহরে—রাজধানীতে এ কারণেই তাঁর গল্প সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহণে সক্ষম। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহৎ মালিকানা গোষ্ঠীর কাগজগুলিতে লেখার সুবাদে

আলোচ্য দু'জন গল্পকারের চেয়ে বৃহৎ পাঠক সমাজের কাছে খুবই পরিচিত। পক্ষান্তরে ভগীরথ দীর্ঘ দিন লিখলেও তাঁর লেখা ছোট পত্রিকার পাতায় নির্দিষ্ট পাঠক সমাজের মধ্যেই বিচরণ করে। তপনের চেযেও ভগীরথ হয়তো যথেষ্ট শক্তিশালী (যদিও এভাবে এখনই মন্তব্য করা ঠিক নয়) কিন্তু প্রচারের অভাবে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের মুষ্টিমেয় পাঠকের মধ্যেই তৃপ্ত থাকতে হয়। —এ কারণেই তপন পরম সৌভাগ্যশালী। উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ভগীরথ গ্রামকে যতখানি চেনেন, তপন ঠিক ততখানি চেনেন আধা মফঃস্বল শহরের মানুষজনকে, প্রশাসনিক কাঠামোকে।

সত্তর দশকের আর একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার অমর মিত্র, সংযম এবং মনন সততায় সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন সেই সব মানুষ এবং পরিবেশ যা বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন। অমর তাঁর লেখায় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর কখনও বা ২৪পরগনার গ্রাম জীবনের বেঁচে থাকার নিষ্করুণ ছবিটি অতি দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলেন। অমরের কোন ভাণ ভণিতা নেই, চারপাশে যা তাঁকে আন্দোলিত করে তাকেই গল্পেরকাঠামোতে ধরে রাখেন তিনি। লেখার গণ্ডি সেই কারণে এক জায়গায় থেমে নেই অমরের, তাঁর ব্যাপ্তি বা প্রসারতা পাঠকের হৃদয়ভূমি ছুঁয়ে অন্যত্র বিস্তৃত। অরণ্যপর্ব, গাঁওবুড়ো,—সাঁওতাল, খেটে খাওয়া জনমজুর, হতভাগ্য মানুষদের হৃদয় উপলব্ধির সঠিক চিত্রায়ণ হয়েছে অমরের বলিষ্ঠ লেখনীর সাবলীল ধারায়।

অমর মিত্রের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা দুই। 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' তাঁর প্রথম গল্প সংকলন। প্রকাশিত হয় ১৯৭ সালে। সত্তরের বিতর্কিত এবং উচ্চ প্রশংসিত গল্পগুলি স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। মোট এগারটি গল্পের অসাধারণ সংকলন বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' কে। 'মেলার দিকে ঘর', 'প্রত্নতত্ত্ব', 'অরণ্যপর্ব', 'গাঁওবুড়ো' এই চারটি গল্প শিল্প গুণগত দিক থেকে বিশেষভাবে মর্যাদার দাবীদার। 'মেলার দিকে ঘর'-এ দারিদ্র্যতাড়িত মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের ক্ষয়িত মূল্যবোধ আজ যে কত বিপন্ন তা অমরের এই লেখাটি পড়লে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। 'অ-সদেব হলো কি, মেয়্যা তুর-কান্দে কিনো?' ক্ষুধার্ত জিহ্বায় অন্নের স্বাদ নিয়ে এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর সহদেবরা কি কোনদিন মাথা তুলে দিতে পেরেছে? তাই 'আর মেলায় যাবনি বাপ্ ঘরে নিই চল।' —লক্ষ্মী-র এই কাতর উক্তি নিরুত্তর সহদেবের কাছে নিজের গায়ের চামড়া ছুলে ফেলার চেয়েও দুর্বিসহ।

লক্ষ্মীদের ঘরে ফেরা হয় না। এই ঘরে না ফেরার গল্পই 'মেলার দিকে ঘর'। 'অরণ্যপর্ব'-এ মানুষের নিষ্ঠুরতা কখনো পাশবিক কখনো একরোখা, কখনো বা গতিহীন জগদ্দল পাথর। মনের ভিতর লুকান ক্রোধ-ঘৃণা-আক্রোশ সব ফুটে ওঠে প্রতিভার সহজ বিচ্ছুরণে। এ গল্পের কথনশৈলী নান্দনিক। ভাষার যথাযথ ব্যবহার ঈর্ষণীয়। 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'-এ সেই সব মানুষের কথা আছে, ছবি আছে, জীবন এবং জীবনাদর্শ আছে যা সর্বকালীন। 'হেই কাঁসাই নদীর উপারে / কামের খোঁজে যাইবনি / ই দেশেতে ঘর বান্ধবো / সঙ্গে লিয়া রমনী' কিংবা 'হেই মুরা জুতা পরিব মুরা পুষাকও পরিব, / উড়া জাহাজ লিয়া মুরা বিলাত উড়্যা যাইব।' —এরকম অজস্র অলংকরণ তাঁর গল্পকে দিয়েছে যুগোপযোগী উত্তোরণ। ভাষার উপর পূর্ণ দখল নিয়ে গল্পের লাগাম টেনে ধরেছেন অমর ঠিক সময়ে, একেবারে মোক্ষম মুহূর্তে। সংকলনের প্রতিটি গল্পে অমর আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন এমন এক ভাল লাগার জগতে যেখানে সুস্থ মানসিক আচ্ছন্নতা আপ্লুত করে স্বচ্ছ বিবেক বোধকে। 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' অমরের লেখক জীবনের প্রথম সিঁড়ি যে সিঁড়িতে পা রাখলে সাহিত্যের মাঠটাকে পুরোপুরি দেখা যায়, অনুভব করা যায়। সব থেকে বড় কথা, গ্রামীণ গল্প লেখেন অমর কিন্তু তাঁর গল্প কখনো গ্রাম্যতা বা চপলতা দোষে দুষ্ট নয়। তাঁর গল্পে ক্ষুধা আছে, হাহাকার আছে-আছে জীবন যাপনের ব্যর্থতা-দৈন্যতা কিন্তু সেগুলি এমন দক্ষতার সাথে অমর গল্পে এনেছেন যা পড়তে পড়তে লেখক-পাঠক একাত্মকরণের সুযোগ ঘটে। 'খাঁচার মানুষ' বা 'ভাবুক চরণ' অন্য ধরণের লেখা হলেও সাহিত্যরস ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'পার্বতীর বোশেখ মাস' বা 'দেবীভাসান'-এর নিটোল গল্পের আস্বাদন—মন ভরে ওঠে। 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'-এর বড় পাওনা অমরের ভাষা, অমরের গদ্য। প্রথা চলিত গদ্য রীতিতে তিনি যে একদম বিশ্বাসী নন তা তাঁর প্রতিটি গল্পেই প্রমাণিত। লেখার জন্য তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা, সততা এবং হৃদগ্রাকৃতি 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'-এ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রায় ৭ বছর বাদে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'দানপত্র' প্রথম সংকলনের মর্যাদায় কিঞ্চিত ধুলোবালি ছিটিয়েছে যা অমরের মত প্রতিভাবান লেখকের কাছে আশা করা যায়নি। 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'-এ অমরের যে শাণিত কলম আমাদের আচ্ছন্ন বা মুগ্ধ করেছিল—সেই উজ্জ্বল কলম সময়ের কষ্ট পাথরে ঘা খেয়ে ঈষৎ মলিন এবং গতানুগতিক। এমন একটি সংকলন প্রকাশের প্রাক্কালে লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অমর আরো নির্মম হলে তাঁরই উপকার হ'ত। 'আলোকবর্ষ' বা 'সুবর্ণরেখা' সৃষ্টিকর্তার এই খামখেয়ালীপনা অবশ্যই আহত করে তাঁর

মহিমাকে। তবু 'দানপত্র'-এ ভালো এবং মন্দের সহবস্থান। ভালো লাগেনি 'ভিতর ও বাহির', 'নবগ্রামের মেয়ে', 'শৈশব' তেমনি আবার ভাল লেগে যায় 'ডাইন' 'দানপত্র' বা 'হস্তান্তর'।

এই সংকলনের অসাধারণ গল্প 'দানপত্র' যা পড়লে অমরের সেই উন্মুখ সজীব কলমটাকে খুঁজে পাওয়া যায়। 'হস্তান্তর' ভালো লাগা গল্প কিন্তু পরিচ্ছন্ন মাত্রাবোধ এখানে আহত। 'ডাইন' গল্পে কুসংস্কারের পাশাপাশি অবিশ্বাস ঘোরতর হয়ে উঠেছে। এই সংকলনের একমাত্র অসাধারণ গল্প 'দানপত্র'-যা পড়লে লেখকের সহজাত দক্ষতাকে শ্রদ্ধা করতে হবেই। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে দানপত্র' অমর মিত্রের বলিষ্ঠ একটি গল্প যেখানে সত্তরের বহু আলোচিত সেই যুবক অমর মিত্রকে খুঁজে পাওয়া যায় একান্তভাবে। 'ভিতর ও বাহির'—পারুল নামের একটি মেয়ের ম্যাড়মেড়ে জীবন কথা যেখানে সাদামাটা গদ্যে লেখক একটি নারী মনের স্বচ্ছ আকাশকে পরিষ্কার করে দেখাতে চেয়েছেন। এগল্প স্বামীহীন পারুলের নিরাপত্তাহীনতার গল্প।

রক্তক্ষয়ী সত্তর দশকে রাজনৈতিক অবস্থা এক নতুন দিকে মোড় নিয়েছিল। শোষিত, নিপীড়িত জনতার মুক্তিকামী বিদ্রোহী যুবকদল কারো কারো মতে এই সময়ে উগ্রপন্থীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই রক্তাক্ত সময়েই বেশ কিছু উজ্জ্বল ছোটগল্প লিখেছিলেন তৎকালীন গল্প লেখকরা। আমরা সেই সময় থেকেই অমর মিত্রের লেখালেখির সাথে পরিচিত। অমরের শরীরে তখন ছিল অত্যাচারের দাগ, হাতে ছিল সুতীক্ষ্ম কলম। উল্লিখিত অপর তিনজনের সাহিত্য ফসলের সাথে আমাদের পরিচয় হয়নি তখনও। বলা যেতে পারে অমর এঁদের তুলনায় কিছু আগেই হাজির হয়েছেন গদ্য সাহিত্যের আঙিনায়। সত্তরে পরিচয়, অধুনা সাহিত্য, কবিপত্র, সংক্রান্তি, অমৃত পত্রিকাগুলির পাতায় তাঁর কিছু বিশিষ্ট গল্পের সাথে আমাদের পরিচয় হয়।

যদিও তাঁরই সমসাময়িক কালের লেখক অসীম রায়, স্বর্ণ মিত্র, শঙ্কর বসুরা আজ লিখছেন না! তাঁদের লেখায় বিদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল নিপুণ মুন্সীয়ানায় কিন্তু তখন তাঁদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন অমর তাঁর লেখায় এবং সৃজনশীলতায়। সেই সময় গ্রাম জীবন নিয়ে, অন্ত্যজ শ্রেণীর বেঁচে থাকার সংগ্রাম নিয়ে আর কেউ অমরের মতো দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে আসেননি। তাঁদের পটভূমি কোথাও কোথাও গ্রাম বাংলা

হলেও সেখানে মুখ্যভাবে নকশাল বাড়ী আন্দোলনকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, জটিল রাজনৈতিক জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে সেই সব গল্প। অমর কিন্তু তাঁর গল্পকে সেদিকে নিয়ে যাননি। তাঁর উদ্দেশ্য যদিও একই ছিল—অর্থাৎ সেই সময়কে চিহ্নিত করা, এবং এ কাজের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন পীড়াক্ত বন্যা জমির মতো—অবহেলিত শোষিত গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনকে যেখানে, আদিবাসী জীবন, সংস্কার, লোকগাথা এবং সংগ্রাম মুখ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর গল্পে। আঞ্চলিকতার গন্ডী ছাড়িয়ে সে সব গল্প কালজয়ী হয়ে আছে মননশীলতা, বিষয় উপস্থাপনার গুণে ও নির্মাণে। নিজস্ব মৌলিকতা এবং গ্রাম বাংলার নিশ্বাস প্রশ্বাস তাঁর গল্পে মেঘ ও রোদ্দুরের খেলার মত ঘুরে ফিরে এসেছে।

অমরের আর একটি দিক ছিল তিনি একই সাথে শহর, আধা শহর, এবং মফস্বল, মহকুমা শহরের মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েও গল্প লেখায় হাত পাকিয়েছেন। সেই সুবাদে কমার্শিয়াল কাগজগুলিতে তাঁর অবিরত লেখার সুযোগ ঘটে। যদিও মধ্যবিত্ত মানসিকতার যথাযথ উপস্থাপন তাঁকে তেমনভাবে বিখ্যাত করেনি যতখানি করেছে গ্রাম বাংলার পটভূমিতে লেখা গল্পগুলি। ভগীরথ এই আসরে অমরের পরেই এসেছেন এবং তিনি সত্তরের শেষ দিক পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কাগজগুলিতে লিখতেন। বিশেষ করে 'মধুপর্ণী'তেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কোলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের চিরকাল একটা অলিখিত বৈরীতা এবং দূরত্ব রয়ে গেছে। কর্মসূত্রে বাঁকুড়া জেলায় এসেই তিনি দক্ষিণবঙ্গের কাগজগুলির পাঠকের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করার সুযোগ পান। তাই তাঁর প্রচার অমর মিত্রর তুলনায় অনেক কম। দুজন লেখকই গ্রাম জীবনের সার্থক রূপকার। গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতায় দুজনেই পুষ্ট কিন্তু তাঁদের মেজাজ ও মানসিকতা স্বতন্ত্র। দু'জনের কলমই বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে খেলা করে। গল্পের বাস্তব পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তবু ভগীরথ-ই বড় বেশী সংযমী, বড় বেশী শক্তিশালী বলে মনে হয়।

অমর মিত্র আজ প্রতিষ্ঠিত গল্পকার। অমরের গল্পে পাই খরা, বন্যা ও দারিদ্রক্লিষ্ট ভূমিহীন বেগার শ্রমিক, আদিবাসী বর্গাদার। বিশেষ করে ভূমি রাজস্ব বিভাগে কর্মরত থাকার কারণেই হয়তো তিনি বামফ্রন্ট শাসিত গ্রাম বাংলার ভূমিব্যবস্থা তথা সরকারী খাসজমি বিতরণ, বর্গাশ্রমিক, জমি হস্তান্তর, বন্ডেড লেবার, এবং জমি নিয়ে মহাজনি কারবার ইত্যাদি বিষয়গুলি

তাঁর গল্পে খুবই দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। সেই সব জমির প্রকৃতি, ফসলের গন্ধ, জমি শ্রমিকের কর্মময় সংগ্রামী জীবন তাঁর গল্পে নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়।

অমর প্রকৃতি চিত্রায়ণের মাধ্যমে কতখানি দক্ষতার সঙ্গে তাঁর গল্পকে সাহিত্যরস-মন্ডিত করতে পারেন তা 'দেবী ভাসান' গল্পের শেষ ছত্রটি উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে—'তখন রাত গহীন। দূর পৃথিবীর কিনারা বেয়ে চাঁদ উঠে আসছিল গেরুয়া বর্ণ এক রুগ্ন শিশু। অল্প স্বল্প আলো হুমড়ী খেয়ে পড়ে থৈ পাচ্ছিল না অন্ধকারে। হাসফাস করছিল আলো হাওয়াহীন অন্ধ মানুষের মত এই জলমগ্ন পৃথিবীতে।'

অমর মিত্র বয়সে, মেজাজে তরুণ। আমরা তাঁর কাছে যেভাবে পেয়েছি রাঢ় বাংলার সংগ্রামী মানুষ, আকাশ জল মাটি হাওয়ার সঙ্গে তাদের ক্ষোভ, দারিদ্র ও বঞ্চনার ইতিহাসকে ঠিক সেইভাবেই মধ্যবিত্ত সমাজকে পাই না। মধ্যবিত্ত সমাজ আজ অবক্ষয়ের শেষ ধাপে উপনীত। কিন্তু সেরকম শক্তিমত্তার পরিচয় আমরা পাই না সমসাময়িক লেখকদের মধ্যেও। অমরের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আশা করি অমর আরও সংযমী হয়ে দক্ষতার সঙ্গে আগামী প্রজন্মের জন্য তেমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদা দেবে। তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন 'ভিতরে ও বাহিরে'।

গ্রামজীবনের একজন শক্তিমান রূপকার অনিল ঘড়াই। গ্রামবাংলার জীবন তার মানুষ, গণচেতনায় উদ্দীপ্ত মানুষের চিন্তা ভাবনা, সুখ-দুঃখ, সর্বোপরি বেঁচে থাকার জন্য জীবন সংগ্রাম নিয়েই অনিলের গল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে এবং তার পরবর্তীকালে ছোট গল্পের বিষয় বিন্যাসে, আঙ্গিক গঠনে, চিন্তা চেতনায় যে মৌলিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল অনিলের গল্পে তার সব লক্ষণগুলিই বর্তমান। তীব্র সমাজ সচেতনতা, সামাজিক বাস্তবতা, তীব্র জীবন সংগ্রাম, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারনা এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অনিল যথেষ্ট সচেতন। ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা বাংলা সাহিত্যকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে—অনিলের গল্পপাঠে তা বোঝা যায়। তাঁর রচনা ভঙ্গীর মধ্যে স্বাতন্ত্র রয়েছে। উল্লিখিত তিন জনের চেয়ে তিনি একেবারেই আলাদা। তীব্র বিশ্লেষনী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেন মানুষের অস্তিত্ব ও মনস্তত্বকে। ভাবালুতা নয় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি তাঁর জগতের মানুষকে দেখেন যে দেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র জীবিকার মানুষেরা বেঁচে থাকার সংগ্রামে অবতীর্ণ। মার খেতে খেতে হয়তো তারা শেষ হয়ে যায় কিন্তু মনুষত্ব ও বিবেক সেখানে সভ্য

মানব সমাজকে আঙ্গুল তুলে শাসন করে, মেকী ঝুটা স্বাধীনতাকে পদাঘাত করে। অনিলের দুঃসাহসী কলম অন্ত্যজ শ্রেণীর মনের গভীরে লুকানো কাম, প্রতি-হিংসা, লোভ, ক্রোধ এই সব প্রবৃত্তিগুলিকে কান ধরে হির হির করে জন-সমক্ষে হাজির করে। এই শতাব্দীর প্রখর বাস্তববাদী মানব দরদী এই লেখকের পরিচয় বাংলার সাহিত্যের পাঠকের আজো জানা হয়নি। কোন প্রচার নেই, বিগ ম্যাগাজিনে স্থান নেই, প্রকাশককুল যখন বিমুখ তখন তিনি একাই পর পর তিনটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কাক, পরীযান, আগুন এই সময়ের ছোট গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে উপযুক্ত মর্যাদার দাবীদার। বিজ্ঞাপনের কৌশল তাঁর জানা নেই তাই তিনি আজো অবহেলিত। অনিলের প্রতিবাদী কলম অবহেলিত গ্রামবাংলার কাঁচা নিশ্বাস, খরায় পোড়া মাঠ, চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট রুগ্ন প্রতিবাদহীন মানুষের মৌন মিছিল এই সভ্যতাকে উপহাস করতে করতে বুকের উত্তাপ নিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সেই অগ্নিপ্রবাহ তখন মেকী সভ্যতায় পুষ্ট সমাজকে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেয়। অনিলের গল্প তাই আলাদা করে খুঁজে পড়া যায়, পাঠ শেষে তৃপ্তির শ্বাস নেওয়া যায়। মধ্যরাতে ঘন অমাবস্যায় যারা নিজের প্রতিকৃতি দেখে চমকে ওঠেন তারা অনিলের গল্প পড়ে বিস্মিত হবেন। অথচ দুঃখের বিষয়, ক্ষোভের বিষয় তথাকথিত বুর্জোয়া সাপ্তাহিকীতে একটি যুগের গল্প নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন অনিল সেখানে আলোচিত হন না।

কাক গ্রন্থে এই সময়ের একজন দারিদ্র্যাহত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ বেকার যুবকের প্রতিবাদী চরিত্রের সঙ্গে অনিল আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এই যুবক আমাদের সকলের জানা চেনা। তার চোখ দিয়েই দেখান মেকী ঝুটা স্বাধীন দেশের আসল প্রকৃতি। যে কাক সেই নোংরা সভ্যতার সমস্ত পচা, গলা আবর্জনাকে গ্রাস করে সমাজকে সভ্য ও সুন্দর রাখে। একজন লেখক সমাজমনস্ক বস্তুনিষ্ঠ প্রখর বাস্তববাদী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী না হ'লে এমনভাবে কলম ধরা যায় না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর্তনাদ অবহেলিত যুব সমাজের সম্মিলিত প্রতিবাদে রূপান্তরিত করেন সুনিপুণ কৌশলে। মধ্যবিত্ত ঘুন ধরা সমাজের এমন নিখুঁত চিত্রায়ণ হাল আমলের লেখকদের মধ্যে আমরা ঠিক এতখানি তীব্রভাবে পাইনা।

পরীযান গল্পে ময়না, বগলাহাট গল্পের গঙ্গা, দ্বন্দযুদ্ধ গল্পের নরহরি বা খরা গল্পের চপলা, ন্যাসা বাগদী শেয়াল ধরতে যায় গল্পের ন্যাসা প্রভৃতি-চরিত্রগুলি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অনিল গ্রাম বাংলার অবহেলিত শোষিত নির্যাতিত, সম্প্র-

দায়ের বেঁচে থাকার সংগ্রামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরীযান গল্পে স্বামী পরি-ত্যক্তা 'ময়না' "খুঁটি উপড়ানো গোরু" তার শরীর লালসাতুরের দৃষ্টিতে ফালাফালা। পরীযান দেখে ময়না হাতের ফ্যাকাশে শাঁখা সিঁদুরের কথা ভাবে। তার চোখে জল আসে। রিলীফ কর্তা মালবাবুর চোখ পড়ে গঙ্গার শরীরে এবং তারই নির্দেশে দু হাতা খিচুড়ী বেশী পড়ে গঙ্গার পাতে এবং মালবাবুর হাত পড়ে গঙ্গার শরীরে। গঙ্গার বাপ বদনের হাতে মালবাবু খুন হয়। জেলা শহর থেকে পুলিশ আসে। আসে রিলিফ ও সাংবাদিক। তার আগেই আগুনে ছাই হয়ে যায় গোটা কয়েক কুটির। মন্ত্রী আসে। বর্চি অনাবৃত বুক নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসা শরীরের, আত্মহত্যার ছবি তোলে ফটোগ্রাফার। এভাবেই বুলগারহুইট বগলাহুটে পরিণতি পায়। অনিলের হাতে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা বেশ জোরালো এবং তীক্ষ্ন। লাশ খালাস গল্পে নিধু ডোম পুরুষানুক্রমে মেরুদণ্ড বিকিয়ে দেওয়া একটা চরিত্র যার কাছে সমাজবাদী আদর্শবান যুবক সন্ত্রাসবাদী হওয়ার পরও বিশ্বাস করে, সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয় এবং তার জিম্মায় আগ্নেয় অস্ত্রটা রেখে দেয়। সেই তপার মত ছেলেরা লড়াই করতে করতে হারিয়ে গেলে নিধু ডোমের মেরুদণ্ডে টানটান অনুভূতি উঠে আসে। নিধু ডোম থানার অধীনে লাশ ঘাঁটাঘাঁটির সামান্য চাকরীর তোয়াক্কা না করে, পেটের তাগিদের কথা ভুলে গিয়ে সে এক প্রতিবাদী অগ্নিপুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। থানা থেকে নিধু ডোম লাশ নিয়ে শহরে যাবার পথে নদীবক্ষে ভাসিয়ে দেয় তপা বাবুর মত এক যুবকের মৃতদেহ এবং সেই সঙ্গে তার অতীতের বিকিয়ে দেওয়া জীবনকেও বুঝি! দ্বন্দ্বযুদ্ধ গল্পে বিচিত্র পেশার মানুষ নরহরি কে আবিষ্কার করেন অনিল। যার কাজ মরা জানোয়ারের চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রী করা। ঝাড়ফুঁকের বিদ্যাও তার জানা আছে। ছোট ছেলে নারাণ দেশের ও দশের কথা ভাবে। সেই অপরাধে তার মৃত্যু হয়। পাশাপাশি নির্বাচন, বাংলা বন্ধ এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি। রেশনবাবু চাল গম পাচার করেন কালোবাজারে, গ্রাম-প্রধান তার হিসেব বুঝে নেয়। নরহরি দুর্গতির দিনে এই প্রধানের কাছে পাঁচ টাকা ধার চেয়েও পায় না। প্রধান সর্পাহত হয়। হাসপাতাল যাবার পথে নরহরির সাথে দেখা হয়। মৃতপ্রায় প্রধানের শরীরে উঠে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মন্ত্র পড়ে যায় নরহরি মৃতনারাণের স্মৃতিচারণার সঙ্গে এবং এক সময় নিজেই নারায়ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রধানের কণ্ঠনালী চেপে ধরে।

'খোঁয়াড়' গল্পে গোবরা মায়ের সঙ্গে বিবাদ করে না খেয়েই গুড় কলের কাজে চলে যায়। বোন অহল্যা জঙ্গল পেরিয়ে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে। গোবরা ফেরে

না। দেখা যায় অবেলায় গুড়কলে আগুন উঠছে লকলকিয়ে। গোবরা আর ফেরে না। কলের মালিক মহান্তিবাবু গোবরার মা-বোনকে নিয়ে চলেছেন গুড়কলে কারণ গোবরা নাকি ঘুমের ঘোরে ফুটন্ত রসের কড়াইয়ে ঢলে পড়েছে। অহল্যা জানে এ মালিকের কৌশল। দাদা মালিকের নেক নজরে পড়েছিল। তাই তার এই পরিণতি। ন্যাসা বাগদি শেয়াল ধরতে যায় গল্পে ব্যবসায়ী বঙ্কিমবাবুর আগোলদার ন্যাসা বাগদিকে বাবুর শহুরে বৌয়ের খিদমৎ মেটাতে জ্যান্ত শেয়াল ধরে দিতে হবে যে কোন মুল্যে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিষ্টুপদের খোঁচায় কখন যে সে একজন তুখোড় শিকারী হয়ে ওঠে নিজেই জানে না। নিজের বৌয়ের পেটে কার বাচ্চা নড়ন-চড়ন করে। সেখানেও সে শেয়াল বাচ্চার কান্না শুনতে পায়। অবশেষে শেয়ালের কামড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সে শেয়াল ধরে, তখন তার বাবু বলেন তোর মেয়েটাকে আজ রাতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস। শুনে সে এতটুকু অবাক হয় না। সে বুঝতে পারে সে শিকারী নয়, নিজেই শেয়ালের শিকার হয়ে গেছে কখন। নারী লোলুপতার আখ্যায়িকা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। চাতক, খোয়াড়, খরা গল্পগুলিতে দুর্গত মানুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লাশ খালাস, দ্বন্দ্বযুদ্ধ গল্পে প্রতিবাদী সত্তার উত্তরণের কাহিনী আছে। এই গল্প দুটিতেই গুরুত্ব পেয়েছে রাজনীতি ও প্রশাসনের ধারাবাহিক শোষণ-শাসনের কৌশল। পরীযান গল্পে আছে বিদ্রুপের স্পর্শ যার লক্ষ্য রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসন। লেখক গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন অবক্ষয়ী সমাজের ভাঙনের চিত্রটিকে—ক্ষমতাবান মানুষের চাপে এই সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষেরা কিভাবে নিষ্পেষিত হয়, বিপর্যস্ত হয় তার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে অনিলের বাস্তববাদী কলমে। মানুষ আত্মহত্যা করে, খুনী হয়, কাউকে মরতে হয় সাজানো দুর্ঘটনায়, জীবনের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয় এই সমাজ ব্যবস্থার কারণেই। এ সবের মধ্য থেকেই তার চরিত্রেরা পরিত্রাণের পথ আবিষ্কারের সংগ্রাম করে যায়।

বিশিষ্ট আঞ্চলিকতা গল্পগুলিকে দিয়েছে নতুন স্বাদ। গ্রাম-দারিদ্র্যের তীক্ষ্ণ চিত্র রূপায়ণ ও সহমর্মিতার জন্য অনিল স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল। একটা বিশেষ ভাষারীতি অবলম্বন করে অনিল গল্প লেখেন। ভগীরথ মিশ্রের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে অনিলের বিস্তর ফারাক আছে। এই ভাষারীতিকেই তিনি তার উদ্দেশ্য বহনের উপযুক্ত মাধ্যম বলেই মেনে নিয়েছেন। যদিও গল্পগুলির প্রতিটি চরিত্রের ব্যাপ্তি সীমাহীন।

অনিলের আগুন গল্পগ্রন্থের দুটি গল্প বাদ দিলে অবশিষ্ট সাতটি গল্পই গ্রামীন পটভূমিতে নির্মিত। ক্ষুধা, চালচিত্র, বালিগড় এবং আগুন এই গ্রন্থের

অসাধারণ গল্প। আগুনের মধ্যে আমরা এমন একটি প্রতিবাদী চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই— যেখানে পুণিয়া চাকরী হারাবার ভয়কে তোয়াক্কা না করেই ফেয়ারওয়েলের সভায় বলে ওঠে 'তোমাদের পায়ে ধরে চিরকাল বিতিয়ে দেবো এমন ভেবো না···আমার বাপ লড়ছে বুনো হাতির সাথে। মা লড়েছে পাহাড়ের সাথে। ঘরের মানুষটা তোমাদের মত শেয়ালের সাথে লড়তে গিয়ে জান কবুল করল।··· আমাকে তেমন খাটো ভেবো না।' বাঁশগড় গল্পে বেআইনী [illegible] ব্যবসায়ী ব্যাঙা এক বিশেষ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। প্রাত্যহিক সংগ্রামে জীর্ণ সেই চরিত্র। কষ্টের জীবনে বাঁচার টান প্রবল অভিঘাতে পূর্ণ। রাজনৈতিক [illegible] দালাল [illegible] যে নিরংকুশ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ঝুমুরের মতো শক্তিশালী গল্প ইদানিং গল্পকারদের কলমে দেখা যায় না। অনিল সাঁতরা গল্পকারের ভূমিকায় আজ অবতীর্ণ। [illegible] জঙ্গলে নূতন [illegible] গল্পগুলি। অনিল তার নির্দিষ্ট এলাকার বৃত্তে এসে আশির দশককে তার গল্পে সঠিকভাবে উপস্থাপন করুন। এখন বাংলার গ্রাম নয় সমগ্র ভারতবর্ষের জনজীবনের স্রোত ধারাটিকে আমরা তাঁর কলমে দেখতে চাই। তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে, যেখানে সামাজিক অসাম্য, রাজনৈতিক ভণ্ডামী সাম্প্রদায়িক সংঘাত এবং দেশজুড়ে এত মনুষ্য নিধন যজ্ঞ চলছে তার সঠিক চিত্রায়ণ চাই তাঁর গল্পে। আসলে অনিলের কাছেই এসব আশা করা যায় বলে, এমন দাবী। আমি নিশ্চিত, অনিল এসব দাবি মেটাবেন।

আলোচনাটির শেষকালে একটা কথা বলে নেওয়া সমীচীন, এখানে বর্তমান সময়ের চারজন তরুণ গল্পকার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু চিন্তা ভাবনা তুলে ধরা হ'লো। চারজনের লেখালেখির সময় সীমা দু'টি দশককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। প্রত্যেকই গ্রাম বাংলার কথাকার হয়েও স্বতন্ত্র। লেখার মননশীলতায় এ'রা চারজনেই একসাথে আলোচিত হতে পারেন। আশা করবো এ'রা যেহেতু বয়সে নবীন, শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আরো ধনী করে তুলবেন দীর্ঘ দিনে। এ'দের নিয়ে যদিও আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি। আগামী দিনে যোগ্য সমালোচকেরাই সেই সব বিচার বিশ্লেষণ মূল্যায়নের কাজ করবেন। একজন সাধারণ পাঠক হিসাবেই এখানে যা কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। কোন মন্তব্যকেই চূড়ান্ত বলে

ধরা উচিত হবে না। কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ আলোচনা প্রস্তুত করা হয়নি। লেখার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে যখন যেখানে যেমন বুঝেছি তাই বলার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন কারণে এ আলোচনার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এজন্য শ্রদ্ধাচিত্ত মনোভাব নিয়ে লেখক ও পাঠককুলের কাছে আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আলোচ্য চারজন লেখকের সৃজনসত্তার প্রতি গভীর আস্থা আছে বলেই এখানে তাদের নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি।

ভাতুয়া

মহাশ্বেতা দেবী

এবার ছিল দুরন্ত খরা, খেত-মাঠ জ্বলে গিয়েছিল। ধান তো হয়ই নি বলতে গেলে। কিন্তু কালী গরায়ের জমিগুলিতে পাকা ধানের শোভা দেখতে দেখতে কালীর ভাতুয়া পবনের মনে হল মনিব তার ডাং-পিশাচসিদ্ধ বা হবে। নইলে খাল নেই, বড় নদী নেই, এই খরা! আকাল এলো বলে— একা তার মনিবের খেতে এত ধান হল কেমন করে? মনিবের খেতে এত ধান! টাহালগুলি এবার ভরে যাবে। পবন টাহাল কেড়ে নিকিয়ে রেখেছে সেই কবে। পোষে মনিব্যান টাহাল পুজো করে রেখেছে। ধান উঠলে নবান্ হবে, তখন নোট বাঁধা হবে।

আর নবান্! আকাল বুঝি এল। বড়ান্ মায়ের অঙ্গ ফেটে রক্ত ঝরেছে, নিশিন্দা বুড়ি দেখে এসেছে মায়ের ফাটা অঙ্গে লাল পিঁপড়ে বাইছে। গ্রামলক্ষ্মী দেবী তো, আকাল এলে জানিয়ে দেন।

এ সব কথা শুনলে পবনের স্কুলে বিত্তি-পড়া ছেলে ভগীরথ বলে, হাঃ! জানায়ে দেয়। আকালের কথা জানায় তো আকালের উপায় কিসে তা জানায় না কেনে?

পবন বলে, মায়ের রঙ্গে লাল চুটি বায়। জানিস?

পিঁপড়ার বাসা কি চারিদিকে। তুমার মনিব মায়ের থানে দুধ ঢালে, তাতে ভি পিঁপড়া বায়।

তু সব জানিস?

পিঁপড়া সরাব। দেখ কেনে?

কি করবি?

"লাও মা জননী" বল্যে মায়ের মাথায় কেরাচিন ঢেলে দিব। দেখি পিঁপড়া থাকে কেমন?

পবন এ কথায় মাথা নেড়ে বলেছিল, সকল কেরাচিনি মনিবের ঘরে। উ পণ্চায়েতে সামিল হচ্ছে, খাতিরের মানুষরে দেয়। তু কুথা পাবি কেরাচিনি ?

উ কুথা হতে পেল ? মোরাদের তরে কেরাচিনি, রসিদ দেখায় হপ্তা পিছু দিতেছে, কিন্তুক কারো একবার মাসে, কারো দশবার, উর ঠেঙ্গে লিব।

উর সাথ বিবাদ করো্য না ভগীরথ !

বড় কাতর শোনায় পবনের গলা, বড় আর্ত। দু চোখে ওর ভয় চমকায়, দুই ঘোলা চোখে। একবেলা জল খাই, একবেলা ভাত আর বছরে একশো বিশ টাকার কড়ারে যে ভাতুয়া খাটে কালী গড়ায়ের বাড়ি, সেই ভাতুয়ার মনে 'মনিব' শব্দটি সম্পর্কে এমন ভয় থাকে বটে।

ভগীরথের বুকে ওই লোকটার জন্যে দুঃখ আর লোকটার চোখে ভয় দেখে রাগ একই সঙ্গে ফোঁসে। ভগীরথ ঘরের জীর্ণ ঝনকাঠটি চেপে ধরে নিজেকে সামলায় ও বলে, না না বাবা, বিবাদ করব কেনে ? কথার কথা বললাম বই তো লয়। আর—একটু হেসে পরিস্থিতিটি হালকা করে বলে, তুমার উ বড়াম মা মরুক কেনে পিঁপড়া কামড়ে ? আমর কি ? আমি উরে দেখতে যাব ?

ই-ভি তু আগে বলিস নাই, এখুন বলিস। জামু গ্রামের জননী উ বড়াম মা ! বান এলে উনি থামাবে, খরা এলে রঙ্গে টেনে নিবে—

উ তুমি যা শুন্যে বড় হল্যে, তাই বল বাবা ! আমি ভি যা শুনেছি তাই মেনে গিছি এতকাল—

এখুন মান না কেনে বাপ ?

মন ল্যেয় না।

উ অধর বাবু তুমারে লাচায়। উর কথায় ল্যেচে না, অ মোর বাপ, এতকাল সবারে লাচাল, নকসালীতে জেহেল গেল বুড়া বয়সে—তার বেত্তান্ত জানে না কে ? এখুন ভি ঘরে রয় না। ছাইকেল লয়ে ঘুরে বুঢ়াদের ধরে এনে পড়াতেছে—উরে ডরে মনিব।

ডর্যে ডর্যে তু কি পোকপতংরে ভি ডর খাও বাবা। অধর বাবুরে ডর্য কেনে ? কুনো মন্দ কাজ করে না সে, নিজ ঘরের ছামুতে মানুষজনরে পঢ়তে শিখায়, আইন বুঝায়।

বই হাতে ঘুর্যে কেনে ? তখুন উর ঘরে বই দেখলে দারোগা কত লাচত মনে নাই ?

বাবা ! ই সকল গোরমেনের বই। আইনের বই। বর্গাদারের হকটো বুঝি নিতে পারে আইন জানলে—খেত মজুরটো হক বুঝি নিতে পারে আইন জানলে—মোরা কিছু জানি না বাবা।

মোরা বর্গাদার লই ভগীরথ। খেত মজুর লই—ভাতুয়ার তরে কুনো আইন নাই।

আমি শুধাব তবে ?

আজ, মাচায় বসে মনিবের পাকা ধান পাহারা দিতে দিতে পবনের সব-কথা আবার মনে পড়ল। নিঃশ্বাস ফেলল ও। ভাতুয়া কি মানুষ না কি ? বর্গাদার বা খেতমজুর নয়—তাই তাকে বাঁচাতে কোন আইন থাকে না। ভাতুয়া আছে, ভাতুয়া থাকে. কিন্তু ভাতুয়ার কথা কোন সরকার ভাবে না। ভাতুয়া থাকতে আছে, সমাজে স্বীকার করতে নেই তার অস্তিত্ব।

একটা মানুষ কিছু জানে না. সে ছোট ছেলে। তার বাপ গরাইদের ঠেঙে আটশো টাকা ধার নিল। না নিলে তার জমি বাঁচে না। আটশো টাকা সে শুধতে পারবে না, ছোট ছেলেকে করে দিল ভাতুয়া। বলল, এক বেলা ভাত দিবেন বাবু, এক বেলা জল খাই। আর বছরে একশত বিশ টাকা মাইনা।

বাবুরা বলল, সাত বছরের ছেলে তোমার। এখন ছাগল চরাবে, হাঁস চরাবে, বাড়ির কাছে। এখন মাইনে হয় না। এখন ওকে দিয়ে ক পয়সার মজুরি পাব ?

বাপ বলল, ভাতে-জলপানে থাকুক। বারো বছর হল্যে মাইনা দিবেন মশায়। হাতে দিবেন না। উ টাকা কাটান দিবেন ধার হতে।

তাই হল। টিপছাপ দে।

সে আদ্যিকালের কথা। ছাগল চরাত পবন, হাঁস চরাত। দিনে ভাত খেত, রাত হলে কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে ঘরে ফিরত।

পবন কাঁদত। বলত, মারে বাবু! দুপার যেয়ে বিকাল হয়। তখুন ভাত দিবে। খিদা লাগলে কিছু দেয় না, চড় মারে, লাথ মারে। আমি রব না হোথা।

বাপ প্রবোধ দিত, ক-বছর বাপ ? তোর বয়স এক কুড়ি না হতে টাকা শুধে যাবে। বাস। ঘরের ছেলা ঘরে রবি।

বাপ হিসেব করে নিয়েছিল অধর বাবুর বাপের কাছে। অধর বাবুর বাবা বলেছিল, বারো বছর বয়েস থেকে উনিশ বছর বয়েস অব্দি সাত বছরে

আসল টাকা শোধ হবে গো। মজুরিতে সুদ কেটে যাবে। যদি ওরা শর্ত মানে।

উনিশ কেন, আজ পবনের বয়েস বিয়াল্লিশ হল। তিরিশ বছরে রাতদিন খেটে সেই আটশো টাকা শোধ হয়নি। পবনের বিয়ের সময়ে দুশো টাকা ধার নিতে হয় বাইশ বছর আগে। তাতে না কি সুদে আসলে অসাগর টাকা জমে গেছে। পবন মাইনের টাকাও হাতে পায় নি, বাপের সে জমিও গরাই বাবুদের পেটেই গেছে। বউটা গরাই বাবুদের বাড়িতেই গোয়াল কাড়ে। বাইরের পাট কাজ করে। আর খেত গুড়োয়। ঝরে পড়া ধান গুড়োয়। মনিব্যান অনেক বলে দেখেছে, বউ ভাতুয়া হতে রাজী হয় নি।

ভাতুয়া হব নাই। গুলাম করে রেখ্যে দিবে গ! ভগীরথের বাপ মোরে জনম দুখ দিল।

খরখর করে বউ। খর দড় গতিতে কাজ করে। বউই অধর বাবুর কাছে হেঁটে হেঁটে তাঁর পা ধরে ভগীরথকে প্রাথমিক স্কুলে ঢুকিয়েছিল। মনিব তাতে রেগে যায়। কিন্তু অধর বাবুর বাবাও ছিল স্বদেশী করা মানুষ, ছেলেও তাই। ওর বাড়িতে ভগীরথ ভাতও খেত। স্কুলে ঢোকার সময়ে ভগীরথের বয়স দশ। অধরবাবু বলল, তুমি বাপু স্কুলঘর রোজ ঝাটপাট দেবে, কাজ হল তোমার। পড়বে, আর হ্যাঁ, আমার বাড়িতেই খাবে।

স্কুলও অধরবাবুর তৈরি। তাঁরই বাড়িতে। আর পোড়োদের জমির ধানের ভাত খাইয়ে ছাত্র ধরে রাখার পরিকল্পনাও তাঁর। তাঁর অশৈল কাণ্ড-কারখানায় তিতবিরক্ত হয়ে বউ অনেক দিন ধরেই বাপের বাড়ি প্রবাসী। অধরবাবু জেলে থাকতে থাকতেই বউ মরে গেল।

ভগীরথের মত অনেক ছেলেই ওই স্কুলে এল গেল। কিন্তু ভগীরথটা যেন ও'র চেলা হয়ে গেছে। অধরবাবুকে মুরুব্বি ধরে কি হবে কে জানে? উনি বললে কি ভগীরথের কোন কাজকর্ম হবে কোথাও? এখন না কি ওকে টিকে ইঞ্জেকশান দিতে শেখাবেন সদরে পাঠিয়ে।

অধরবাবু ভগীরথের মানামান্যির লোক। অধরবাবু সকলকে আইন বোঝাচ্ছেন, পড়তে শেখাচ্ছেন, 'হকটো বুঝি নিতে পারে' যাতে। ভাল। খুব ভাল। কিন্তু অধরবাবুও পারে না সব কিছু। ভাতুয়া পবনের জীবনের দাসত্ব ঘোচাতে পারে না অধরবাবু।

মাচায় বসে পবন মাথা নাড়ল বার বার। আঃ। কত ধান! চোখটা কেমন করে যেন, তাই সোনালী ধান মনে হয় সোনার নাচন্ত সাগর যেন।

অধরবাবু অনেক পারত এক সময়ে। গ্রামেই থাকত না তখন। কোথায় কি করে বেড়াত কে জানে। কিন্তু গ্রামে এসে যখন মনিবকে বলল, কালীবাবু! সময় খুব মন্দ। ধান কাটাচ্ছে, বেশ করছ, সবারে সরকারী হিসাবে মজুরী দিবে। নয় তো ধান গোলায় উঠবে না।

পবন ভয়ে চোখ বুজেছিল। বাপ রে। মনিবকে অমন তেড়ে শাসিয়ে কথা বলা? কিন্তু মনিব মেনে নিয়েছিল সব। তিন বছর মনিব খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। পবনকেও খেতমজুরদের সঙ্গে দুপুরে ছুটি দিত। জলখাই দিত গরম ভাত।

এ সব সাহসের কাজ অধরবাবু পেরেছিল। কিন্তু ভাতুয়াটো, গুলামটো করি দিছে বাপ—ভাতুয়া জীবন হতে বাহার করি আনতে তুমি ভি পার না গ অধরবাবু। পুব আকাশ লাল হতে মনিব বাড়ি আসব আর বিহানের জলপান 'শালা কামচোর ভাতুয়া' গাল। আর পুরা দিন রাত অবধি খাটব গ। লাথ খাব, গাল খাব, ই হতে বাহার করি আনতে পার না গ অধরবাবু।

এখুন চক্ষে ভাল দিশি না সি বলতে ভি ডরো যাই। এত আইন দেখতেছ ভাতুয়ার তরে আইন নাই? ধান পওরা দিতে দিতে—মনিবের ধান পওরা দিতে দিতে—আমি কত হিসাব কষি।

সুদের হিসাব নয়। ভাতের হিসাব। ধানটো তো ভাতই হল, না কি বল? তা ভাতের সাগর পওরা দেই।

কত ভাত। কত ভাত—আর ই সব জমিনের মাঝে তো বাপের তিন কুড়া ভি সামিল আছে—তা এত ভাত দুনিয়াতে—ভাতের তরে ভাতুয়া তবে কেনে পবন? কেনে এমুন বেহিসাব ই হিসাবটো? অধরবাবু! ভগীরথ মোর বেটা। তুমার কথা চিন্তো মোর বুকে ভি বান ডাকে—কিন্তুক। চক্ষে দিশে না ভাল—আব ভাতুয়া হয়্যে কোমরটো ভাঙি গিছে, তাতে সব বুঝাতে পারি না। ডরো যাই। নিজেরে ডর খাই। ই কি। ভাতুয়া এত কথা চিন্তে কেনে? মনিব জানলে কাঁচা কঞ্চিতে চাম ছিঁড়ি দিবে নি ষ?

আঃ! ধান দেখলে পবনের এত কথা মনে হয়। মাচায় বসে বসে ও ভাবে আর ভাবে।

২.

অধরবাবু বললেন, ভগীরথ, তোমাকে যেন চিন্তিত দেখছি ভীষণ। কেন বল ত?

ওরা হাঁটছিলেন। বনের পথ ধরে। জামু গ্রামটি খুবই ভিতরে ঢোকানো। বেলে নদীর এ-পার ও পার জুড়ে এখনো জঙ্গল আছে। বনের পথে চলাফেরা করাই সুবিধের। ব্লক আপিস, বড় স্কুল, পঞ্চায়েত আপিস, সবই বেলেগ্রামে। বেলে আর গ্রাম নয়, গঞ্জ এখন। থানাও ওখানে। ও'রা বেলে থেকেই ফিরছিলেন। অধরবাবু হাঁটাহাঁটি করছেন যাতে এ বছর জামুর মত অরাজনীতিক, পিছিয়ে থাকা জায়গায় সরকারী খেতমজুর শিবির হয়, সে জন্যে। সেটলমেণ্ট অপিসে। ভগীরথ ও'র সঙ্গেই থাকে। অধরবাবুর প্রশ্নে ভগীরথ চমকে উঠল না। অপ্রতিভ হেসে বলল, বাবার কথাটো ভাবি।

কি ভাব ?

অনেক কথা মনে উঠি গিছে।

কি হয়েছে পবনের ?

আপনি তো আমাদের হক লয়ে লড়—

কি ব্যাপার, বল তো ?

আগে আপনার মুখে এত আইন বুঝাবার কথা শুনি নাই। পড়া শিখাবার কথা শুনি নাই—

এখন কেন শোন। তাই তো ?

হ্যাঁ মাশায়, তুমি বল, আমি শুনি।

চল, নদীর পাড়ে বসি।

ঘরে চল আপনি। বাতাসটো হিম জাড়া এখুন।

চল। তবু তো এখানে ঠাণ্ডা পড়ছে। ঠাণ্ডা পড়বে। কিন্তু শহরে ঠাণ্ডা নেই, জল না হইলে ঠাণ্ডা পড়ে ?

হিম জাড়ায় দিন মানে রোদ সে'কি। সাঁঝে কাঠলতা জ্বালি, আর গরাই বাবুরা শীতে সাজন করে কত। বাবারে কুনো দিন শুধায় না, হ্যাঁ পবন, গায়ে দিতে কিছু আছে ? ছি'ড়া পি'জা লেপ একটো চেয়েছিল বাবা, বলল, কিনে লে।

ওরা বন পেরিয়ে জামু ঢুকল। ভগীরথ বলল আপনি আগাও, আমি মায়েরে কেরাচিনটো দিয়ে আসি। না, ই ঠিক হছে নাই, কালী গরাই বড় মাতবরী করতেছে। কেরাচিনি দেয় না কেনে ?

ওরা বা কি দোষ বল ? চিরকালের বড় চাষী, চিরকালের মাতব্বর কেমন সুড় সুড়িয়ে ঢুকল পঞ্চায়েতে—অ্যাঁ ? পার্টির দিলীপ, রাজেনবাবু

সব জেনেও কেমন মেনে নিল। আর তোমরা কি দেখলে? এ সরকারের আগেও কালী গরাই ছিল মাতব্বর। এখনো সেই মাতব্বর।

ভোটে ইরাই জিতবে। না জিতলেও কালীবাবুই মাতব্বর র'ত হেথা! উ জামু গ্রামের সুরজ। উয়ারে না দেখে মোরাদের উপায় নাই। সরকার বদল, পার্টি বদল, কালীবাবুর রবরবা একোই থাকে।

গম্ভীর হয়ে গেলেন অধরবাবু। বললেন, বলেও এসেছি। হাঁটছিও অনেক। কালীকে বলব না আমি, তাহলেই বলে, আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কেরোসিন এখনি। বাপরে, আপনি নিজে এলেন কেন?

ডর খায়। ভাবে তখন লকসালী উঠেছিল, মোজা কাঁপায়ে দিচ্ছিল, এখুন ভি আর আর মোজা গরম, জঙ্গল মহালে বাস। তাই তখুন তো পলায়ে গিছিল সেই হাওড়া।

ভগীরথ বাড়ির দিকে গেল। অধর নিজের বাড়ি ঢুকলেন। বাড়ির সামনের ঘরে স্কুল। পিছনের ঘরে ও'র আর ভগীরথের বাস। পৈতৃক ধান জমি উনি বহুকাল হল মাহিন্দারদের দিয়ে রেখেছেন। ওরাই ও'কে খোরাকী ধান দিয়ে যায়। পুরনো মাহিন্দার গোকুলের বউই রাঁধে। ও'র, ভগীরথের ও পোড়োদের ফ্যানভাত। স্কুলের মঞ্জুরি মিলেছে, এখন মাষ্টারের মাইনেও সরকার দেয়। মাষ্টারটি গরাই বাড়ি থাকে ও ও-বাড়ির ছেলেদের পড়ায়। অধরের গর্ব, মাষ্টারও একদিন এ স্কুলে পড়ত।

ভগীরথ ফিরে এল, দুজনে খেলেন ওবেলার ভাত ও কাঁচকলার তরকারি। কাঁচকলা, পেঁপে, এগুলি ভগীরথের চেষ্টায় ও শ্রমে বাড়িতেই হয়।

বিড়ি ধরিয়ে অধরবাবু বললেন, তুমি তখন বললে ভগীরথ, কথাটা এই রকম—তখন আন্দোলন করাতে গিয়ে এটা বুঝেছি—কোন্ কোন্ হকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে তা তাকে বুঝাতে হবে। আইনটুকু বাংলায় লেখা, সেটা পড়ার মত লেখাপড়া শিখতে হবে। যাদের লড়াই তারাই লড়াইয়ের কারণ টারণ বুঝে নিক। নিজেরা লড়তে পারবে। খেতমজুরদের কথাই ধর না কেন—

আইনের পথে বিশ্বাস যেছ যদি, ভোটটা মানি নিছ না কেনে?

ভোট দিয়ে কিছু হবে বলে বিশ্বাস করি না ভগীরথ। ভোটে যে জিতুক, তোমাদের হক তো বুঝে নেবে?

হাঁ, তা বুঝছি।

আইন-টাইন জানার জন্যে পড়তে শিখুক না। পড়তে শিখলে পড়ায়

জিনিস আরো আছে।

তা তো জানি মশায়। পড়তে জানি নাই বলে তো মোথা মালিকের হাতে মরি, আদালত যেয়ে ভি মরি।

তবে আর কি। বুঝলে তো।

আমি শুধাই বাবাটোর কথা।

কি কথা?

খেতমজুর, বর্গাদার—হাঁ হক মিলে নাই বটে. তবে নামে চিনা যায় ই জন কারা। আর আইন ভি হচ্ছে। কিন্তুক মাশায় - ভাতুয়াটো, সেও তো আছে? ভাতুয়া করি রাখে যেমুন গোলাম করি রাখে। ভাতুয়ার দিন-রাত খরিদ করি লেয়। ভাতুয়াটোর কথা ভি স্বীকার যেছে না কেনে গোরমেন? আইন করি দিছে না একটো? নাই কেনে আইন?

কি বললে? আবার বল?

আইন র'লে ভি হক মিলে না। খেতমজুরের মিলে না। হাঁ সাচাই কথা, কিন্তুক আইন তো করছিল? বর্গাদার লয়ে তো আকাশ ফাটায়ে দিল, ভাতুয়া গুলান কি মানুষ লয়?

ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ তুমি ভগীরথ।

ভাতুয়া লিয়মটো কলঙ্ক। তা লয়ে তো তুমরা ভি লকসালী উঠাও নাই? ভাতুয়া যি. সি জনাও তো জমি খুয়ায়ে করজের দাদে ভাতুয়া বনে, লয়? জমিন-জীয়া মানুষ সি জনা। খেতমজুর যেমুন জমিন-জীয়া। তা ভাতুয়া লয়ে কেনে আগুন জ্বলে নাই? গোলাম করতেছে মানুষরে?

দাঁড়াও, দাঁড়াও ভগীরথ—

অধরবাবু উত্তেজনায় ঘুরতে শুরু করলেন ঘরে. কি যেন একটা, হঁ্যা, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। দাস প্রথা এটা, এখনো চলছে। পশ্চিমবঙ্গে চলছে, ঠিক বলেছ। দাঁড়াও আইন...দাসপ্রথা যদি হয়...ভগীরথ! আমি সদর থেকে জেনে আসব। আমার মনে হচ্ছে, অথচ মনে হচ্ছে না—জেলে বসে কথা কয়েছিল কে যেন...নিশ্চয়! কে হয় খেতমজুর, কে হয় ভাতুয়া—।

—আর ঋণমকুবী আইন ভি তো হচ্ছে! ঋণের লেগে মানুষটো গোলাম বনি যাবে? বাবা সাত বছর হতে ভাতুয়া। দুই কুড়ি পার করল সবে, চক্ষু যায় যায়. শালো নিজে দেখাবে নাই, আমি নিব সদরে হাসপাতালে সি ছুটি ভি দিবে নাই—আর কি হিসাব করি রাখছে, টাকা আর শুধে না। ই পিশাচ কালীবাবুরে পার্টি'র বাবুরা মদত দিল, পঞ্চায়েত উঠাল। সুদখিয়া

মহাজন মালিক ছাড়া সি সরকারের পঞ্চায়েত চলে নাই, ই সরকারের ভি চলে না, ইয়ার জমিতে বর্গাদার নাই, সবারে টুপি পরাল। ই ঘরে গোলাম পুষে বাহারে ফরন্ট মারায়।

দেখছি আমি, দেখছি।

তুমার কথা কে মানবে?

দেখছি। সদরে যেতে হবে।

আমারে লয়ে চল।

চল। পবনকে নিয়ে যাব।

কুথা?

কেন? হাসপাতালে?

কালীবাবু ছুটি দিবে নাই।

কালীর ঘাড় দেবে।

ভগীরথ এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অধরবাবুর ওপর ওর অপার বিশ্বাস। অধরবাবুর ঘুম চলে গেল কোথায়। ভগীরথ ওঁর বুকে ঘা মেরে চোখ খুলে দিয়েছে। ভাতুয়া! দাসপ্রথা! জমি খুইয়ে হোক বা ঋণের কারণে হোক, ভাতুয়া হয় মানুষ নিরুপায় হয়ে। দেশের মাটিতে দাসপ্রথা চলে যদি সে কথা সর্বহারার হকের জন্যে শপথবদ্ধ পার্টি জানবে না? তিনি জানবেন না?

জানবেন না কেন, জানতেন। কিন্তু এখন তিনি ভারতের মাটিতে জন্মাবার ভয়ংকরতা দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বিপ্লবী। তিনি জীবন দিতেই প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর কাছেও 'ভাতুয়া' এক স্বীকৃত, প্রচলিত প্রথা বলে এটি থাকা যে বর্বরতা, তা তিনিও ভাবেন নি। ভাতুয়া তো থাকেই, দেশে ঘরে কতই থাকে। ভগীরথ বুঝিয়ে দিল, ভাতুয়া থাকতে পারে আছে বলেই তাদের কথাও হিসাবে রাখো। খেতমজুররা ন্যূনতম মজুরি পেল কিনা শুধু তাই নিয়ে লড়াই কোর না। সরকার তো ভাতুয়া প্রথার কথা ভাববেই না। ভাতুয়ারা সংখ্যায় কতজন বা। জীবিকাভিত্তিক শ্রেণীতে ওরা তো সরকারী ভাষায় 'অসংগঠিত' অংশের লোক। লক্ষ লক্ষ বর্গাদার নয় যে একটা 'অপারেশন' চালিয়ে হইচই তোলা যাবে, ভোট কেনা যাবে। খেতমজুরও নয়। তাদের কথাও সরকার মাঝেমধ্যে ভাবে। ভয়, নইলে এবার নেতাদের চেষ্টায় নয়, নিজেদের তাগিদে ওরা ক্রমে নকসাল বনতে পারে। হকের জন্যে হেঁসো ধরলেই তো আজকাল সরকারী অভিধানে সে হয় 'নকসাল'।

নকসাল সংস্তার বেলা সব সরকার একই অভিধান অনুসরণ করে চলে। 'তিনিই ভারত তিনি ভারতমাতা'র প্রদর্শিত পথ এটি।

ভাতুয়া মানে দাস। ঋণের দায়ে বাঁধাপড়া দাস। 'গোলামটো'— ভগীরথ বলেছে।

৩

পবনকে আনতে কোন বেগ পেতে হয়নি অধরবাবুকে। কালীকৃষ্ণ বলেছিল বটে, কি হইছে উয়ার, যি সদরে যেয়ে চোখ দেখাবে? হাটে যায়, হাটে কত অষুদ বিচে. চক্ষে দিলে আরাম হয় না?

অধরবাবু বলেছিলেন, নিজেও ব্যবস্থা করবে না—অপরকেও করতে দেবে না? তোমার ঘরে তো চিরকাল গোলাম খাটছে তা চোখ দুটো গেলে কি তুমি দেবে? গরু-মোষটার ব্যামো হলেও তো বদ্যি ডাকো, একে একবার সদরে নিয়ে চোখ দেখানো উচিত ছিল না তোমার?

কৃষকসভার নিত্য আর সন্তোষ কি কাজে এসেছিল কালীকৃষ্ণের কাছে। তারাও বলল নিশ্চয় যাবে। অধরদা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, এর পরে আর কথা কি?

যাক না, যাক—কালীকৃষ্ণ অগত্যা বলেছিল।

সদর শহর জামু গ্রাম থেকে মাত্রই তিন ঘণ্টার পথ, এটুকু পথও পবনের আসা হয় না কখনো, শহর দেখে এমন উত্তেজিত হল ও যে চোখের কষ্টের কথাও ভুলে গেল যেন!

ভগীরথ বিব্রত হচ্ছিল, আবার মমতাও হচ্ছিল ওর।

উ দেখ ভগীরথ, হোথা কত বড় বাড়িটো। উঃ। দালান বটে, উঁচা কত? পাঁচিলটো?

অধরবাবু মুচকি হেসে বললেন, ওটা জেলখানা। ওখানেই ছিলাম কিছুদিন।

আঁ? জেলখানা? আর ই দালানটো?

ওটা সিনেমা।

—ই দেখ ভগীরথ, কত ফলের দোকান দিছে। বল্ দেখি ওগুলান্ কি? লাল কত?

—আপেল, বাবা।

হাঁ হাঁ, নামটো ভুলি যাই, বাবু আনে তো। পউষ মাসে এত ফলে ঘর ভরি দিবে। এ-ত!

ভগীরথের বুকের নিচে কোথায় ব্যাথা করছিল। ফলের দোকান দেখে বাবার হাসিভরা মুখটা দেখে বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল ব্যথায় ধুলোপড়া ঘেয়ো বিবর্ণ ফল। তা দেখেও বাবা খুশী কত। চোখ দুটি যেন ঘোলাটে। বাবার চেহারা দেখে মনে হয় কবেকার মানুষ যেন, কোথা থেকে এসেছে সদর শহরে। যেন সুদূর ও ধূসর অতীত থেকে উঠে এসেছে ও বিশ শতকের ধুলোটে ও অবহেলিত সদর শহর দেখে এমন অপরিচয়ের বিস্ময় ওর চোখে।

ঠিক এক কথাই মনে হয় অধরবাবুরও, অত্যন্ত অস্বস্তি হয় তাঁর। ফাটাচটা পা, চ্যাটালো আর ফাটা চটা হাতের থাবা, গলায় উড়নি, রুক্ষ চুল, পবনকে দেখে কেন মনে হচ্ছে ও অন্য শতকের মানুষ! দাস বলে? কোথা থেকে আসছে ও? বল্লালসেনী বাংলা থেকে? শশাঙ্কের বাংলা থেকে? যে সময়ে গঙ্গারিডই নাম ছিল, সে সময়ের গহ্বর থেকে? যখন দাসরা রচনা করত সভ্যতা? অতীতের বাংলার কিছুই অপরিবর্তিত টিঁকে নেই, আজকের পশ্চিমবঙ্গে। একা পবন কালজয় করে টিঁকে আছে যা ছিল নিষ্কর, তা টাকা হয়, জমিব্যবস্থার পরিভাষা পালটায়, রূপনারায়ণ স্রোতোপথ বদলায়, তাম্রলিপ্ত হয় তমলুক—কিন্তু হ্যাঁ পাবনটো পবন থাকি যায় তা দেখলে অধরবাবু, কালী গরাইটো কালী গরাই থাকি যায় তা দেখলে নাই? উ ভি আছে, আমু ভি আছি। উ নইলে আমু এলম কুথা হতে? ভাতটো, বুঝলে অধরবাবু, বড় দুঃখ দিতেছে ভাতটো শত-শত-হাজা-র বৎসর ধরি। বড় দুখ! এখুন চক্ষে সব ধুমা বন্ন দেখি। জানি আগুন লাগি জবলে কি বা, এ-ই ধুমা বাতাসে-এ-ই ধুমা আকাশে—ধুমাকার রুদ্দুর—যা দেখি সকল ধুমাবন্ন, আগুন তাতে লাচতেছে।

অধরবাবুর এক পুরনো ছাত্র এখানে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বেচে জীর্ণ ও গরিব দোকান। তার বাসায় উঠলেন ওঁরা। হোটেলে ভাত খেলেন। অধরবাবু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। চোখের ডাক্তারের কাছে পবনকে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার বাড়ীতে রোগী দেখে। ডাক্তারকে পবন এই কথাই বলল।

চক্ষে সব ধুমাবন্ন দেখি বাবু যেমন ধুমা উঠতেছে আগুন তাতে। স-ব ধুমাকার। আর এই লাচে, এই চমকায়। ধানটো, মাচানটো, ভগীরথের মুখটো যেন আগুন তাতে বাতাস জবলে, পিথিমি লাচতেছে।

চমকাতেছে।

ডাক্তার অধরবাবুকে বলল, মনে হচ্ছে গ্লুকোমার পরীক্ষা করতে হবে। সে তো সময় লাগবে।

তাই করুন।

অতক্ষণ বসবেন আপনি ?

না আমার কাজ আছে।

পবনকে রেখে অধরবাবু ও ভগীরথ বেরিয়ে এলেন, ভগীরথ বলল, চক্ষু সারবে ?

দেখা যাক।

অধরের মনে কালীকৃষ্ণের ওপর প্রজ্বলন্ত রাগ। চোখের এমন অবস্থা লোকটার তো একদিনে হয় নি। দিনে দিনে—"দিনে দিনে" শব্দ দুটি যেন এক সাবানের বিজ্ঞাপনকে মনে করিয়ে দেয়। দিনে দিনে, একটু একটু করে পবনের চোখের আলো ক্ষীণ হয়েছে। ভাতুয়া মহাজনের কাজ করতে করতে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভাতুয়ার চোখের চিকিৎসা করাবার জন্যে ভাতুয়াকে ছুটি না-দেবার অধিকার মহাজন রাখে। দাস। ক্রীতদাস।

অধর ভগীরথকে নিয়ে আদিবাসী-কল্যাণ আপিসে গেলেন। জেলাটিতে আদিবাসী অনেক। আর অধরবাবুরা সত্তরের দশক পড়তে আদিবাসীদের নিয়ে ধান খেতে নেমেছিলেন। আদিবাসীকল্যাণ দপ্তর এখানে আপিস রেখেছে। ভগীরথ বলল হেথা এলাম কেনে ?

জানলে এ জানবে।

পলুস মুর্মু শিক্ষিত, চটপটে যুবক। সে বলল, ভাতুয়া বলুন, মাহিন্দার বলুন, ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়। একটা লোকের সঙ্গে সময় সাপেক্ষে বাৎসরিক একটা টাকার কড়ারে, ভাত ও জলপান দেবার শর্তে চুক্তি করা হল। কার্যকালে সে মনিববাড়ির চব্বিশ ঘণ্টার গোলাম হল। ক্ষেত্রবিশেষ এই শ্রমিকের নিজস্ব কিছু জমি থাকতেও পারে। তা অবশ্য কম।

এখানে ঋণের ব্যাপার।

বুঝলাম। ঋণ নিল একজন। সে নিজে অথবা তার আপনজন কেউ ভাতুয়া হল। বছরে এত টাকা, দৈনিক ভাত ও জলপান।

ঋণমুক্তি তো হয় না।

হবে কি করে? ভাতুয়া বা মাহিন্দার হচ্ছে নিরন্ন ও নিরক্ষর লোক। সেই মুহূর্তে বাঁচার জন্যে সে নিজের দাসখতে টিপছাপ দিচ্ছে। আপনি

বুঝছেন না, কি হওয়া উচিত ছিল ?

আপনি বলুন।

পলুস মুর্মুর মুখে একটা হাসি লেগে থাকে। হাসিটি ধরে রেখেই সে বলল, ঋণগ্রহীতাকে জেনে নিতে হত সে কি ভাবে ছাড়ান পাবে। ধরুন পাঁচ বছরের জন্যে চুক্তি হল, ধার ছিল এক হাজার টাকা। পাঁচ বছর সে কি কাজ করবে এবং কি হারে তার দৈনিক বা মাসিক মজুরি ধরা হবে? যদি দিন দু টাকা মজুরি হয়, তাহলে মাসে ষাট টাকা কাটান যাচ্ছে। বছরে তিনশো ষাট টাকা। পাঁচ বছরে তো মালিক আঠারোশো টাকা তুলে নিল।

বুঝলাম।

না বোঝেন নি।—হাসি লেগে থাকল পলুস মুর্মুর মুখে, গলাটা ধারালো হল, বোঝা কি অতই সহজ? কাজটা যদি খেতমজুরী হয়, তাহলে একভাবে হিসেব করা চলে। খেতমজুরের একটা মজুরি রেট আছে বটে—পাক, বা না পাক। কিন্তু ক্ষেতমজুর তো খাটবে আট ঘণ্টা—ভাতুয়া চৌপর দিনের গোলাম। কাজ যদি হয় বাগান সাফ, কাঠ কাটা, গোয়ালের কাজ, তার মজুরি কি?

তাহলে ?

সে সব হিসেব এ লোকটির আছে ?

না বাবু। কুনু-অ হিসাব নাই।

হিসেব-টিসেব করলে মালিককেই টাকা ফেরত দিতে হবে হয়তো! আমি যা বুঝি বললাম। দেখুন, কি বোঝেন।

খেতমজুরদের তো তবু কোন রেট হয়েছে! আর কোন কোন জায়গায় তারা এখন তবু পাচ্ছে। পুরো না হোক, কাছাকাছি। অথচ খেতমজুররা—

শুনতে তো পাই, অনেক আন্দোলন হয়েছে তাতে এতটুকু পাচ্ছে। আপনিই ভাল জানবেন।

হ্যাঁ। আমরা আন্দোলন করেছিলাম।—অধরবাবু চোখ তুললেন। মনের নিচে জবাব পাচ্ছেন। ভাতুয়াদের জন্যও—অধরবাবু বললেন, কিন্তু এরা তো···

এরা শ্রমিক হিসেবে আমাদের ভাষায় 'অসংগঠিত অংশে' পড়ে, তাই তো? ক্ষেতমজুরও তাই। আন্‌অর্গানাইজড্ সেকটর।

খেতমজুরদের চেনা সোজা।

এদের চিনে বের করা কঠিন।

এদের কোন আইনের আওতায় ফেলা চলে না !

চলে বই কি।

চলে ?

পলুস মুর্মুর হাসিতে শাণ পড়ছে, ফুলকি উড়ছে সে বলল, এরা বনডেড লেবার। বাঁধা শ্রমিক। দাস।

বনডেড লেবার ! পশ্চিমবঙ্গে ?

নয় কেন ? দেখুন না, এখানে পরিষ্কার লেখা আছে, 'পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত চেহারার দাসত্ব অনুপস্থিত। বাৎসরিক চুক্তি-মাফিক শ্রমিক নিয়োগ এই নামের ছদ্মবেশে বনডেড লেবার প্রথা চলে।' নয় কেন অধরবাবু ? বনডেড লেবার অ্যাক্ট পড়ে দেখুন—যে যে কারণে বনডেড লেবার হয় মানুষ, সেই কারণে মানুষ হয় ভাতুয়া।

আইন আছে, আছে বাবু ? ভগীরথ বলে।

আছেও বটে, নেইও বটে। পশ্চিমবঙ্গে বনডেড লেবার প্রথা আছে বলে তো সরকার বলছে না। কিন্তু ভাতুয়া প্রথাই হল গে সেই প্রথা !

তাহলে ?

আমি জানি না ভাই। তুমি ও'র কাছে জেনে নিও। ভাতুয়া আর বনডেড লেবার এক, তা প্রমাণ করবে কে ? প্রমাণ করে প্রথা উচ্ছেদ করবে কারা ? বিহারে এমন হামেশা ঘটছে, বনডেড লেবারকে মুক্ত করা হল রামের খপ্পর থেকে। অভাব, জমিহীনতার কারণে, সামাজিক প্রয়োজনে সে ঋণ নিল শ্যামের কাছ থেকে এবং তার বনডেড লেবার হয়ে গেল। ঠেকাবে কি করে ? ভাতুয়ারাই হয়তো মারতে উঠবে আপত্তি জানাবে।

বনডেড লেবার অ্যাক্টটা পাই কি করে ?

আপনি মশাই মার্কামারা হয়ে গেছেন। সাহায্য করাও মুশকিল।

মানতে পারলাম না।

শুনুন জিগ্যেস করলে অস্বীকার করব 'দিয়েছি'' বলে—কিন্তু ছোট অ্যাক্ট, একটা কপি আপনাকে দিয়ে দেব কোন সময়ে। নিয়ে করবেন কি ? সাজিয়ে রাখবেন ?

বলুন, বলুন। ভগীরথ বলছে, আপনি বলুন, শুনতেই হবে। আর যাকে নিয়ে প্রশ্ন তিনি চোখ দুটি প্রায় খুইয়ে বসে আছেন। তোমাকেও বলি ভগীরথ, আগে তো দেখবে ?

পলুস মুর্মুর হাসিতে যেন জ্বলন্ত রোদে ইস্পাতের ছুরি ঝলকে উঠল,

সে কি? আপনার চেনাজানার মধ্যে একজনই ভাতুয়া' না কি? 'যাকে নিয়ে প্রশ্ন' বলছেন? আচ্ছা, আরেকজন প্রাক্তন ভাতুয়ার খোঁজ দিচ্ছি! শিবচাঁদ মুর্মু, গ্রাম সলপাড়া, তারও চোখ অন্ধ। আমার কাকা। নিন, চা খান, চা এসে গেছে।

ভগীরথ অভিভূত হয়ে তাকাল। পলুস মুর্মু বলল, হ্যাঁ হে। ভাতুয়ারা বসন্তরোগে, গ্লুকোমায়, এতে-তাতে অন্ধ হয়। অন্ধ হয়ে তবে কাকা খালাস পেয়েছিল।

অধরবাবু বললেন, যুগলের বাবা।

হ্যাঁ। জানেন দেখছি।

চা খেয়ে ওঁরা উঠে পড়লেন। অধরবাবুর মাথায় নানা প্রশ্ন, যুগলের স্ত্রী?

গ্রামেই আছে।

যুগলটা!

ভগীরথ বলস, মারি দিছিল তারে, লয়? হাঁ, আমি জানি, আমি শুনছি।

পলুস মুর্মু সে কথার জবাব দিল না। অধরবাবুকে বলল, বয়স্কদের লিখতে-পড়তে শেখাচ্ছেন—এই বইগুলো একজন দিয়েছিল পাঠিয়ে, নিয়ে যাবেন।

ঘাড় হেলিয়ে অধরবাবু বেরিয়ে এলেন। এখন বিকেল হয়-হয়। সব ধুলোটে বিবর্ণ। ভগীরথ বলল, এখুন ইরা খুব সিধাসাফা বাত করে।

তা বরে।—সদুঃখে হাসলেন অধরবাবু। ক্ষমতা এদের বড় কম, বড় কম।

দপ্তরটো রাখি দিছে কেনে?

রাখতে হয়। এ সরকার এ জেলায় চেষ্টা করছে, কিন্তু ক্ষমতা বড় কম এদের।

কি বুঝলে বাবু?

পরে ভগীরথ, পরে।

ডাক্তার বলল, কাল আবার আসুক। পবন, তুমি বারান্দায় যেয়ে বোস। আমি এঁর সঙ্গে কথা বলি।

পবন বলল, অধরবাবু! মোরে চশমা দিবে মশায় হাঁ। চশমা লিলে স—ব সপষ্ট দেখব যেমুন। উঃ। জল খাওয়াছে আর চক্ষু দেখছে সি কত

রকমে।

ভগীরথ বাবাকে নিয়ে বাইরে এসে বসল। বারান্দাটি উঁচু। পবন বলল, ফিরব কখন, আঁ ভগীরথ? নাড়া কুচাতে আছে, ঘাঁসর মাচাংটো বাঁধতে বলছিল—

এখানে বস। নাও, বিড়ি খাবে?

পবন সলজ্জ হেসে বলল, একটো ছিগারেট আন্ কেনে, উ দোকানে যা? কখনো খেয়ে দেখলম না—·

দেয়ালে পিঠ রাখি বস কেনে, আমি লয়ে আসি। বিস্কুট খাবে? বিস্কুট?

ডাক্তার অধরবাবুকে বলল, অনেক কথা বলে লাভ নেই মশাই। কে হয় আপনার? গাঁয়ের লোক?

হ্যাঁ। বলুন না।

গ্লুকোমা ভয়ানক এগিয়ে গেছে। নার্ভগুলো···ডাক্তার সংক্ষেপে বোঝাতে থাকল। মনে হয় প্রাইমারি টাইপের গ্লুকোমা, আর প্রাইমারি টাইপের গ্লুকোমা হবার কোন জানিত কারণ নেই। চোখের স্নায়ুমণ্ডলী-ক্ষয়িষ্ণু পবনের। পবনের কি বহুমূত্র আছে? অধরবাবু জানেন না। অ্যাট্রোফি বা ক্ষয়িষ্ণুতার এই কারণ দীর্ঘদিনের পুষ্টিহীনতা। পবন রোজ কি খায়? অধরবাবু জানেন না, আন্দাজ করতে পারেন। নন্কো-অপারেটিভ টাইপ। চিকিৎসার কাজ হওয়া দুষ্কর।

অপারেশন তো হয় গ্লুকোমায়?

সে কথা ভেবে দেখুন।

তাতে বিপদ আছে? মানে···

দেখুন, বছর পাঁচেকের পুরনো ব্যাপার। প্রথম দিকে যদি আসত···

কি করবেন?

কলকাতায় নিয়ে দেখাতে পারেন।

লাভ হবে?

মনে হয় না।

তাহলে?

আপাতত চশমা দিয়ে দিই।

অন্ধত্ব আটকানো যাবে না?

পাঁচ বছর আগে হলে অপারেশন চলত।

আজ থাকতে বললেন ?

আজ তো হবে না। কাল সকালে ব্লাডসুগারটা খালি পেটে, খাবার পর, দুবার করান। পেচ্ছাপটাও দেখিয়ে নিন। বহুমূত্র থাকলে তার চিকিৎসা চালান। ওষুধ খাক। তাতে চোখটা আর ক দিন থাকবে।

আপনার টাকাটা ?

অধর বাবুর দিকে তাকান ডাক্তার। অধর মাইতিদের জন্যে একসময় না কি ডাক্তাররা দক্ষিণা কমাতে বাধ্য হয়েছিল। শোনা কথা। এখন লোকটি ভেঙে পড়েছে। খাকি, গলা ছেঁড়া সোয়েটার, ধুতটা আধময়লা, মোটা চটি —গ্রামের লোকদের দেখে অবশ্য টাকা আছে কি নেই, বোঝা যায় না। তবু, এ তো গরিব—সবাই বলে। গরিব হও যদি, ডাক্তারকে রুগী এনে দেখাও কেন ? হাসপাতালে যাও না কেন ?

তিরিশ টাকা দিন।

টাকা দিল অধরবাবু। জীর্ণ ব্যাগটি চিমসে হয়ে গেল তিনটে নোট বেরোতে।

চশমা করতে কত লাগবে ?

পঞ্চাশ বেকসুর।

আচ্ছা।

অধর বাবু মনে মনে আশ্বস্ত হন। হাত ঘড়িটা এখনো আছে। ভগীরথই তখন সামলে রেখেছিল। অধর বাবুরবাবার হাত ঘড়ি। ওষুধ-বেচা ছাত্রটি নিশ্চয় ব্যবস্থা করে দেবে।

ছাত্রটি বলল, রক্ত আর পেচ্ছাপ হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়ে দিই। খররচ কম লাগবে।

তাই কর।

দুদিন থাকতে হল আরো। বহুমূত্র নেই পবনের। চশমা তৈরির অর্ডার দিয়ে ওরা বাসে চাপলেন। অধরবাবু বললেন, আবার নিয়ে আসব ক দিন বাদে।

কেনে, বাবু ?

চশমা পরে দেখে নিতে হয়।

চশমাতে বিস্তর টাকা লাগবে, লয় ?

সে হয়ে যাবে।

ঘড়িটো তুমার—

হয়ে যাবে।

কে শুধবে বাবু এত টাকা? কত খরচ করলা?

ভগীরথ বলল, আমি। ইবার প যাবে?

হাঁ। চুপ গেলম।

আর, আর তুমি গরাই বাড়ি যাবে না।

যাব নাই।

না।

কি বুঝল পবন, কে জানে। ভগীরথের কন্ঠের ক্ষোভে ও রাগে কি ছিল? ও একবার ছেলের দিকে চাইল। একবার অধরবাবুর দিকে তারপর ওব বুক ঠেলে বান্না উঠে এল।

বলল, ই কথা আজ তুই বলিস কেনে?

বললাম।

কেনে?

না। গরাই বাবু তুমারে বেআইনে খাটাছে, মজুরি ভি হিসাবে কাটে নাই, উর করজ দশ দফা শুধে গিছে, বুঝলা? দশবার শুধছ তুমি?

বাবু! অধরবাবু! ভগীরথ কি বলে?

ঠিক বলে পবন হাঁ, ঠিক বলে।

শুধে গিছে?

সমগ্র পরিস্থিতির নির্মমতায় ভগীরথ এখন নিষ্ঠুর, ক্রুদ্ধ। আইনের কথা যা বুঝেছে, তাতে ওর বুকে এখন রক্তের জোয়ার। ভগীরথ বলল, আর কখনো যাবে না, কুনো দিন নয়।

বাবু পচাহেতী, হাতে অনেক ছেলা। মারে যদি? কতদিন তো মারছে।

অধরবাবু বললেন, কেউ কিছু বলবে না।

কেনে? কেনে আমার হয়ে বলবে? কেনে বাবুর সাথ বিবাদ উঠাবে? বল? বলবা না? বুঝি পারছি আমি অধরবাবু। বুঝি পারছি আমি ভগীরথ? আমার চক্ষু আর ভাল হবে না—সি কথাই বলবি তুরা। বলবি তুমার কাজে পবনটো কানা হই গেল, আর সি তুমার হয়ে খাটবে না। বুঝি গিছি আমি বাবু গো! আমার আর বুঝতে বাকি নাই!

পবন হো হো করে কাঁদে ও ভগীরথ তার মাথা সাপটে কাঁধে টেনে নেয়। ভগীরথও নীরবে কাঁদে ও জাপটে ধরেরাখে বাপকে। অধর

বাবুর মনে চেনা পৃথিবী ভেঙে যেতে থাকে। প্রজ্বলন্ত ক্রোধ। ভাতুয়া কতজন? কি হিসেবে কাজ করে? ভাতুয়াই বনডেড লেবার এবং তাঁর পকেটের বাদামী কাগজটি বলে দিচ্ছে, ১৯৭৬ সালের দি বনডেড লেবার সিসটেম অ্যাবোলিশন) অ্যাকুট-এর আওতায় ভাতুয়াকেও ফেলা যায় এক বিশেষ উপধারা প্রয়োগে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বনডেড লেবার প্রথা নেই, আছে কনট্রাক্ট লেবার। সামনে অনেক কাজ। সংগ্রাম ফুরায় না।

পবন চোখ মুছল, মাথা তুলল। নাক ঝেড়ে, জামায় মুছে বাইরের দিকে তাকাল। সব ধোঁয়া ধোঁয়া। যেন আগুন জ্বলছে কোথায়, ধোঁয়ায় ধূমল বাতাস। সব দেখাচ্ছে ধোঁয়াবর্ণ, সব যেন চমকাচ্ছে, দুলছে, আগুন তাতে বাতাস কাঁপে যেমন। এত আগুন লেগে গেছে, কই পবন তো বোঝেনি আগে?

৪

আর গেল না পবন গরাইবাড়ি, একবারের জন্যেও নয়। অধরবাবু কি বললেন কৃষকসভায় নিতাই আর সন্তোষকে, কার সঙ্গে কি কথা হল তা পবন জানল না। তবে ওর বউয়ের মুখে সব কথাই শুনল। অধরবাবু নাকি নিতাদের ডেকে রীতিমত আলোচনা করেছে। সরকারী কাগজ পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। গ্রামের ছেলে তোমরা, পার্টির ছেলেও বটে। মানুষকে দাস বানিয়ে ব্যবহার চলছে, তা তোমরা দেখবে না? কেমন লোককে রেখেছ পঞ্চায়েতে? পবনের চোখ দুটো যে চলে যাচ্ছে, মালিক কোনদিন পবনকে চিকিৎসা করিয়েছে? তোমাদের চেনাজানা চিরকালের মানুষ না পবন?

ছেলেরা গ্রামেরই ছেলে। তারাও আলোচনা করে থাকবে। তারা টাকা এনে দিয়েছে অধরবাবুকে। বলেছে, গরাইয়ের ঘাড় ভেঙে আমরা পরে তুলে নেব।

সব শুনেও পবন চঞ্চল হয় নি। শহর থেকে ঘুরে এসে ও সেই যে ঘরে বসেছে, বসেই আছে। এত কথা, এমন কাণ্ড, তাতেও ও এতটুকু বিচলিত হয়নি। বলেছে, উয়ারা টাকা দিল? ভাল।

হা তুমার চেত-ভেত নাই? যা বলি সব শুনি বসি থাক?

কি করব? লাচব?

হা, কিছু তো করবে?

ভাবি বউ! কত খাটলম, বর্ষায় আল ভাঙলে বানতাম, তাতের কালে

গরাইবাবুর মাথে ছাতা ধরে দৌড়াতাম। পায়ে ঘা হই গিছে ইটা-পাথর বেজে।

লাও, খ্যাড়ের দড়িটো পাকাও বসি।

পারি না বউ।

অত ভাব কেনে? একটো বকনা নিব পালনি। সি হতে দেখবে সংসার হবে।

নিবি? নিস। বকনা ভি মাঙছিলাম একটো, দেয় নাই। বর্ষায় মাথাল দিল, বলে, লিখে রাখলাম। ইয়ার দাম দু টাকা। কিছু দিল না কখনো। খালি গতরটো মাটি করি দিল, চখ দুটা—

বউ ভগীরথকে বলল, ই কেমন হয়ে যেছেরে ভগীরথ? আমি তো ভাল বুঝি না। এত কাজের মানুষ, এমন কালিমাড়া মুখে কি ভাবে? আঁ?

ভগীরথ বলল, কি ভাব বাবা?

হিসাব ভাবি।

কিসের?

দেনাটো শুধল করে, আমি বা কত পাব। অনেক কথা মনে উঠে ভগীরথ রে! মনিব ভি বলছে তু বিনা কাম হবার লয়, আমি ভি জানান দিয়া কাম উঠাছি। এখন দেখ্, সি ধান ভি কাটা হবে, সকল কাম হবে, তা আমার চখ দুটা নিল কেনে?

ভগীরথ বলল, তালপাতা ডেগো লয়ে পাখা বান্ধা শিখবে? আমি ভি করি, তুমি ভি কর, চালান দিবে গোকুল দলুই, কিনে লিবে নগদে?

না রে! সি কামটা দেখ্, কানাতেও করে। এখনো চক্ষু আছে, টুনি দেখে লই?

'কানা-কানা' বল কেনে? কলকাতা লয়ে তোমার চক্ষু দেখাবে অধরবাবু।

পবন মাথা নাড়ল। বলল, কুথা হতে? কি করে? না ভগীরথ, সি জনা অনেক করছে। আর ঋণ বাড়াস না। চক্ষে কিছু হবার লয় রে, সকল ধুমবন্ন দেখি। যেমন ধুমা উঠতেছে বাতাসে।

সদরে চশমাটো পরি দে রে, চক্ষে ভাল দেখ। শুন বাবা, ভাল দেখবে।

না তোরে দেখছি কুনোদিন, না তোর মা-রে। বিহান কাড়তে ছুটি চলি গিছি, আর অসাগর কাম! কেনে বা লয়ে যাই নাই তোরে, তু গাঁদাটো হলি, মেলায় যাবি বলে কানছিলি কত! হা!

বাবা! চেটাই বুন, পাখা বাঁধ, ঘরে বসে বা রবে বেনে? কামে র'লে ভাল রবে মন।

ধুর! কানা হই করব।

অধরবাবুর কাছে গেল ভগীরথ। অধরবাবু সব শুনে বললেন, প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে। চোখে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। চশমাটা নিয়ে আসি ওকে নিয়ে।

চশমা পরে পবন বলল, হাঁ ধুমা-ধুমা বটে। নাচতেছে, ললকাতেছে, কিন্তুক, সাপাট দেখি।

চশমা পরে পবন বড়াম মায়ের থানে ঘুরে এল। অধরবাবুকে বলল, ভগীরথটো সাচাই বলছিল গ। মায়ের থানে লাল চুটির বাসা। তাতেই মায়ের রঙ্গে লাল চুটি বায়। গরাই বলছল মায়ের দেহ ফাটি চুটি বাইতেছে গ।

এই তো সব ঠিক-ঠিক দেখছ।

সি কথাটোর কি হল বাবু?

কি কথাটার পবন?

আমার বেআইনী খাটাছে উ?

সে কথাও হবে, জবাব দিতে হবে ওকে। আমি হিসেবটা করে নিই?

হিসেব করতে করতে দিন গেল অনেক। বহু বছরের হিসেব। এর মধ্যে পাশের গ্রামে ধানকাটা মজুরি নিয়ে হাংগামা বাধল। মজুররা খেত-মজুরি নেবে, জমিমালিক দেবে না। চেনা হাংগামা। মালিক বাইরের মজুর আনবে। চেনা নিয়ম। যারা মজুরি চাইছে তাদের ক জনাকে ধরবে? চেনা পদ্ধতি।

অধরবাবু সেখানে গেলেন। এক সময়ে মহল্লাটিতে ধানের নাম রক্তে লেখা হয়েছিল, বারবার। এখন নির্বাচনের আগে ধানকাটা নিয়ে হাংগামা বাঁধলেই আবার পুলিশ ঢুকবে গ্রামজীবনে। পঞ্চায়েতকর্মী ছেলেরা সঙ্গে গেল।

পবন বলল, ভগীরথ? তু যাস না বেনে? অধরবাবু একা, লয়?

ভগীরথ গেল।

আর পবন গেল গরাইবাবুর স্বর্ণশালী ধানের খেতে। ওই তো তার হাতে বাঁধা মাচা। ওই টঙে বসে ও খেত পাহারা দিত। ধান কাটছে, পালা দিচ্ছে পতিত, সাগর, নিবারণরা। খেতমজুর সব। আঃ! অসাগর ধান

গো, অসাগর ধান। এই সব কাজ তো সেও করেছে এক সময়ে। এখন চশমা পরে সব দেখতে পাচ্ছে পবন সর্দার।

তুই হেথা কেনে, পবন ? —গরাইবাবু ধানকাটার কালে দেখতে অসে, পবনের খেয়াল ছিল না।

দেখতেছি বাবু। —ভয় করছে গো, ভয় করছে। এতদিনের অভ্যাস কি যায় ? গরাইবাবুকে ভয় করা পবনের অভ্যাস। ভয় করছে।

এঃ ! অধর মাইতি চশমা করি দিছে, তা পরি দেখতেছ শালো ! দেখতেছ না চুরাবার তালে আছ, বুঝি নাই ? বোকাটো ভাবিস, আঁ ?

চুরি ? আমি ?

লয় তো কে ? শালো মুরুব্বি হল উ অধর মাইতি, সি মোরে আইন দেখায়, হিসাব দেখায়। কি করবে সি ? ধানটো ভানায়ে লই, তা বাদে যেয়ে তুমার নাম আমি থানায় দিব।

কেনে ?

চুরির লালিশ দিব শালো। তুমি মোর মুখ হাসাছ, তুমারে আমি ছাড়ব ?

কি চুরি করাছি আমি বাবু ?

থানায় বলবে।

আমি তুমার মুখটো হাসা করাছি ?

হাঁ।

আজ দেড় কুড়ি বছর খাটি, তুমার সি আটসৎ টাকা উঠল নাই, আমার কড়ারের টাকা ভি দিলানা কুনো দিন—তুমি, তুমি এখন আমারে টাকা দিবে তা জান ?

কে বলছে ? অধর মাইতি ?

দিবে। বেআইনে খাটায়ে নিছ বাবু। চক্ষু চলি যায়, কুনো বেবস্তা কর নাই।

চক্ষু যায় নাই, জেহেলে বসি কাঁদি কাঁদি ইবার যাবে। তুমার গরম বড় বাড়ছে পবন !

চোর ! চোর যদি হতে পারতাম বাবু। মনিব্যানের হারটো কে খুঁজি দেয় ? একটো টাকা দিছিলা তারপর ? তুমার টাকার ব্যাগ আমি নাই কুড়ায়ে ? হাটে যখন হারায়ে যায় ? চোর যদি পবন হবে বাবু, তবে তার উপর ঘর ছাড়ি পালায়েছিলে লকসালী কালে কেমন করি। চোর আমি ?

চোর ?

হেই, হেই পবন, ইকি ?

চোর আমি ?

মারা করবি ?

গরাই পেছন ফেরে ও আধা দৌড়ে চলে যায়। পবন রাগে রুদ্ধ ক্ষোভে কাঁপে। কাটা ধানের পাঁজা এখন চমকায়, ঝিলিক মারে।

ধান কাটা হতে না হতে আকাশ মেঘ জমেছিল। ধান এবার সবার খেতে হয় নি, বড় খরা গিয়েছে। যে ধান উঠেছে তাও বুঝি জলে নষ্ট হয়। কাটা চলছিল, ঘরে তোলা হচ্ছিল ধান।

পবন আকাশ দেখছিল। তার হাতের মেরামত করা টালে গরাই বাবুর ধান সুরক্ষিত থাকবে। এক ফোঁটা জল লাগছে না, তা পবন জানত। এও জানত, গরাই বাবুর জান ওই ধান। আকাল আসছে। ধান কর্জ দেবে গরাই বাবু, বহু জনকে বাঁধবে ঋণের দায়ে। ধানের বলে ওর বল।

রাতে দুর্যোগ নেমেছিল।

আকাশে বিদ্যুৎ, প্রবল বৃষ্টি, দুরন্ত হাওয়া। পবন ওর দা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। চেনা, সব ওর রক্তে রক্তে চেনা। এমন দুর্যোগে কেউ বেরোবে না। গরাই বাবুরা সবাই লেপের ওমে ঘুমোবে। ওরা ভাত খায়। তপ্ত ভাতের ভারে ঘুম নেমে আসে চোখে।

পবন কোন বোকামি করে নি। খুব সুকৌশলে ও টালের চাল বেয়ে উঠেছিল। তারপর ধারালো দায়ের কোপে ও টালের বেড়ার ঝাঁপের ঘন আঁটসাঁট চালা কেটে ফেলে দেয়। দুটি টালেরই। ধান ভিজতে থাকে। তখন ও টালের ঘের কাটতে থাকে ও হিঁচড়ে নামাতে থাকে। তাতেও হয়তো কারো কানে যেত না। টিনের ঘর গরাই বাবুর। ঝমঝম করে জলের শব্দ হচ্ছিল।

কিন্তু এখন পবন চেঁচাতে থাকে।

– হেই গেল তুমার ধান !

—ইবার কি করজ দিবে ?

—কুন বাঁধনে বাঁধবে গ ?

হড়হড়িয়ে ধান পড়ছিল। পবন লাথি মেরে ধান ফেলছিল।

তখন গরাই বাবুদের ঘুম ভাঙে।

পবনকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। পবনের গায়ে কেউ হাত দেয় নি। হাতে

দা ছিল ওর। চোখ ছিল লাল। অসীম, অপার ক্ষমতায় দুটি টালের বহু যান নষ্ট করে পবন যখন অবসন্ন হয়, তখনি ওকে ধরা গেল। তার আগে নয়।

আশ্চর্য, পবন কোন বাধা দিল না। ওকে ধরতে দিল। সবাই নীরবে সভয়ে দেখছিল পবন একা কি করে এত বড় সর্বনাশ করেছে।

ধানের ছড়াছড়ি মাটিতে। বৃষ্টিতে ভিজে গোবর। গরাইবাবু মাথায় হাত রেখে কাঁদছিল।

বর্ণশালী ধান মাড়িয়ে যেতে যেতে পবন চো. তুলে ভগীরথকে দেখল। পবনের চোখ ঘোলাটে, তবুও বুঝল, ভগীরথের চোখে আজ পিতার বিপন্ন অসহায়তার কারণে দুঃখ নেই। অন্য কিছু বলছে ভগীরথের চোখ। অন্য কোন জরুরী খবর জানাচ্ছে। ভগীরথ মাথা নেড়ে "হ্যাঁ" জানাল। বাবার আচরণে ওর সম্মতি।

পবন বলল, লইলে গ্রামটো ধান বাড়ি দিয়া বাঁধি ফেলি দিত ভগীরথ।

হ্যাঁ বাবা।

উর জাহান উ করজ দিয়া কামে। বাস্, কোনব ভাণ্ড দিছি।

জানি বাবা।

ইয়াদের বুঝাস।

পবন আর একবারও পেছনে না চেয়ে মাথা উঁচু করে হেঁটে চলে গেল জামু গ্রাম থেকে।

উদ্বাস্তু

অমিয়ভূষণ মজুমদার

রামচন্দ্রের দলটা কোলকাতার কাছে এই শহরের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সব যাত্রীদলের যা হয়েছে—শেষের পোয়া পথ টুকুতে তেমনি এদেরও অনেকে ভেঙে পড়েছে, অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে চলেছে ক্ষতদীর্ণ পা নিয়ে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে রামচন্দ্রের ছোট দলটিকে একা চলতে হয়নি, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব থেকে আগত ধূলিমলিন পূতিগন্ধি কালো কালো মানুষের ছোট ছোট দল একত্রিত হয়েছে, দ্বিধা ভঙ্গ হয়েছে, সবাই এগিয়ে এসেছে দক্ষিণে।

সহরের প্রান্ত থেকে এ বাড়িটার কাছাকাছি এসে পৌঁছুতে তাদের একদিন লেগেছিল, সকাল থেকে রাত দশটা প্রায়। বাড়ির সামনে কারা একটা কুপি জেবলে রেখেছিল। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখল তাদের মতোই, শুধু যেন একটু কম পরিশ্রান্ত, একদল সর্বহারা ঘর বারান্দা আঁকড়ে ধ'রে দম নিচ্ছে। কিছুক্ষণ তারা দাঁড়াল, তারপর তারা বসে পড়ল ফুটপাতের উপরে, তারায় ভরা আকাশের নীচে গোল হ'য়ে আর একটি রাত্রি যাপনের জন্য।

তারপরে নিদ্রা এল। ফুটপাতের এক প্রান্তে শুয়ে পড়বার আগে রামচন্দ্র বললো, 'হে ভাগ্যবান, তুমি আমাকে বাঁচালে, কোনো গুণই নাই আমার, তবু বাঁচালে।'

রামচন্দ্র যা কথায় প্রকাশ করতে পারল না শিক্ষিত লোকের মুখে সে মনোভাবটি হয়তো ঋকের মতে অপৌরুষেয় হয়ে উঠত।

এখন হয়েছে কি, বাংলা দেশে চিকিন্দি নামে যে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামে এই মানুষগুলির এর আগে খানকটা ক'রে জমি একটা ক'রে বাড়ি ছিল। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পিঠের ছোট পুঁটিলিতে যথাসর্বস্ব, চোখের কোলে কালি ও জল নিয়ে এরা গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়েছিল। ধুলোর ঝড়ের মুখে প'ড়ে ঘর ফিরতি ভেড়া গুলির শুধুমাত্র থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে যেমন নির্বাক

আর্তটা প্রকাশ পায়, সম্মুখের অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ ও পিছনের ভয়ের মাঝখানে দাঁড়ানোর মধ্যেও তেমন কিছু ছিল। সম্মুখে, বরং একটু বাঁয়ে, দাম্ভিক রামচন্দ্রের বাড়ী। গত রাত্রির এক পশলা বৃষ্টিতে উপরের মসৃণ গোবর মাটির প্রলেপ ধুয়ে গিয়ে নীচের কাদা মাটির প্রলেপ বেরিয়ে পড়েছে ; হঠাৎ কি করে মৃত মুখের কথা মনে পড়ে যায়।

সেখানে দাঁড়িয়ে তারা দেখছিল, জেলেদের চর প'ড়ে আছে। জেলেদের আশ্রয় ব'লেই পদ্মার এই চরটির এই নাম। নৌকা নেই, জনপ্রাণী নেই, সূর্য এই মাত্র ডুবে গেছে ; বিষন্ন একটা কপিশ কালোয় লেপে যাচ্ছে, খুব মনোযোগ করলে হয়তো বা একটানা একটা জলের শব্দ কানে আসে। জেলেরা এর আগেও এসেছে, চলেও গেছে। মাছের স্রোতের উপরে তাদের আসা যাওয়া নির্ভর করে, কিন্তু এমন নিঃশব্দ ক'রে, এমন কলিজা গুঁড়িয়ে তারা যায় না কখনও। আর কলিজা এদের গুঁড়িয়ে গেছে এক আঘাতে নয়, বার বার একটির পর একটি আঘাত এসে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এরা কেঁদেছিল হাহাকার ক'রে, বুক চাপড়ে। মাটিতে মাথা কুটে কুটে গ্রামের কয়েকটা পাড়া জনশূন্য হ'য়ে গিয়েছিল ; সেগুলি আর ভ'রে ওঠেনি। রামচন্দ্রের বাড়ীতে একটা বড় রকমের অঘটন ঘটেছিল। তার মেয়েটা বোধহয় তার মত শক্তজাতের ছিল না, শুকিয়ে শুকিয়ে সে একদিন ঝ'রে গিয়েছিল। সংখ্যায় তারা অনেক ক'মে ছিল বটে, তার একটা পুরুষ ধ'রে যেন বয়েসের একটা পর্যায় ডিঙিয়ে বৃদ্ধ হ'য়েও পড়েছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে কৃষকেরা তাদের বাপ-ঠাকুরদাদের মতোই দুর্ভিক্ষের চোটটা সামলে নিয়েছিল।

কৃষকেরা জানতে পারে নি এবারকার দুর্ভিক্ষটা অন্য অন্যবারের মতো নয়। রামচন্দ্রের মতো চাষীরা যখন মোঙলার মতো জামাইকে বুকে চেপে ধরে কন্যার শোকটাও ভুলতে যাচ্ছে তখন এলো দাঙ্গা। খবর এল নদীর ওপার পর্যন্ত এসেছে ; শিশুদের বল্লমের ফলায় বিঁধে মারছে, মায়েদের বুক কেটে নিচ্ছে শিশুদের মুখ থেকে ছাড়িয়ে, লোহার খিল হাতুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে অল্পবয়সী মেয়েদের উরুতে।

ফুটপাতের শয্যায় একটা অব্যক্ত কান্না নিয়ে উঠে বসলো রামচন্দ্র। কিন্তু চারিদিকে অস্পষ্ট আলো, শূন্যপথ আর ফুটপাত। ভয়ে যেন গা ছম্ ছম্ ক'রে উঠলো তার। আহা, আহা ! কিন্তু এ কোথায় সে ? তারপর তার আবার সব মনে পড়লো।

দেখতে দেখতে গ্রামের চেহারা বদলে গিয়েছিল ; ক্ষেতগুলি ন্যাড়া

ন্যাড়া, গত ফসলের গোড়াগুলি পৃথিবীর সব রস যেন শুষে নিচ্ছে। কলা-পাতাগুলির উপরে ধুলোমাটির প্রলেপ জমে গেছে। এমনটা শুধু বৃষ্টির অভাবে হয় না। মড়কটদের আগে যেমন হয় তেমন যেন একটা অন্ধ বুড়ো শকুন বসবার জায়গা হদিস করতে না পেরে পাক্সাট মেরে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে গ্রামের উপর দিয়ে। তার পাখার ছায়া পড়ছে, অন্ধকার হ'য়ে উঠছে কৃষকের মুখ। এরপর থেকে দুঃখের স্রোতটা অপ্রতিহত হ'লে ততটা কষ্টের বোধহয় হতো না; কিন্তু ঢল নামলো, কৃষকদের শুকনো প্রাণ ব'য়ে, কলা-পাতাগুলির গায়ের মাটির প্রলেপ, দাগ-দাগালি ধুয়ে নামলো; ভাদ্রের শুকনা দিনগুলির পর, আশ্বিনের গোড়া থেকে ঢল মারতে মারতে হলুদ হলুদ জমি সাদা হয়ে গেল বিঘৎ পরিমাণ জল দাঁড়িয়ে। তারপর যে দিন জল ধ'রে গেল আকাশ ঝিকিয়ে উঠল, দেখা গেল ছেলে বুড়ো, হিন্দু-মুসলমান নুয়ে নুয়ে ভূমিকা সাধছে।

মাঝখানে রামচন্দ্রের ক্ষেত, তার একদিকে হাজীর বেটা ছমির মুনসীর ক্ষেত, ওদিকে কেষ্টদাস বৈরাগীর এক ফালি ভুঁইটুকু।

কতকগুলি কালো কালো মানুষ নীচু হয়ে বাঁহাতে ধরা রোয়া ধানের চারাগুলো বিঘৎ পরিমাণ জলের নীচে বুনে বুনে দিচ্ছে।

রামচন্দ্রের চওড়া পিঠের পাশ দিয়ে মোঙলার লালচে চুলে ভরা মাথা দেখা যাচ্ছে। রামচন্দ্রের পিঠ ও মোঙলার চুলগুলি ঘামে ভিজে চকচক করছে আশ্বিনের রোদে। কেষ্টদাসের হাঁপানির টানটা সেদিন বেড়েছে, তার ক্ষেতে খাটো গাঢ় রঙের শাড়ী পরা তার নতুন আনা বৈষ্ণবী গ্রামের একটা অল্পবয়সী ছেলে তাকে সাহায্য করছে। সাদা ছাতা মাথায় ফিরোজি লুঙ্গি পরে হাজীর বেটা এসে দাঁড়িয়েছে তার নিজের ক্ষেতে। ছজন কৃষাণ কাজ করছে তার জমিতে। মাথায় ছাতা দিয়ে আজকাল জমিতে আসে ছমির মুনসী।

ছমির বললো, 'কে রামচন্দ্র না?' রামচন্দ্র মুখ তুললো, বাঁ হাতের ধানের ঘাসগুলি ডান হাতে নিয়ে বললো, 'আলম ভাই নিজেই, মোঙলাকে কলাম দুডে কিষাণ নিয়ে যা, বোঝা কাটা শেষ করেক, ও ক'লে একেই নাবলা (দেরীতে) বোনা, মাটি রাগ করবি অংকার দেখে।' হাসলো রামচন্দ্র এই ব'লে।

বস্তুতঃ এটা মিথ্যা। ছমির আর রামচন্দ্রের বয়স প্রায় সমান। এর আগে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করেছে তারা; অনেক চৈত্রের রৌদ্র, অনেক আষাঢ়ের ঢল্ গায়ে নিয়েছে তারা একসঙ্গে। হাজীর বেটার ক্ষেত জার্মানীর যুদ্ধ লাগাবার পর থেকে আসের পর আল ডিঙিয়ে ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তাটা ছোঁয়া ছোঁয়া

হয়েছে। অর পক্ষান্তরে রামচন্দ্রকে দুর্ভিক্ষের উন্মুক্ত গ্রাসে জমিগুলিকে নিজের দেহের বিনিময়ে গুঁজে দিতে হয়েছে। কাজেই হাজীর বেটা ছাতা মাথায় ক্ষেতে এলে রামচন্দ্রকে একটু মিথ্যা ক'রে বলতে হয় তখন, যেমন বাল্যে হাজীর বেটা তার বিশেষ একটি খেলনা আছে বললে রামচন্দ্রকেও মিথ্যা করে বলতে হতো আমারও আছে। কিন্তু সেই বুড়ো শকুনটার পাখসাটের শব্দ আর শুনতে পাওয়া যায় না; বর্ষার জলে সব পাখিই কাহিল। আর এবার আশ্বিনের রৌদ্রে কি ছিল কে বলবে, ধানের পুঁয়ে পাওয়া শিশুগুলি এত তাড়াতাড়ি বাড়ছে যে তাদের মন রাখা দায়। নিড়ানি বিদে নিয়ে ছুটোছুটি করছে কৃষকরা এরই মধ্যে।

শুধু ভুলে যাওয়া নয় দাঙ্গার কথা, দুঃখের পর স্বস্তিটা বড় ব'লে অনুভব হওয়াতে কৃষকেরা ধুলোর ঝড়ের পরে জলের জন্য চারাগাছগুলির আকুল হওয়ার মতো, আরও গভীর করে বাঁচবার প্রতিজ্ঞা করল। বিদে দিয়ে জমির চটা ভাঙবার সময়ে, রামচন্দ্র বলেছিল—এ সনটা তাদের কষ্ট করে থাকতে হবে, কিছু টাকা যাতে ক'রে দুর্ভিক্ষের সময় হাত ছাড়া হ'য়ে যাওয়া জমিগুলি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে তখন মোঙলার ভয় ভয় ক'রে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষের সময় জমিগুলি তখনকার ন্যায্যদামে কিনেছে জমির হাজীরা, ছমির, চিতেমা-জমি কি এখন তারা আয়াসে ফিরিয়ে দেবে!

কিন্তু ধানটা যখন ঘরে উঠেছে, তখন একদিন সন্ধ্যার দিকে গাড়ী করে ধান এনে উঠোনে ঢালতে ঢালতে খানিকটা দম্ভ হয়েছিল মোঙলারও। বুক ভরা ধানের গন্ধ ও ধুলোভরা বাতাস নিশ্বাসে নিতে নিতে ভয়টা কোথায় চলে গেল! ঘরের দাওয়ায় উঠে নজরে পড়েছিল রান্নাঘরের মৃৎপ্রদীপের আলোতে বসে প্রথম ওঠা ধানের চালে সরাপিঠে ভাজছে শাশুড়ী। মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। সব রকম ভয় থেকে মুক্ত হয়ে নিজে ডেকে বললো শ্বশুরকে, কেই জমি কিনবেন না? সকলের ধানবেচা সারা হ'লি জমি কি আর পাবেন?

এমনকি আকাশে চাঁদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ঘটনাও ঘটল। পথের উপরে চাঁদের আলো যেখানে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়েও যাচ্ছে না সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টদাসের অল্পবয়সী বৈষ্ণবী। মোঙলার মনে হয়েছিল বৈষ্ণবীকে বুকের উপরে টেনে না নিলেই নয়। তারপরে লজ্জায় মাথা নীচু করে ফিরে যেতে যেতে মোঙলা দেখেছিল, পাশের ক্ষেতের অস্পষ্ট আলোয় হাতড়ে হাতড়ে ঝিঙে পটল সংগ্রহ করতে করতে গুনগুন করে গানও করছে যেন বৈষ্ণবী।

রামচন্দ্র জমি ফিরে পেতে চেয়েছিল মাত্র, জমি বাড়ানোর সুযোগটাও যেন জুটে গেল তার। তার সে সুযোগটিও এল যেমনটি কল্পনা করা যায় না তেমন ভাবে। জমি কিনবার প্রস্তাব নিয়ে, সহায়তার আশ্বাস নিয়ে এল ছমির মুনসী নিজে, যে নাকি এদিককার মাঠে সব চাইতে বড় প্রতিপক্ষ তার। কথার শেষের দিকে আনন্দে গলা ধরে আসছিল রামচন্দ্রের। মাঝের ছ'সাত বছরের ব্যবধান পেরিয়ে তার মন ফিরে গিয়েছিল সেই সব অতীতে যখন দুজনে সন্ধ্যার পরে বসে জমি কিনবার শলা পরামর্শ করতো।

কিনব কথাটা বলতে গিয়ে রামচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে উঠেছিল সেদিন। টাকার অভাব ছিল তার। কিন্তু জমি-জমিই, টাকা নাই থাকল। যা আছে তার সব বন্ধক দিয়ে নতুন জমি কিনবে সে। বছরের পর বছর ফসল উঠবে, ঋণশোধ হ'তে কতক্ষণ? সব কৃষকই বোধ হয় এরকম চিন্তা করে, যদি বা রামচন্দ্র তাদের মধ্যে একটু বেশী দুঃসাহসী। অনেক ছোটবেলায় যখন সে মাথায় লাল গামছা বেঁধে সুস্থ সবল দেহ নিয়ে দুপুর রোদেও ক্ষেত চষতো তখন একদিন সে একটা তৃপ্তির সন্ধান পায়, নিজের দেহকে পীড়িত করবার কাজ করার তৃপ্তি। তার পরেও অনেকদিন তখন বিয়ে করেছে সে তার স্ত্রী দুপুরের ভাত নিয়ে গিয়ে ডেকে কেঁদে ফেলেছে দেখেছে ভুঁইটুকু ফালি ফালি করে চষেও আশা মেটেনি, পাতালের রস তুলে আনবার চেষ্টাতেই যেন বলদ দুটি আর তাদের মালিক অতি পরিশ্রমে থর থর করে কাঁপছে। অভ্যাসের ফলে এর পরে নিজের পৈতৃক জমিটুকু চষে রামচন্দ্র আকাঙ্ক্ষিত ক্লান্তিটুকু আর অনুভব করতে পারত না, এবং কোথায় ক্লান্তি খোঁজ করতে গিয়ে একটু একটু করে জমি বেড়ে চলতে লাগল।

একদিন বৌ জিজ্ঞাসা করেছিল,—

'কি করবা গো জমি দিয়ে?'

বালক মোড়লাও প্রশ্ন করেছিল আর একদিন, এখন তো খামার করছ, এরপর বুঝি জমিদার হবা সান্যালদের মতো?'

আরও বড় খামার হবি, তুই আর একটু বড় হ',—একখানা হাল ধরবার পারবি হয়।

—তা জানি হবি, তারপরে কি করবো?

- তারপরে চরের খানিক জমি নিব।

—তা যেন নিলা, তারপর?

—তোকে আদ্ধেক দিব, আমি আদ্ধেক নিব।

—তা যেন দিলা, তারপর কি হবি ?

—ধান হবি।

ধান হবে এর চাইতে বেশী রামচন্দ্র কখনই বলতে পারেনি।

কিন্তু জমি বাড়ানোর নেশা বলতে পারা না পারার উপরে অপেক্ষা করে না। মকসুদপুরের তারিণী গোঁসাই জমি বিক্রি করবে শুনে রামচন্দ্র গিয়েছিল সেই গ্রামে। একবারও সে ভাববার সময় পেল না, তারিণী গোঁসাই জমি বিক্রি করে কেন ? অন্য সময় হ'লে রামচন্দ্র নিজেই বলতে পারতো, বড় ছেলেটা বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাওয়ার পর থেকে দ'মে গেছে লোকটা।

কিন্তু জমি, তাই নাকি আবার কেউ বিক্রি করে ?

ঠিক এ সময়ে জমির চাইতে বড় কোন অনুভব তার কিছু ছিল না। ছমির মুন্সী স্বরটা নীচু ক'রে বলেছিল, জমি বেচবে তারিণী গোঁসাই। কিন্তুক এখন যাবানা, চিতে সাও যাবে না, বলা আছে তাকে।

তারপরে একসাথে তিনজনেই যাব।

তখনও ছমির মুন্সীর কৌশলটাকে ষড়যন্ত্র ব'লে বোধ হওয়া উচিত ছিল : অন্ততঃ চিতে সা যে নাকি যুদ্ধের বাজারে মানুষের হাড় চালান দিয়েছে বিলেতে, তার সঙ্গে নিজের নামটা যুক্ত হওয়াতে সংকুচিত হওয়া স্বাভাবিক হতো, কিন্তু কিছুই হ'লো না ; শুধু জমি বেচা-কেনার সময়ে ঝানু ব্যাপারীর মতো গোঁফ চুমরে মাথাটা দোলাতে দোলাতে সে ভেবেছিল—দাম বুঝি কমাবি, ক্যান্ ?

ক্ষেতে মই দিতে দিতে গরু মুখ বাড়িয়েছে রসভরা ধানের কচি গাছগুলির দিকে, তখন তার চোয়ালে লাঠির বাড়ি এসে পড়লে সে যেমন ক'রে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তেমনি ফিরে এসেছিলো রামচন্দ্র।

তারিণী গোঁসাই বললো—'সবাই ছেড়ে যাব।'

রামচন্দ্র শুনে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলেছিল—ইস, কন কি ? এই ভদ্রাসন, এই সব (কথাটা শেষ করবার ভাষা এল না, এইসব বলতে ভদ্রাসন নয় শুধু, স্নেহ মমতায় জড়ানো যে কোনও ভাষার চাইতেও বড় চিন্তার অগম্য একটা অনুভূতি।)

'উপায় কি ? যেতেই হবে।'

চিতে সা, সে তো থাকবি। এই বলে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছিল রামচন্দ্র। কিন্তু তারিণী গোঁসাই বেশি কথার মানুষ নয়, উঁচু করেও কথা বলে না। বলেছিল—থাকবে তা হ'লে।' মাথার মধ্যে গোলমাল হ'য়ে যেতে

যেতে রামচন্দ্র কথা খুঁজছিলো, ব'লে উঠেছিল—'গান্ধীও কি হার মানছে তাহলে? সুভাষ বোস, তিনিও তো বেঁচে আছেন। তাতেও কি গান্ধী সাহস পায় না?'

আতংকে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হ'য়ে যাওয়া যখন ভাগ্য-লিখন তখন কোথাও সাহস পাওয়ার নয়।

পথে দাঁড়িয়ে বিশ্বস্ত পা দু'খানা টলছিল, বারবার ঝেড়ে নিয়েও স্বাভাবিক হ'লো না গতি। যেটুকু যা জমি আছে তার সবই রেজিষ্ট্রি করা।

যেমন সাহস ফিরে পেল না সে তেমনি হ'লে না এদেশে মুসলমানের রাজ্যে ও হিন্দুরা বাস করতো এই ঐতিহাসিক তথ্যে।

ভয়ের চূড়ান্ত অবস্থায় যা হয় সেটাও ঘটে গেল। তার বাড়ীর কাছাকাছি বাকটায় পৌঁছে সে দেখেছিল—ধব ধবে রং রোদে লাল হ'য়ে উঠেছে, হাঁটু পর্যন্ত পথের ধুলো মাখা, তৃষ্ণায় মুখ্‌খানা শুকিয়ে উঠেছে, ছাতায় মুখ আড়াল করে হন হন করে হেঁটে চলছে একটা লোক। চিনি চিনি মনে হলেও চিনতে পারল না রামচন্দ্র। এমন চেনা অথচ যেন সব চেনার বাইরে। ছোট বেলায় যা শুনেছে, তাই মনে হ'ল নাকি? হঠাৎ একদিন এক শুভ্রবস্ত্র পরিহিত ক্ষুদাখিন্ন ব্রাহ্মণকে দুপুরের রোদে গ্রামের শুকনো মাঠ পার হ'য়ে যেতে দেখা যায়। প্রথমে মনে হয় গ্রামেরই একজন। পরে কেউই তাকে চিনতে পারে না। কারও সঙ্গে কথাও বলে না সে, শুধু কোনো গ্রামের গাছতলায় সে একটু দাঁড়ায় হয়তো, আর তারপরে চারপাশে লাগে অমঙ্গল, অনাহার, মড়ক।

পরে অবশ্য ব্যাপারটার অনৈসর্গিক দিকের নিরসন হয়েছিল; কিন্তু হায়, সে কি সমাধান! মোঙলা ফিরে এসে বলেছিল শাশুড়ীকে, 'ওমা একি হ'লো, সান্যালদের ছাওয়াল আসছে কর্তাকে নিয়ে যাবেন, গ্রামে আর থাকবিনে ওরা।' আকাশের দিকে মুখ তুলে রামচন্দ্র বলেছিল, 'যাতি হবি ক্যান, যাতি হবি তাইলে?'

অভ্যাসের বসে গোঁফ চুমরে দিল সে তখন। কাঁদো কাঁদো মুখে গোঁফ চুমরে দিলে যে হাস্যকর মুখভঙ্গিটি হয় তাতে ভগবানও হাসেন কিনা কে জানে! শুধু একলার নয় আঘাতের পর আঘাত দিয়ে মাটি থেকে শিকড় ছাড়িয়ে কৃষকদের নতুবা কে ভূমিহীন করবে।

একটি পরিমার্জিত অভারতীয় গল্প

উদয়ন ঘোষ

রোজকার মত আজও যোগমায়াব মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙল। প্রথম ডাক সে বুঝি স্বপ্নে পেয়েছিল। দ্বিতীয় ডাকে গলা মেলাতেই নাকি সুবে 'কংসের সাপ' ঠিকই বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা মেঝেতে নামিয়ে সাবা শরীরে সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। মোরগের তৃতীয় ডাক ঠিক তক্ষুনি হ'লেও, সে আর গলা মেলল না। তার মনে প'ড়ে গেল গতক'ল সকাল ১০টার আগেই গোপাল, তাদের একমাত্র গোপাল, বৌ নিয়ে পৃথক হয়ে অন্য পাড়ায় চলে গেছে।

তখনও ঘবে পুরো রাত্রি বলা যায়। জানালার ধারে সে রাত্রি যদিও শেষ হবার মুখে, তবু দেয়ালের কৃষ্ণকে সে ভালো দেখতে পেল না। কাছে গেল, কৃষ্ণ তবু আবছা। চোখ বুজল যোগমায়া। দুহাত কপালে এনে প্রণাম করল। গোপালের পাড়ায় কি মোরগ আছে? থাকলেও এ সময়ে ডাকল কি? ও পাড়ায় তো মোরগ থাকার কথা নয়। থাকলেও অন্তত দেশী মোরগ নেই। সাহেব মোরগ কি ডাকে? অন্তত 'কংসের সাপ' গলায় আসতে পারে না। সাহেব ব'লে কথা। ঠাকুর, গোপালকে রক্ষা করো। সত্যি-মিথ্যে জানি না, সেই ছেলেবেলা থেকে জেনে আসছি, এসময় জেগে উঠতে হয়। মোরগের ডাক শুনলে আর ঘুমাতে নেই। সংসার ভিতরেই তো কৃষ্ণ আছে, সেই ভেতরকার কৃষ্ণকে এ-সময় জাগাতে হয়। না জাগালে কৃষ্ণ বিনাশে 'কংসের সাপ' দংশন করে যাবে আমাদের অন্তরকে, যাকে কৃষ্ণ বলি, হরি যাকে রাখে! আহা, প্রহরে প্রহরে জাগ্রত থাকা মোরগই তো টের পেয়েছিল কংসের সাপ আসছে কৃষ্ণ বিনাশে। তাই সে এমন ভাবে ডাকে, গলা মেলাতেই

টের পাওয়া যায়, ঐ ডাকে কংসের সাপ আছে, আসলে ঐ ডাকে সাবধান করার কথা থাকে। এ জন্যই মোরগের ডাকে জেগে উঠতে হয়। না হ'লে অমঙ্গল হয়। বৃষের বিনাশ হয় অথচ কংসের বিনাশ হয় না। ঠাকুর, মোরগের ডাক কি গোপাল শুনল, সে কি জেগে উঠল তুমি আমার গোপালকে রক্ষা কোরো!

যোগমায়া চোখ খুলেও কৃষ্ণকে স্পষ্ট দেখল না। তাঁর মাথার ময়ূরের পালক মাত্র বোঝা গেল, আর কিছু না। মেঘ করেছে কি? রোজ তো এসময় সে কৃষ্ণকে দেখতে পায়। কৃপা করো ঠাকুর। আমার সেই গোপাল যে আর কথা শোনে না। বিয়ের আগে এ-সময় সে জেগে উঠত। দ্বিরাগমনের পর সেই যে এল বাড়িতে, তারপর থেকে রোজ একটু একটু ক'রে বদলে যেতে লাগল। ইদানীং আটটার আগে ঘর থেকেই বেরুত না। ছেলে বড় হলে আর কি কথা শোনে! কতদিনের অভ্যাস এই ভোরে ওঠা। সেই হাতেখড়ির দিন থেকে ওর বাবা মোরগ ডাক দিলেই ডেকে তুলতেন। না হ'লে কি আর এই বাজারে ডাক্তারী পাশ করতে পারত?

চলে গেল? ২৮ বছর ধ'রে যাকে বুকের রক্ত জল করে মানুষ করে তুললাম, সে চলে গেল?

কতদিনের বৌ ঐ বিভা, ২৮ মাসও হয় নি। সেই বউ তোর বড় হল? আর আমরা যে তোকে মানুষ ক'রে জীবনপাত করলাম। তুই যাতে মানুষের মত মানুষ হতে পারিস, তার জন্য তোর বাপ কী না করেছেন? ভোরে উঠতে হবে বলে বাড়ির সব নিয়ম পালটে দেননি তোর ঐ বুড়ো বাপ? কত হৈ চৈ, পিক্‌নিক্, আড্‌ডা, সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার, কত দেশ-দেশান্তর ঘোরা, সব জলাঞ্জলি দিয়ে, তোকে নিয়েই থাকেননি সারাটা জীবন? বাড়িতে আড্‌ডা বসতে দেননি, তাস খেলা ছেড়েছেন, কাজ থেকে ফিরে একদিনও বাইরে যাননি আড্‌ডা দিতে। সে তো এই জন্য যে তুই মানুষ হবি। মনে পড়ে গোপাল—তোর চোখে সিগারেটের আগুনের ফুলকি পড়েছিল বলে অত সাধের সিগারেট তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন জন্মের মতো। আর তুই কিনা সব ভুলে বৌ নিয়ে পৃথক হলি! না ঠাকুর, বুক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আমার, আমার দোষ নিও না।

এতক্ষণে ময়ূরের পালকের নিচে কৃষ্ণের দু'চোখ দেখা গেল। তাঁর হাতে বাঁশি ও সমস্ত কিছুতে উজ্জ্বল নীল বরাভয় দেখা দিল। যোগমায়া আরেকবার চোখ বুজে প্রণাম করে পাশের ঘরে গেল। ঢুকতেই চমকে গেল। নাকে

এল পরিচিত সিগারেটের গন্ধ, গোপাল এই সিগারেট খায়, ওর ঘরে এরই গন্ধ সর্বদা থাকে, তবে কি গোপাল ফিরে এল? বুকে ছলাৎ করে রক্ত এল, পেট খালি হয়ে গেল। না, গোপাল না, গোপালের বাবা। হায়, সে-ই সিগারেট খাচ্ছে। যোগমায়া দাঁড়াল না, ফিরে ঠাকুর ঘরে যাবার ইচ্ছায় সে গোপালের ঘর দেখবে-না-দেখবে-না করেও দেখল, দেখল তালাবন্ধ। রাতেও খোলা ছিল, তালা দিল কে? ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ যদিও, কিন্তু তালা খোলা। দরজা খুলতে খুলতে তার আর বুঝতে বাকি রইল না, গোপালের বাবা তারও আগে উঠেছেন। এবং সব তালা খুলে রেখেছেন। হয়ত সব তালা খুলে ছেলের ঘরেই তালা দিয়েছেন কিছু আগে। যোগমায়া কিছুই টের পায় নি। ঠাকুর ঘরের জানলা খোলা। অর্থাৎ উনি এ ঘরেও এসে-ছিলেন। ঠাকুরের সিংহাসনের কাছে এসে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসে উপুড় হয়ে প্রণাম করল। তারপর দ্রুত স্নানে গেল যোগমায়া।

বাথরুমে এসে দেখল বড় বালতি, গামলা ও চৌবাচ্চা সবই জলে ভরা। এ কাজও করে রেখেছেন, যেমন করেন রোজ। কুয়ো থেকে জল তোলার শব্দ পর্যন্ত কানে যায় নি তার। জেগে উঠে দেখ্, তোর বাপকে। কোনদিন কুয়ো থেকে এক বালতি জল তুলতে দেননি তোকে। অবশ্য তোর শ্বশুর-বাড়ি থেকে পাঠানো চাকর এতদিন তো দের জল তুলেছে, হয়ত কিছু বেশিই তুলেছে, তবু দেখ্, আজ তোর বাপ নিজে সব জল তুলেছেন। তোর বৌ তো চোখের মাথা খেয়ে চাকরটাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে। মনে মনে এতই যদি ছিল, প্রথম থেকে যদি পৃথক হতেই চাইছিলি, এতদিনে তোর বাপের জন্য একটা কাজের লোকও তো রেখে দিতে পারতিস। রোজগার তো এখন কম করছিস না। বাপের হাতে মাত্র ৪০০ টাকা দিলেই সব চুকে গেল। তোদের চাকর নিয়ে মোট তিনজনের খাওয়া-খরচা কি ঐ টাকায় চলে আজকাল? তোর বৌ এত কিছু বোঝে, কত কিছু বোঝায় তোকে, আর এই কানাকড়ি টাকায় যে দু'বেলা তিনজনের খাওয়াও জোটে না, এটা বোঝে না, বা বোঝায়নি তো তোকে? যোগমায়া চোখে জল দিল। শ্রাবণের কুয়োর জল ঠাণ্ডাই ছিল, তবু চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

কোনো শিক্ষাদীক্ষা যদি পেয়ে থাকে এই বৌ! সংসারে থাকতে গেলে শুধু টাকা তুলে দিলেই হল? আর কিছু করার নেই? গোপাল যদি বৌ-এর জন্য শাড়ি আনে, মায়ের জন্য তো আনবেই, এতে মুখ ভার করার কী! আবার শাড়ি কেন? একথা বলার মানেই তো, আবার মায়ের জন্য কেন?

চক্ষুলজ্জা তো আছে। ছেলে বলে কথা। ইচ্ছেও তো করে? তোরা যে মাঝে মাঝে বাইরে নেমন্তন্ন আছে বলে সন্ধ্যেয় বেরিয়ে রাত করে ফিরিস, হোটেলে ভালোমন্দ খেয়ে, এ কি আর গোপন থাকে? এর জন্যও তো ছেলের চক্ষুলজ্জা থাকতে পারে? যদি বাপ-মাকে ভালোমন্দ খাওয়ানোর জন্য মাঝে মাঝেই মিষ্টি, কী দৈ বা ইলিশ মাছ নিয়ে আসে তাতে তোর মাথা ব্যথার কি? তোকে খরচ করতে হয়? না তোকে গতর দিয়ে রাঁধতে হয়? যোগমায়া উত্তেজনায় বিনা মাজনে দাঁত মাজতে লাগল। বাঁ হাতের তালুতে মাজন ধরাই রইল। না হয় তোর বাপের টাকাতেই তোর সোয়ামী এক্সরে মেশিন কিনে চেম্বার খুলেছিল এ বাড়িতে, তাই ব'লে তোর কথাতে সেই চেম্বার আপকার গার্ডেনে তুলে নিয়ে যেতে হবে? কেন আসানসোলে কি লোকের পয়সা কম? ভালো ছবি তুললে লোকে গাড়ি করে এসে এখানে এই উষাগ্রামে এক্সরে করাবে। আপকার গার্ডেনের লোক ছাড়া বুঝি এ-পাড়ার লোকে এক্স-রে করে না? না হয় হ'লই বা সে-পাড়া ডাক্তারদের পাড়া, তাই ব'লে সেই সুবাদে বুড়ো বাপ-মাকে ছেড়ে যেতে হবে? যোগমায়া বেখেয়ালে বাঁ হাতের তালুতে ধরা মাজন জলের মগ ধরতে গিয়ে ফেলে দিল। বিনা মাজনে যোগমায়া মুখ ধুলো আজ। খেয়াল করল না। এ পাড়ায় কি ডাক্তার নেই? তিন তিনটে ব্যাংক আছে। ছ' ছটা ইস্কুল। একটা কলেজ। লোকে উষাগ্রামে বাড়ি নিতে হন্যে হয়ে ঘোরে। সেখানে নিজের বাড়ি। বারো মাস কুয়োর জল থাকে। সেই উষাগ্রাম ছেড়ে কেউ আপকার গার্ডেনে যায়? হ'তে পারে ক'দিন কথা শুনিয়েছি। তা শোনাবেই না বা কেন? সকাল ৯টায় ঘুম থেকে উঠে বাসি কাপড় না ছেড়ে ঘুর ঘুর করা, কার ভালো লাগে? বিকেল হলেই ঠোঁটে লিপস্টিক, পেট বার করা ব্লাউজ, কার ভালো লাগে? শরীর খারাপ থাকলে দু'একদিনই না হয় ঠাকুরের আসন দিয়েছিলি—না হয় দু'একদিনই—তোকে সাত সকালে স্নান করতে হয়েছিল। তার জন্য হাঁচি-কাশি, মুঠো মুঠো ওষুধ খাওয়া, কার ভালো লাগে? যোগমায়া মাথায় তেল দিল। বৌ মানুষ তুই, বাড়ির গুরুজনরা শুতে গেলে তুই শোয়ার ঘরে যাবি, তা না, আগে ভাগেই সোয়ামী নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা দিবি? আর তোর বুড়ো শ্বশুর হাজার দুয়ারীর তালা দিতে দিতে রাত কাবার করবে? তাও যদি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে কাক ভোরে উঠতিস! তা না রাত দুপুর করে সোয়ামীর সঙ্গে সোহাগ! ফিস ফিস করে আহ্লাদী কথা! যোগমায়া কাপড় না ছেড়েই গায়ে জল ঢালল, যা সে

কখনো করে না। ঠাণ্ডা জল এতসব ঘটনার পরও তাকে কিছু আরাম দিল, যা সে পাগের কয়েক মগ জল ঢেলে আরও পেতে চাইল। পেটে তো আসছে ছেলে, আমি বুঝি জানি না ভাবিস। সব জানি তোমারে বাঁধবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে। না ঠাকুর, আমার মাথার ঠিক নেই আজ, গোপালকে তুমি রক্ষা করো। যাবার সময় আমার গোপাল আমার দিকে একবারও চোখ তুলে তাকায়নি। তাকালে নিশ্চয় জলে ভরা থাকত চোখ। আঃ সেই চোখ! কেন এমন হল ঠাকুর? অতো বাধ্য গোপাল, যেন শালগ্রাম শিলা, শোওয়া-বসা সমান ছিল, যেমন রাখতাম তেমন থাকত। কী যে হয় এই ছেলেদের! বড় হলে কি পাখনা গজায়? সেই যে পড়তে গেল কোলকাতায়, তখন থেকেই শুরু। নীলরতনে মাতামাতি। উঃ কি ভয়ংকর দিন গেছে! ছেলে কৃষি বিপ্লব করবে! ছেলে গ্রামে যাবে। ছেলে ধনীর পিঠের চামড়া খুলে গরীবের পায়ের জুতো বানাবে। ছেলে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবে। পড়াশুনো করলে নাকি গরীবদের ঘৃণা করতে শেখা হয়। হল তো একবছর নষ্ট! তখন কথা কি শুনতো? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হল তো এক বছর! তোর মামা আই, বি, না থাকলে তুই কি বাঁচতিস? যোগমায়ার শীত করছে। তাই তাড়াতাড়ি ভেজা কাপড় ছাড়ল। গামছা পরে সাত তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে এল। আলনা থেকে হাতের কাছে যে শাড়ি পেল, তাই পরল। সাদা শাড়ি। ঠাকুর ঘরে সে স্নানান্তে এক বস্ত্রে যায় তাই গেল। যাবার আগে একবার স্বামীর ঘরে উকি মারল। সমানে সিগারেট খেয়ে চলছে সে। খালি পেটে এত বছর পর এত সিগারেট খাচ্ছে! ভালো না। কিন্তু সাহস হল না কিছু বলতে। বড় শান্ত তার স্বামী। বড় কম কথা বলে। কথা শুনবে না। যোগমায়ার কথা কখনো শোনে না। নইলে শাশুড়ীর গঞ্জনা সহ্য করে মুখ বুজে সে-যে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবাযত্ন করে গেল তাদের মৃত্যু পর্যন্ত, সে তো ঐ শান্ত মানুষটির জন্যই! সে যে কোনো কথা বলে না। নীরব থাকে। নীরব থাকতে বলে। যোগমায়া বিনা বাক্য ব্যয়ে তাই ঠাকুর ঘরে এল। ঠাকুর ঘরের পিতলের বালতি নিয়ে কুয়োতলায় গিয়ে জল তুলল। ফিরে এসে সে ঠাকুরের সিংহাসনের কাছে বালতি রেখে আবার বাইরে গেল। তার ঘর মোছার কথা আগে খেয়াল হয়নি। ঘর মুছে, বালতির জল ফেলে আবার বালতিতে নতুন জল তুলল। আবার এসে বসল। ততক্ষণে ভোর এসে গেছে ঘরে। সিংহাসনের মাঝখানে বসে আছে পেতলের গোপাল। এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নাড়ুর জন্য। কতদিন নাড়ু ভোগ দেওয়া হয় না। যোগমায়া গোপালকে

তুলে আনল সিংহাসন থেকে। এবার স্নান করাবে। এখন শ্রাবণ, তাই খালি গা। শ্রীপঞ্চমীর দিন থেকে জামা গায়ে দেবে। কত জামা আছে গোপালের। জরির জামা, সিল্কের জামা, উলের জামা, কত কী। এই গোপাল প্রতিষ্ঠা করেই তার পেটে গোপাল এসেছিল। ৫ বছর শূন্য ছিল এই ঘর। শ্বাশুড়ী কম গঞ্জনা দিত এই নিয়ে? অলক্ষ্মী, বাঁজা, হিজড়ে, কোনো গাল-মন্দই বাদ যেত না। একবার সে কেঁদে 'মা' বলে চিৎকার করেছিল। হ্যাঁ নিজের মাকেই ডেকেছিল যোগমায়া। আর তাতেই শ্বাশুড়ী শাসিয়েছিলো, কী বাপের বাড়ির জন্য সোহাগ, ঐ জিভ সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ছিঁড়ে দেব, যদি ফের বাপের বাড়ি জিভে আনিস। যোগমায়া আর কখনও মা ডাকেনি এ বাড়িতে। শ্বাশুড়ী কও না। তারপর ঠাকুর, গোপাল আমার, তোমাকে পেলাম যেদিন, সেদিনই পেটে এলে তুমি। আর মা ডাক শুনলাম। কী মিষ্টি এই ডাক! আয় গোপাল, কোলে আয়, বেলা হল স্নান করবি না? ঘুম হয়নি কাল? গা এত গরম কেন! খুব কেঁদেছিস বুঝি? আয়, এই তো কাছে তুই, এই তো কোলে আমার। না, আর কাঁদে না। তোকে এবার থেকে আমার কাছে শোয়াবো। আমার বিছানার কাছে তোর একটা সিংহাসন করে দেব। শুবি না? যোগমায়া দেখল গোপালের মুখে হাসি। এই তো লক্ষ্মী ছেলে। হাত ধোবাও তো গোপাল! গোপাল হাত ধোবালো। আজই তোকে নাড়ু দেব। গোপাল হাত বাড়ালো। না এখন না, আগে স্নান করো, তারপর তো নাড়ু। ভেবো যে স্নান করতে হয়, বাবা! বাঃ এই তো লক্ষ্মী ছেলে। যোগমায়া কোশার মধ্যেই দক্ষিণ অঞ্জলি ভরে স্নান করাতে লাগল গোপালকে। তার শাড়ি ভিজে গেল। তার খেয়াল হল না। তুই যদি এরকম থাকিস আমার মরণ পর্যন্ত তাহলে তোকে রোজ ক্ষিরের নাড়ু খাওয়াবো। যোগমায়া নিজের আঁচল দিয়ে গোপালের গা মোছালো। কী, শীত করছে? কাঁপছিস কেন? আয় তোকে আঁচলে বেঁধে রাখি। যোগমায়া আঁচলের শুকনো দিক দিয়ে গোপালকে বেঁধে সেই আঁচলের দিক গলায় জড়িয়ে বুকের কাছে রাখল।

সিংহাসনে গত দিনের ফুল পড়ে রইল। বাঁ দিকে আদ্যা মা, পিছনের রাধাকৃষ্ণ, ডান দিকের মা দুর্গা ও তাঁর পাশে গণেশের ছবি অস্নাত রইল। যোগমায়ার খেয়াল হল না।

সে কেবল আঁচলে বাঁধা গোপালকে নিয়ে উপুড় হয়ে কাঁদল। প্রণাম পর্যন্ত করল না। কাঁদতে কাঁদতে তার শাড়ি আরও কিছু ভিজে গেল।

এক সময় সে যখন উঠল তখন সকাল চলে যাবার মুখে। সে ভুলে গেল তার গোপাল আঁচলে বাঁধা আছে। সব কিছুই ভুলে সে শোবার ঘরে গেল। ভেজা কাপড় ছেড়ে আলনা থেকে যে শাড়ি হাতে পেল, সেটাই পরল। আঁচলে বাঁধা গোপাল ভেজা শাড়ির সঙ্গে প'ড়ে রইল মেঝেতে।

শাড়ি ইত্যাদি পরে সে যখন স্বামীর ঘরে গেল তখন মেঘ কেটে গেছে! দেখল, ঘরে রোদ। দেখল, ঘর ফাঁকা। গেল কোথায়? সারা ঘর সিগারেটের গন্ধে ভরে আছে। তার মাথা মোটে কাজ ক'রছে না। সারা গায়ে কেমন কম্পন। পা দু'টো ঠিক রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। আবার ঠাকুর ঘরে এল। যদিও খুব কাছে না, তবু সিংহাসন স্পষ্ট। গোপাল নেই। বুক ফাঁকা হ'য়ে গেল যোগমায়ার। কোথায়?

যোগমায়া কাছে গেল। রাধাকৃষ্ণের ছবিতে রোদ পড়েছে। কৃষ্ণ হাসছেন। তাঁর চোখ যোগমায়ার সারা শরীরে লীলা করছে যেন। যোগমায়া জগৎ ভুলে গেল। কৃষ্ণ সিংহাসন ছেড়ে নিচে নামছেন। এগিয়ে আসছেন। সারা ঘর নীল হয়ে গেল। তার শাড়িও নীল দেখল যোগমায়া। তার আর নিঃশ্বাস পড়ল না। কৃষ্ণ তার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যোগমায়া পাথর হয়ে গেল। চোখ অন্ধকার। চোখ বুজে এল। তবু সে এক পা এক পা করে কৃষ্ণের পিছু পিছু যেতে চাইল! চোখ খোলা যাচ্ছে না। কৃষ্ণকে আর দেখা যাচ্ছে না। মেঘ করে এল। সারা বাড়ি অন্ধকার করে মেঘ ডাকল। যোগমায়ার কপাল ঠুকে গেল বন্ধ দরজায়। জোর করে চোখ খুলে দেখল, সে ছেলের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। কপাল জুড়ে ঘাম। দরজায় তালা নেই। দরজা আধবোজা। ঘরে আলো। ঘরে ঢুকল যোগমায়া। সারা ঘর জুড়ে যেন ছেলের শোবার খাট, বিছানা সর্বস্ব হয়ে আছে। সে আর পারল না। ছেলের বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। সে বলতে চাইল, কোথায়? পারল না। কোথায় গেলে তুমি? গলা কাজ করল না।

আপস

অভিজিৎ সেন

প্রশাসনে একধরনের মানুষ থাকে যাদের নিয়ে বড় ঝামেলা হয়। তারা সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে। সবকিছুর মধ্যে কু দেখে। 'ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়' এই ধ্রুপদী সূত্র অনুসারে এইসব কু-কে দূর করার জন্য যত্রতত্র আঘাত হানে। এরা নির্বোধ নয়, কাজেই ঘটনা কতদূর গড়াবে সেসব সহজেই অনুমান করতে পারে, কিন্তু কেয়ার করে না। হয়ত এরমধ্যে একধরনের বীরত্ব আছে, একধরনের আত্মতুষ্টি। অথবা, সেই ইস্কুল বালকের মনস্তত্ব, চোখে পড়ার নেশা। হয়ত আরো কিছু; কিছু মহত্ব। মানুষের, চতুষ্পার্শ্বের বেঁটে-খাটো খর্বাকৃতি মানুষের লোভ ও নীচতার জন্য ক্ষোভ, ক্রোধ এবং দুর্বল মানুষের উপর সবল ও অত্যাচারীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধতা। হয়ত বা, সমস্ত দুর্বল অক্ষম মানুষকে নিজের আশ্রিত মনে করার এক আশ্চর্য সরল মনস্তত্ব।

রুদ্র সেন এরকম এক ব্যক্তি। বর্তমানে তার তিন নম্বর চাকরীতে পশ্চিমবঙ্গের জিলাসদরে ডেপুটি। আগের দুটি চাকরী বর্তমানেরটি অপেক্ষা অনেক বেশি শাঁসালো ছিল। ধোপে টেঁকেনি। উভয়ক্ষেত্রেই উপরওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধ করে পদত্যাগ।

অসম্ভব তেজী মানুষ, অসাধারণ আই কিউ। কেরানিবাবুরা ফাইল খোলার আগে রুদ্রপ্রতাপ সমস্যা বুঝে ফেলে। ধমক খেয়ে চেয়ারে বসে সাহেবের সামনে, যা এখনো নিয়মা-বিরুদ্ধ। রাজনৈতিক নেতা, 'মস্তান, ধান্দাবাজ, মিলমালিক বসতে না বললে বসতে সাহস পায় না। এরকম দাপটের ডেপুটি বহুকাল দেখেনি লোকে। সাধারণ মানুষ খুবই পছন্দ করে। আবার হাবভাব একেবারে কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেছোকরাদের মত। বুক-খোলা সাধারণ সুতির জামা, নিচে গেঞ্জি নেই। পায়ে হাওয়াই চপ্পল।

রোগা, পাঁচ ফুট সাত আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মানুষটা অত্যন্ত দ্রুত হাঁটে। গ্রামের লোক কোন কারণে চেম্বারে ঢুকলে বেরিয়ে এসে ভাবে, এলা হাকিম বয় ছেই ছেই! আবার এইসব মানুষই তার আসল পরিচয় পেয়ে খুব হৃষ্ট হয়। হায় রে বাপু, হাকিম বটে এ্যাটা। বড় ধাবুক্ বা কোপান্ কোপান! ঝাঃ সব্বোনাশ!

দৈর্ঘ্য প্রস্থ যাই হোক না কেন, রুদ্র একটু অন্য মাপের মানুষ। বিশেষ করে ৭২ থেকে ৭৬, এই চার বছরে বড় বে-মাপ; বেমানান। কোন সহকর্মীর বিদায় অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠানে তার সহকর্মীরা যখন অত্যন্ত গ্রাসে মেপে মেপে মদ্যপান করে, রুদ্র তখন অতি সহজেই মাত্রা ছাড়ায় এবং ডি, এম, থেকে শুরু করে অন্যান্য সহকর্মী পর্যন্ত, যার যার বিরুদ্ধে তার যথার্থ ঘৃণা আছে, অশ্রাব্য বিষোদগার করে। চ-কার, ম-কার ইত্যাদি তার জিবে খুব স্বাভাবিক-ভাবেই আসে, আর সেগুলো ব্যবহারেও তার কোন কার্পণ্য থাকে না।

কাজেই বাহাত্তরে এক জিলা পর্যায়ের মিটিং-এ মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই কয়েকজন এম এল. এ -কে সে বেশ নাস্তানাবুদ করে। ঘটনাটা ছিল এইরকম। কোন একজন এম এল এ. মিটিং চলাকালে কোন একজন এক্সটেনসন্ অফিসারের বিরুদ্ধে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ আনে। উক্ত অফিসারও মিটিং-এ ছিল। বয়স্ক লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলে। সে শুধু বলতে পারে, এ ধরনের অভিযোগ আমি জীবনে এই প্রথম শুনলাম, স্যার। যদি প্রমাণ হয় স্যার—।

রুদ্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, এম, এল, এ, সাহেব, ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবেন? এম, এল, এ-রা একটু অসুবিধায় পড়ে। রুদ্র আবার বলে, এবার মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে, স্যার, আমরা সবাই চোরের বাচ্চা নই। তবে আপনার বাঁপাশে যে সব এম, এল, এ, সাহেবেরা বসে আছেন, তার মধ্যে কয়েকজন বেশ পাকা চোর আছেন, এসব চুরির সাক্ষ্যপ্রমাণও আমাদের হাতে আছে।

ফলে গুঞ্জন এবং ক্রমে সোচ্চার গুঞ্জন। রুদ্র ঠ্যাঁটার মত দাঁড়িয়ে থাকে। বসে না। ডি, এম, এস, পি, পর্যন্ত বিব্রত। হঠকারিতার একটা সীমা থাকা দরকার। এ ছোকরার হোল কি? হঠাৎ এক আধজন এম, এল, এ, ছিটকে ফেটে পড়ে। এসবের মানে কি? মিটিং-এ ডেকে এনে এসব কি ধরনের অপমান! আমরা জনগণের প্রতিনিধি। সরকারী অফিসারদের স্বভাবচরিত্র কি আমাদের অজানা কিছু? ঠ্যাঁটা রুদ্র দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, প্রমাণ চাই,

প্রমাণ। অন্তত বিশ্বাসযোগ্য পরিমাণ অভিযোগ চাই।

প্রচুর গণ্ডগোল। অফিসাররা সাহস করে উঠে দাঁড়ায় না কেউই, কিন্তু পাশের ব্যক্তিকে সরবে নিজের মনোভাব জানায়। সুতরাং হলঘরে আওয়াজ ভালই হয়। মন্ত্রী টেবিল চাপড়ে "সাইলেন্স, সাইলেন্স" বলে। সবাই থামলে ভ্রূকুঞ্চিত অভিজ্ঞ মন্ত্রী বলেন, লেট আস প্রসীড টু দ্য নেক্‌সট্‌ আইটেম অব্‌ আওয়ার এজেন্‌ডা।

এভাবে বিষয়টা সাময়িক ধামাচাপা দেওয়া হয়। মিটিং-এর পর একজন সহকর্মী রুদ্রকে পিট চাপড়ায়, সাবাস রুদ্র, একদম ঝামা ঘসে দিয়েছিস, মাইরি।

উত্তরে রুদ্র বলে, চোপ্‌ শালা, চোর! একটাও কথা বলবি না, তাহলে লাথ্‌ মেরে একদম দাব্‌না ভেঙে দেব। শালা, এতক্ষণ কোন্‌ ইয়েতে মুখ দিয়ে বসেছিলে যে আওয়াজ বেরোয়নি?

ঘরে বাইরে এইভাবে রুদ্রপ্রতাপের শত্রুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ে। সহকর্মী-দের মধ্যে যাদের দুর্বলতা ছিল তারা তাকে এড়িয়ে চলত। বাইরের রাজনৈতিক মানুষ, ব্যবসাদার, মস্তান, ইত্যাদির সঙ্গে রুদ্রর যোগাযোগের সুযোগ কম ছিল, কেননা, তখন তার প্রোবেশন শেষ হয়নি। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ কোন দপ্তর তার হাতে ছিল না।

কিন্তু চুয়াত্তর-পঁচাত্তরে জাতি ভীষণভাবে এগোতে লাগল আর সরকারেরও কাজ বেড়ে গেল দ্রুত। তখন এই ছোট জেলাতেও সব প্রোবেশনারদের ঘাড়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বসিয়ে দেওয়া হতে লাগল। এ সময়ের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল ধান সংগ্রহ। সব অফিসারদের ঘাড়ে অতিরিক্ত হিসাবে এই খাদ্যসংগ্রহের দায়িত্ব এসে পড়ল।

রুদ্র তার স্বভাব অনুযায়ী এ কাজে কিছু চমৎকারিত্ব দেখায়। জেলার মিলগুলো চিরকালই নানা কায়দায় আসল সংগ্রহ এবং কাগজে কলমে সংগ্রহের মধ্যে ব্যবসা করে। এটাই তাদের আসল ব্যবসা। জেলার মোট কুড়িটি রাইস্‌ মিলের মধ্যে আঠেরোটিই মাড়োয়ারীদের। একটি বাঙালীর এবং অন্যটি সমবায় পরিচালিত। রুদ্র এই মাড়োয়ারী মিলগুলোকে যখন তখন পরিদর্শন করে একেবারে তছ্‌নছ্‌ করে দিল। সব থেকে বড় মিল পুরখচাঁদের তিন নম্বর মিল।

পুরখচাঁদের কি কারণে কেন যেন সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি ছিল। একদিন সহকর্মীদের আড্ডায় রুদ্র তার স্বাভাবিক দাম্ভিকতায় ঘোষণা করল, পুরখচাঁদের আমি ফাঁসাব। এস, ডি, ও,-র কোন কারণে পুরখচাঁদের উপরে

দুর্বলতা ছিল। এফ, সি, আই,-এর জিলা ম্যানেজার এরও তাই।

এস, ডি, ও, বলে, পুরখচাঁদের দু-নম্বর খাতা নেই।

রুদ্র তার স্বাভাবিক নিষ্ঠায় বলে, পুরখচাঁদের যদি দুনম্বর খাতা না থাকে, তাহলে আমার দুনম্বর বাবা আছে।

এবং পুরখচাঁদের দুনম্বর খাতা হঠাৎ একদিন হানা দিয়ে রুদ্র বের করে ফেলে। মিলের কেনাবেচার উপর নজর রাখার জন্য ফুড কর্পোরেশন প্রতি মিলে একজন করে পরিদর্শক পোস্টিং করে। কেউ কেউ স্বস্তিতে এবং অন্যরা শান্তিতে চাকরী করার জন্য মিলওয়ালাদের ঘাঁটায় না। যারা লাভ খোঁজে এতে তাদের প্রচুর লাভ আছে। মিলের মোট ক্রয়ের উপর সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে লেভি হয়। লেভি বহির্ভূত ধান স্বাধীনভাবে মিলমালিক বাইরে বেচতে পারে। মোটামুটি এই ছিল নিয়ম। কাজেই ধান সংগ্রহের আসল হিসাবটি থাকে দুনম্বর খাতায়। রুদ্র এই দুনম্বর খাতা বের করবার জন্য যেসব পদ্ধতির আশ্রয় নেয় তা মুদ্রণযোগ্য নয়, তবে ফুড কর্পোরেশনের পরিদর্শকটিকে সে গোটা তিনচার লাথি মেরেছিল এটা ঠিক, কেননা সে লোকটার সহযোগিতা ছাড়া পুরখচাঁদের এই দুই খাতার বিরাট ফারাক সত্বেও সদব্যবসায়ী সুনামটি রাখা সম্ভব ছিল না।

সদরে এসে রুদ্র প্রথমেই এস, ডি, ও,-র চেম্বারে যায় এবং বলে, আমার বাবা একটাই আর পুরখচাঁদের দুনম্বর খাতা আমার বগলে। বলে সে নিজের চেম্বারে চলে আসে। এস, ডি, ও, গম্ভীর হয়।

পরদিন থেকে সদরের চেহারায় কিছু চাঞ্চল্য ধরা পড়ে। পুরখচাঁদের লোক রুদ্রর কাছে বারবার আসে, কোন ফল হয় না। রুদ্র তখন ইস্কুলের ট্রফি জেতা নজর-কাড়া বালক। প্রতিপক্ষীয় রাজনৈতিক পার্টি মেলা হৈচৈ করে এবং রুদ্রের নামে জিন্দাবাদ দেয়। তাদের হিসাবমত জেলার মন্ত্রীর দু-নম্বরী টাকা পুরখচাঁদের ব্যবসার মাধ্যমেই ডিম পাড়ে।

এসব কথা কতদূর সত্যি কে জানে। তবে উপরের আদেশে রুদ্রকে ধান সংগ্রহের কাজ থেকে উঠিয়ে এনে চাকরী-প্রার্থী বালক-বালিকাদের ফটো, মার্কশীট, ইত্যাদি নকল প্রত্যয়িত করার মত একটি মহৎ কাজে বসিয়ে দেওয়া হয়। তার আগে অতিঅবশ্যই বাজেয়াপ্ত করা পুরখচাঁদের দুনম্বর খাতা ও অন্যান্য কাগজপত্র একটি রিপোর্টসহ স্বয়ং ডি, এমের কাছে তাকে জমা দিতে বলা হয়। "রিপোর্ট সহ" ব্যাপারটা নিয়ম মাফিক ছিল, কিন্তু অতিশয় টঁ্যাটন রুদ্র একটি বিস্তারিত রিপোর্ট লেখে, বাজেয়াপ্তের তালিকা বানায় এবং

নাজিরবাবুকে ডেকে সব কাগজের কপিতে সই করে তবে নিতে বলে। নাচার নাজিরবাবু এই তরুণ কালাপাহাড়টিকে এতদিনে ভালই চিনেছে। এতদিনের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উপর যে তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, নাজিরবাবু তা ভালই জানে। তবুও বলে, আমাকে নিমিত্তের ভাগী করেন কেন, স্যার ?

—বাঃ, রিপোর্ট রিসিভ করবেন না ?

—আমি একবার বড়সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আসি স্যার।

অবাঙালী ডি, এম, বলে, দ্য মিনিষ্টার ইজ এনয়ড্ উইথ ইউ।

রুদ্র অতিদ্রুত দুহাত উল্টে বলে, কাণ্ট হেল্প্। সেজন্যই এসবের রসিদ এবং প্রাপ্তিস্বীকার আমার দরকার।

এরপরে রুদ্রকে এটেসটেশন, এফিডেবিট এবং সরকারী গাড়ির পুল ইনচার্জ হয়ে অফিসে বসে থাকার চাকরি করে যেতে হয় আরো কিছুদিন।

কিন্তু এসব ঘটনা এম, এল, এ, পুরখচাঁদ কিংবা মিনিষ্টার কেউই ভোলে না। রুদ্রের মত লোকের প্রত্যক্ষ প্রশাসনে থাকা খুবই বিপজ্জনক। তার ওপর এসব কাজ করে পার পেয়ে গেলে অনেকেরই ইজ্জৎ ঢিলে হয়।

সুতরাং রুদ্রপ্রতাপ জেলার একটি দুর্গম প্রত্যন্তে একটি আঞ্চলিক উন্নয়ণ প্রকল্পে প্রোজেক্ট অফিসার হয়ে বদলি হয়। শুভানুধ্যায়ীরা স্বস্তি পায় এই ভেবে যে খ্যাপা মানুষটা এখানে অন্তত কোন ঝামেলায় পড়বে না, আর শত্রুরা ভাবে, নির্বান্ধব এই দুর্গম জায়গায় বাছাধন এবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ভুল সবই ভুল প্রমাণিত হয়। ঢেউ গুণে ঘুষ খাওয়া যায় আর, হাওয়ার সঙ্গেও বিরোধ করা যায়। রুদ্রপ্রতাপ যেখানে, ঝামেলাও সেখানে। বিরাট প্রকল্প। নিতান্তই নিরক্ষর সরল চাষীগৃহস্থ নিয়ে কারবার। প্রকল্পের প্রধান কাজ সেচের জলের ব্যবস্থা করা। প্রায় আট লক্ষ টাকার একটি সেচ-ব্যবস্থার জন্য প্রকল্প টেণ্ডার দেয়। মহকুমা শহরে এস, ডি, ও,-র ঘরে বসে রুদ্র সীলকরা খাকলে ঠিকাদারদের টেণ্ডার নেবে। কাজ কম নয়। দুশরও উপরে অগভীর নলকূপ হবে, ঐ সংখ্যক পাম্প ঘর হবে এবং বৈদ্যুতিক ওয়েরিং। এ হোল এক পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে, ঠিক ঐ সংখ্যক ইলেকট্রিক পাম্প মেসিন। প্রথম পর্বে আট লক্ষ এবং দ্বিতীয় পর্বে ছ'লক্ষ, এই মোট চোদ্দ লক্ষ টাকার কাজ।

কাজটি লোভনীও কাজেই জেলার ঠিকাদারদের মধ্যে তোড়জোড় সুরু হয়। অগভীর নলকূপ এবং ঘর, কাজটির মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে। কেননা, নলকূপ ব্যাপারটা মাটির নিচেই থাকে। ঠিকাদারেরা উৎসাহী, নিম্নতম

কোটেশনে টেণ্ডার গ্রাহ্য হবে।

এস, ডি, ও,-র পাশে বসে রুদ্র বৃথাই অধীর হয়। কোন টেণ্ডার জমা পড়ে না। দিনের শেষে একটি মাত্র টেণ্ডার ফরম জমা পড়ে এবং সেটাই গ্রহণ করতে হয়। পরে জানা যায়, নতুন জমানায় জাতি রকেটের গতিতে এগোচ্ছে এবং জনৈক অনিল দাস হাতে রিভলবার নিয়ে অন্যদের সন্ত্রস্ত করে টেণ্ডার ফরম জমা দিতে বিরত রেখেছে। সাধারণতঃ, আজকাল ঠিকাদাররা একটা পারস্পরিক চুক্তিতে কিছু টাকার বিনিময়ে অন্যদেরকে বিরত রেখে একজন টেণ্ডার দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও হোল না।

রুদ্র ঘটনাটা শুনল এবং জানল এই অনিল দাস জনৈক ক্ষমতাশালী নেতার শালা। অথচ আইনত কিছুই করার নেই। রুদ্র কিল হজম করার মত চাপা অপমান বোধ করে। মনে মনে ভাবে দাঁড়াও বাপ, কাজ আমার আনডারেই করতে হবে। বিল আমিই পেমেণ্ট করব। তপ্ত খাওয়াব রক্ত হাগাব।

কাজ শুরু হোল। রুদ্র প্রোজেক্টের দুই সুপারভাইজরকে বলল, নজর রাখবেন, কাজ কিন্তু আমি বুঝে নেব।

কিন্তু সময়টা ছিয়াত্তর সালের জুন জুলাই মাস। অনিল দাস সর্ব-ভারতীয় ইউনিফরম গুরু পাঞ্জাবী এবং চাপা পাজামা পরে জীপ নিয়ে ঘোরে। দিল্লীর মাপে তার চুল, জুলফি এবং গোঁফ ছাঁটা। সুপারভাইজররা কোন কোন ব্যাপারে খুঁত খুঁত করতে পরিস্কার বলে দিল, কাজ হ্যাণ্ড-ওভার করার আগে সাইটে আসবেন না।

রুদ্র বলল, ঠিক আছে, যাবেন না মাঠে, আমি পরে দেখব।

যথাসময়ে কাজ শেষ হোল, বিল জমা পড়ল অফিসে। আট লক্ষ টাকার বিল। প্রতি টিউবওয়েল এবং পাম্পঘর বাবদ চারহাজার টাকা করে দুইশ' টিউবওয়েল এবং ঘর। সুপারভাইজররা বলল, প্রতি টিউবওয়েল আছে আশি, বিরাশি ফুট করে, কিন্তু বিল হয়েছে স্যার একশ' কুড়ি ফুট করে। চল্লিশ ফুট পাইপের দাম কমবেশ ছ'শ' টাকা! চল্লিশ ফুট বোরিং চার্জ একশ' কুড়ি টাকা। দুশ'টা শ্যালোতে, এই এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা একেবারে মাথায় চাঁটি মেরে নেবে, স্যার! এছাড়া মেটেরিয়ালস্-এর কথা তো ছেড়েই দিলাম, স্যার। গ্যালভেনাইজড এক নম্বর পাইপের জায়গায় তিন নম্বরি সাধারণ পাইপ, চার প্লাইকয়ারের জায়গায় তিন প্লাইকয়ার ফিলটার।

রুদ্রের মেজাজে বলীয়ান সুপারভাইজর বলে, একি মগের মুল্লুক, স্যার!

রুদ্র বলে, ও যদি মগ হয়, আমি স্প্যানীশ আর্মাডা, হার্মাদ !

রুদ্র বলল, তার ফেলে আপনার টিউবওয়েলের দৈর্ঘ্য মেপে দেখব, অনিলবাবু। অনিল দাস বলে, ওতে কিছু প্রমাণ হয় না স্যার। কোর্টে এস্টাবলিশ করা কঠিন হবে।

—দরকার হয় দুচারটে টিউবওয়েল তুলে দেখব।

কেন ঝামেলা করছেন স্যার ? কাজ আজকাল এরকমই হয়।

জলের ফ্লো মেপে নেব। শুনলাম আপনার টিউবওয়েলের ফ্লো পাম্প থেকে তিন ফুটের বেশি যাচ্ছে না ? আমার অন্তত ছ'ফুট চাই।

সে তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড লেয়ার-এর উপর নির্ভর করে স্যার।

হ্যাঁ আমরা টেস্ট করে দেখেছি। লেয়ার বেশ ভাল। আর শুনুন, প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ছ' হাজার গ্যালন জল মেপে নেব।

অনিল দাস চেয়ার ঠেলে ওঠে। বলে, আপনি অযথা ঝামেলা করছেন স্যার। আপনার সুপারভাইজাররা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট যাতে দেয় সে ব্যবস্থা আমার। আপনি বিল পাশ করবেন।

রুদ্র চাপা গলায় বলে, মিঃ দাস, কাজ বুঝে পয়সা দেব আপনাকে। সুপারভাইজাররা রিপোর্ট দেবে আমাকে, আপনাকে নয়।

অনিল দাস ছিয়াত্তরের বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকায় রুদ্রের দিকে।

রুদ্রর বোতলের দুর্বলতা সবাই জানত। এরপর এক সন্ধ্যায় অনিল দাসের ভগ্নিপতি একটি দামী বোতল নিয়ে রুদ্রর কোয়ার্টারে আসে।

রুদ্র বলে, এখানে এখন অন্য কেউ নেই, তাই কি আপনার মনে হোল আমাকে অপমান করা সহজ ?

আরে না, না। আপনি ব্যাচেলার লোক, একা থাকেন। ভাবলাম আপনার এখানে এসে একটু ফুর্তি করে যাই। এদিকে এসেছিলাম একটু কাজে।

ফুর্তি তো লোকে রাঁড়ের বাড়িতে করে। মানে মানে বিদায় হন, নাহলে বোতল পেছনে ঢুকাব।

এই হোল রুদ্র। সুযোগ পেলে ছোবল মারবেই। কেউটে সাপের মত, ঘাস নড়তে দেখলেও ছোবল মারবে।

এরপর ছিয়াত্তর সাল-শরীরী হয়। প্রোজেক্টের দুই সুপারভাইজার মার খায় ও অপমানিত হয়। রুদ্র থানা অফিসারকে ফোন করে আসতে বলে। প্রশাসনে না থাকলেও ডেপুটি সে বটে। সুতরাং ও, সি,-কে আসতে

হয়। অনিল দাস ও, সি,-কে দেখেও সরে যায় না। প্রোজেক্ট অফিসের বারান্দায় দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পরিপূর্ণ নির্বাক রেলা নিয়ে। আসলে রুদ্রকে সে উভয়ের ক্ষমতার ফারাকটা বোঝাতে চায়।

ছিয়াত্তরে ও, সি,-রাও খুব বলবান ছিল। কিন্তু সেসব স্থান-কাল-পাত্র বিশেষ। ও, সি,-র এমন ক্ষমতা হয় না যে, রুদ্রর আদেশানুযায়ী অনিল দাসকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। সে শুধু বলে, অনিলবাবু, একবার থানায় যাবেন সময়মত।

অনিল ভ্রূক্ষেপ করে না। ও, সি, চলে গেলে অনিল দাস সোজা ভিতরে চলে আসে, পকেট থেকে রিভলবার বের করে রুদ্রর চোখের সামনে নাচায়। আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম এর মধ্যে আমার চেক চাই।

রুদ্ধবাক রুদ্র গুম হয়ে বসে থাকে। অনিল দাস চলে যেতে জীপ নিয়ে সে সদরে চলে আসে। সরাসরি ডি, এমের কাছে যায় না। অন্য একজন সহকর্মীর ঘরে বসে থাকে বহুক্ষণ।

ডি, এমের ঘরে গেলে ডি, এম, বলে, আজ রাতটা সদরে থেকে যান। কাল আমার সঙ্গে দেখা করে তবে প্রোজেক্টে যাবেন।

পরদিন বেলা এগারটায় রুদ্র ডি, এমের কাছে আসে। ডি, এম, তাকে বিদ্যুৎবাণী নির্দেশ হাতে দেয়। কোলকাতা ভায়া জেলাসদর ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। বদলির চাকরীতে বদলি তো হবেই। না, তাকে আর প্রোজেক্টে ফিরে যেতে হবে না। এ্যাসিট্যাণ্ট প্রোজেক্ট অফিসারকে ডেকে পাঠোনো হয়েছে। তাকেই চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে।

এক সহকর্মীর বাড়িতে বসে রুদ্র সারাদিন মদ খায়। লাথি মেরে মেরে তার চেয়ার, টেবিল, রেডিও ভাঙে। তারপর হাউ হাউ করে কাঁদে। সরকার বড় সদাশয়, অপমানের নির্দিষ্ট সীমানা চব্বিশ ঘণ্টা প্রোজেক্টে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে ভোগ করতে হল না। রুদ্রপ্রতাপ এইভাবে প্রথম আপস করে। অথবা পোষ মানে। তাকে দেখতে হয় না প্রোজেক্ট অফিসের চত্বরে হা হা করে গ্রীষ্মের হাওয়া ছুটছে, তার মধ্যে সবুজ, লাল আবির উড়ছে, অনিল দাস যুগ যুগ জিও, ঠাট্টা করে হাসছে অনিল দাস জীপের গায়ে হেলান দিয়ে—হা-হা হা-হা-হা, ঝুঁকে পড়ে জীপের ভেতর থেকে বোতল তুলে নিয়ে গলায় ঢালছে, ঠোঙা ভর্তি আবির, হাঁড়ি ভর্তি রসগোল্লা, নিন, নিন, খান। সুপারভাইজার-বাবু, অ্যাসিসট্যাণ্ট প্রোজেক্ট অফিসার সসব্যস্তে বিল চেক করে চেক তৈরী করছে, চেকটা যেন বেয়ারার হয় মদনদুর্দে, সে কি? সাতলাখ টাকার চেক

বিয়ারার ! হ্যাঁ হ্যাঁ, যা বলছি করুন, হা-হা-হা—খান মদনবাবু, রসগোল্লা খান, স্পেশাল অর্ডারে মদনবাবু চেক সই করার ক্ষমতা পেয়েছে—চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি—জাতি এগিয়ে চলেছে—দপ্তরে কাজ ফেলে রাখবেন না, চব্বিশ ঘণ্টা সময় কম নয় !

সহকর্মী ফ্ল্যাটের বাইরে থেকে তালা মেরে গেছে। রুদ্র দরজার উপর লাথি মারে ! হাতের সামনে ভাঙার মত আর কিছু পায় না, বোতল ছুঁড়ে মারে দেয়ালে, তারপর হাসে প্রচণ্ড আর্তনাদে, হা-হা-হা-হা-হা। রুদ্র সেনের আপস করার বা পোষ মানার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই হাসিটাও তার অন্তর্গত। সে প্রক্রিয়ার। এ সময়ে মানুষ একা ঘরে এমন সব দুর্বলতা দেখিয়ে থাকে। সাক্ষী থাকে না।

দাহ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাঁটার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ফ্যালার পা দুটো টলে যায়, মাথায় বিড়ের উপর আটখানা রোদে-শুকনো ইঁট, প্রায় আধখানা পাহাড়, তার উপর পায়ের সামনে দিযে সরসর করে ভাঁটার ভেতর নেমে গেল একটা সাপ। নেহাৎ মেটে সাপ নয়, মাথায় খড়্গছাপ, গায়ে চক্কোর-বক্কোর, দেখে তার বুকের ভেতরটা কোলাব্যাঙের মত লাফায়, পায়ে এক বল্‌গা কাঁপন। ইঁট মাথায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ফের উপরে চলে আসে। যে লোকটা রোদ্দুরে পাতানো ইঁট তুলে গাদিতে সাজিয়ে রাখছিল, তাকে এসে বলে, সহদেবদা, সাপ।

সাপ? সহদেব যেমনকে ইঁট তুলছিল, তেমনই তুলতে থাকে, সাপ কুনখেনে?

উই যে, ভাঁটার ভেতর। দ্যাখলাম স্বচক্ষি।

উটা ঢ্যামনা হবে। যা তো, ভাঁটার ইঁট ক'খানা সাজায়ে ফ্যাল। তারপর উপাশে আরু শ'দুই ইঁট আছে, উটা না তুললি মালিক তরে রোজ দেবে না। সহদেব দ্রুত হাতে ইঁট সাজাতেই থাকে।

আরো শ'দুই ইঁট মানে কম করে পঁচিশ খেপ। ফ্যালার মাথা টনটন করে ওঠে। বেলা দুপুর, আকাশের খাঁজে খাঁজে মেঘ জমে থাকলেও ডা ডা করছে আষাঢ়ে রোদ্দুর। এত বড় ইঁটখোলা, অন্যদিন বাইশজন লেবার সারা দিনমান খাটুনি দ্যায়, আজ তারা মাত্র দু'জন। বাইশজনের আঠারোজন গেছে তাদের রোজায় প্রথমদিনের উপোস করতে। পরানদা গেছে মালিক গণনাথ মণ্ডলের বাড়ি, কি সব ফাইফরমাস আছে সেখানে। আর আঙুরদিব ব্যাপের বাড়াবাড়ি অসুখ, প্রায় চার পাঁচদিন কাজে আসছে না। ফলে ক'দিন ধরে যত ইঁট কাটা হয়েছে, তা ভাঁটায় সাজাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ফ্যালা

আর সহদেব। আষাঢ়ের আকাশে কখন মেঘের হাত-পা গজাবে তার ঠিক নেই, একবার বৃষ্টি নামলে জলদাগি হয়ে যাবে ইঁটগুলো। আর তাহলেই মালিকের মুখ-খারাপ শুনতে শুনতে জান নাকাল। লোকটার মুখ দিয়ে অষ্টক্ষণ ছুঁচো আর আরশুলো বেরুচ্ছে। কেউ কামাই করলে রোজ তো কাটা যাবেই, এক-আধঘণ্টা লেট করলেও অমনি রোজ থেকে কাটান্। মুখ ভেংচিয়ে বলেন, সব বাবু হয়েছে, বাবুদের ঘুম ভাংতে দেরি হয়। তা আমার কি, কম-কম কাজ, কম-কম মাইনে।

সাপের কথা শুনে সহদেবদা যে কান দেবে না তা ফ্যালা জানত। অমন সাপের লেজ ধরে বনবন করে ঘোরাতে পারে সহদেবদা। তাই ফ্যালার এখন দুদিকে গেরো, ভাঁটার ভেতরে সাপ, আবার ভাঁটার ইঁট না সাজালে রোজ কাটান। আঙুরদি থাকলে তাকে ঠিক বাঁচাতো। বলতো, তুই ভাঁটার মুখ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আয়, আমি ভাঁটার ভেতরপানে সাজিয়ে ফেলি। আর সহদেবদাকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলত, তুমি আর কচি বাচ্চাটাকে খাটিয়ে মেরো না তো বাপু, ও কি পারে? আমাকে বললেই হত। আঙুরদির কথা শুনলে ফ্যালার গা জুড়িয়ে যায়। এই হাজারো ঝড়ঝাপটা থেকে ওকে সব সময় আগলে আগলে রাখে, কুটোটি গায়ে লাগতে দ্যায় না। আজ আঙুরদি নেই বলেই তার এই বিপত্তি। মুখটা কালো করে সে ফের ইঁট মাথায় ফিরে যায় ভাঁটার মধ্যে।

ইঁট ভাঁটায় যে ঝুপড়িটার খাটিয়াতে বসে সারাদিন গণনাথবাবু খবরদারি করেন, সেটাই ফ্যালা আর সহদেবের রাতের অস্তানা। রাত নেমে এলে এই সারা ইঁটখোলা সুনসান, কাঠের উনুনে ফুঁ দিতে দিতে চোখ লাল হয়ে যায় ফ্যালার। উনুন জ্বলে উঠলে হাঁড়িতে চাল আর ক'টা আলু ফেলে দ্যায় সহদেব। রাত একটু বেড়ে গেলে দুটো শানকির থালায় ভাত বেড়ে নেয় ওরা। ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে শুনতে আলুভাতের সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজের সোয়াদ আস্তে আস্তে চারিয়ে যায় ভেতরে।

কোন-কোনদিন রাতে খাওয়ার পর সহদেব আড়-বাঁশিতে সুর তোলে, ভাটিয়ালি সুর তার বাঁশিতে দারুণ খোলে। চারপাশের ঝিঁঝিঁর ডাক চাপা পড়ে যায়। ফাঁকা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে বয়ে যায় হাওয়া, তার সঙ্গে মিশে যায় বাঁশির সুর। শুনতে শুনতে ফ্যালার মগজে নেমে আসে গভীর ঘুম। কত রাত পর্যন্ত সহদেবদা বাঁশি বাজায় কে জানে। পরদিন আঙুরদি এসে মুখ ঝামটা দ্যায়, কি মানুষ গো তুমি, অত রেতে বাঁশি বাজাতে

লাগলে কি বেছনায় ঘুম আসে, না ঘুমুনো যায়। তারপর একটু থেমে বলে, ছেলের মায়েরা রেতে আড়বাঁশি শুনলে আর ভাত খেতি পারে না, তা জানো?

এসব সহদেব জানে না, সে শুধু জানে, তার বাঁশির সুর নিশুতি মাঠ পেরিয়ে শোভনপুর গাঁ-তক পৌঁছয়, যেখানে আঙুর তার বাপের বাড়িতে থাকে। সে আঙুরের দিকে তাকিয়ে হাসে, তার তাকানো আর হাসির ধরণ দেখে আঙুর আবার মুখ ঝামটায়, আ মরণ, হাসি যে আর থামে না।

২·

ইঁট ভাঁটায় যখন বাইশজন লেবার একসঙ্গে কাজ করে, তখন গমগম করতে থাকে সারা তল্লাট। হৈ-হৈ করে মাটির তাল দলাইমলাই করে একদল, অন্য ক'জন দু'হাত বেলচার মত করে খামচে নিয়ে আসে মাপ-করা মাটি, ফ্রেমের মধ্যে ফেলে কাঁকুই দিয়ে কেঁকে তুলে নেয় বাড়তি মাটিটুকু, তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ফ্রেম উল্টে দিতেই সার সার শুয়ে পড়ে কাঁচা থলথলে ইঁট। তাতে খোদাই করা জি, এম। মালিক গণনাথ মণ্ডলের নাম ওটা। সারাদিন মেসিনের মত ধপাধপ শব্দ, আর সারা ইঁটখোলা জুড়ে এরকম অসংখ্য জি. এম চোখ উল্টে পড়ে থাকে।

ধপাধপ শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝরে পড়ে গণনাথবাবুর মুখ-খারাপ। ঝুপড়ির খাটিয়ায় বসে সারাক্ষণ বাজখাঁই গলার আওয়াজ ওঠে, 'কাসেম আলি, তোমার লোকজনদের গায়ে যে বাত ধরে গেল, অত জিরেন নিলে কি চলে?' 'রমজান, এ্যাই রমজান, মাথায় চারখান করে ইঁট নিচ্ছিস যে বড়। আর্দ্ধেক ইঁট নিলে আর্দ্ধেক রোজ কিন্তু।' 'সহদেব, তুই আর রগড়ের কথা বলে ইঁট ভাঁটার পচন ধরাস নে। এমনিতেই কাজ করতে গেলে সব বাঘ দ্যাখে।' 'ওরে সোফিয়া, আর হাসিস নে, মাথা থেকে ইঁটগুলো পড়লে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

মাঝে মাঝে দফাদারদের চোখ এড়িয়ে ফ্যালা ইঁট গড়তে চেষ্টা করে। মাথায় ইঁট বওয়ার চেয়ে গড়ার কাজ ঢের সহজ, কিন্তু কোত্থেকে হাঁ হাঁ করে ওঠেন গণনাথবাবু। এ্যাই, ছ্যামড়া, রাখ রাখ, তুই পারবি নে। নষ্ট করে ফেলবি। ইঁট বওয়া ছেড়ে এখন ইঁট গড়তে লেগেছে। হুঁ্যাঃ।

ফ্যালা তাড়াতাড়ি গিয়ে আঙুরদির কাছে লুকোয়। আঙুরদি বলে, হবে, হবে, আরেকটু বড় হ'। তখুন পারবি। এখুনো তো কচি আছিস। গাল টিপলে দুধ বেরোয় যে। বলে নিজের নরম শরীরে ফ্যালার মুখটা টেনে নেয়। একটা ভালো লাগা আবেগে, তৃপ্তিতে ফ্যালার চোখ বুজে আসে।

রোজার দিনগুলোতে ইঁট ভাঁটার কাজের একটু খামতি চলে, একটু বেশি হাসি-তামাশা, একটু রগড়। প্রায় একমাস রোজা, সারাদিন উপোসের পর সন্ধ্যায় চিনির সরবত খেয়ে তারা উপোস ভাঙে। ফলে কাজেও একটু ঢিলে-ঢালা। সোফিয়া, রাবেয়া, মোমেনা গা ঢলাঢলি করে বলে, আঙুর এবার নিকা করবে।

মুখ ঝামটা দ্যায় বটে আঙুর, কিন্তু তার মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

মহসীন নামের ছেলেটা প্রায় ফ্যালার বয়সী, সে এইসব কানাকানি শুনতে শুনতে একদিন ফ্যালাকে বলে, জানিস্ তো, সহদেবদার সঙ্গে আঙুরের আস্নাই হয়েছে।

আস্নাই ব্যাপারটা ফ্যালার মগজে ঢোকে না, তবে যতটা রগড়ের সঙ্গে মহসীন কথাটা বলল, ততটা রগড়ের মনে হয় না তার। কোথায় একটা মন-খারাপ করার গন্ধ আছে। আঙুরদি বিধবা, দু'বছর আগে তার স্বামী এই ইঁট ভাঁটার কাজ করত, হঠাৎ তার গা হাত পা ফুলতে শুরু করে, আর তার ক'দিনের মধ্যে মারা যায়। তখন আঙুরদির কাঁচা বয়স, কত আর হবে, সতের আঠারো। সেই থেকে বাপের বাড়িতে থাকে আঙুরদি। মালিক গণনাথ-বাবুকে এসে ধরতে ইঁট ভাঁটায় বহাল হয়ে যায় একদিন। সেই থেকে ফ্যালার একটুখানি সুদিন। আঙুরদি বড্ডো ভালোবাসে তাকে।

কথাটা শোনা ইস্তক সারাক্ষণ এলোমেলো ভাবনা তাকে আনমনা করে, কখনো অন্যমনস্ক হয়ে যায় মাথায় ইঁট তুলতে। পিছনে তখন আলম কিংবা রমজান দাঁড়িয়ে। ফ্যালাকে থামতে দেখে তাড়া লাগায়, কি রে ফ্যালা, ধ্যান করতিছিস নিকি? ধ্যান করলি রোজ কাটান যাবে যে।

ফ্যালা আবার মাথায় ইঁট তুলতে থাকে। মাথায় পাহাড়ের বোঝা তুলে নিয়ে সাজাতে থাকে ইঁট ভাঁটায়। এক-একটা ইঁট ভাঁটা ভরে তুলতে হিমসিম খেতে হয়। একটা শেষ হলে আবার আর একটা, সেটা শেষ হলে ফের আরেকটা। একটা করে ভাঁটা সাজানো হলে তাতে হৈ-হৈ করে আগুন লাগানো হয়।

এর মাঝে ফ্যালা লক্ষ্য করে, সহদেবদা আর আঙুরদির মাঝখানে একটা অদৃশ্য তরঙ্গ যাতায়াত করছে, একজন আরেকজনের দিকে কেমন অন্যভাবে তাকায়, আঙুরদি হঠাৎ ফিক করে হেসে ওঠে, অকারণে হা হা করে হাসতে থাকে সহদেবদা। কখনো দুজনে কাজের ফাঁকে খুনসুটি করতে থাকে, আর গভীররাত পর্যন্ত সহদেবদা আড় বাঁশিতে চমৎকার সুর তুলে ছড়িয়ে দ্যায়

বহুদূরে, হয়ত শোভনপুরের দিকেই।

ঝুপড়ির মধ্যে একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফ্যালা ছটফট করে। টনটন করতে থাকে তার ঘাড়, হাত-পা। হঠাৎ এক-একদিন অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম আসে না। সাতকুলে কেউ নেই ফ্যালার। কবে একদিন সে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছিল গণনাথবাবুর এই ইঁট ভাঁটায়। সারাদিন ইঁট বওয়ার বিনিময়ে তার দু'বেলা দুটো খাওয়া, আর এই ঝুপড়ির বিছানায় রাতের ঠেক। তবু এইটুকু যোগাড় করতেই ফ্যালার শরীর খানখান।

সেদিন বিকেলে বেলা থাকতে ইঁট ভাঁটায় ছুটি। মালিক গণনাথ-বাবুর ছেলে হয়েছে, তাই মিষ্টি খাবার নেমন্তন্ন। সহদেব আর ফ্যালা ছাড়া সবাই একে-একে ভাঁটার কাজ ছেড়ে চলে গেছে বিকেল হতে-না-হতে। আঙুরদি গেল সবার শেষে। একটু পরে সহদেব বলল, বাকি ইঁট ক'খান সাজায়ে রাখতো ফ্যালা, আমি পুকুরঘাট থিকে হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।

ইঁট ভাঁটা থেকে ক'রশি দূরে বিশাল পুকুর, নারকেল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটা, পুকুরের চারপাশে ঝোপঝাড় থাকায় বেশ নির্জন আর শান্ত। সহদেবদা চলে যেতে সে দ্রুত হাতে ইঁট সাজিয়ে ফ্যালে। একটু পরে সেও সহদেবদার সঙ্গে মালিকের বাড়ি মিষ্টি-মুখ করতে যাবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, সহদেবদা না ফিরতে ফ্যালা একটু ভাবনায় পড়ে। হাত-মুখ ধুতে তো এত দেরি হবার নয়। পায়ে পায়ে ঘাটের দিকে এগোয় সে। বিশাল শিরীষ গাছটার দিকে নজর পড়ে, অন্ধকার হিম হয়ে বসছে তার ডালপালায়। আকাশে একটা মাত্তর তারা জ্বলজ্বল করছে। সহদেবদা তাকে বলে, ওটা সন্ধেতারা। তারাটার দিকে নজর রেখে সে হাঁটছিল, হঠাৎ শিরীষগাছের নিচে চোখ পড়তে সে চমকে ওঠে। অন্ধকারে চোখদুটো আরেকটু সেঁধিয়ে দিতে সে আরো হিম হয়ে যায়। শুয়ে আছে সহদেবদা আর আঙুরদি। ঠিক সাপের যেমন শংখ লাগে। তেমনিভাবে জড়িয়ে আছে দুজন দুজনকে। ভয়ে, আতঙ্কে জিব শুকিয়ে আসে ফ্যালার। সে নিঃশব্দে দৌড় লাগায় তাদের ঝুপড়ির দিকে, দাওয়ায় বসে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে হাঁপাতে থাকে।

কতক্ষণ পরে জানে না, সহদেবদা বলল, চল্ রে ফ্যালা, মালিকের বাড়ি মিষ্টি খেয়ে আসি।

ফ্যালা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে, সহদেবদার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। এদিক-ওদিক তাকিয়েও দেখতে পায় না আঙুরদিকে। একটু আগের

দেখা দৃশ্যটা ওর চোখমুখ শরীর উষ্ণ করে তুলছিল। ঘাড় নেড়ে বলল, সে যাবে না।

সহদেব তেমন গা করে না, কেন রে, যাবি নে কেন, শরীর খারাপ নাকি ?

৩

কয়েকদিন পরে এক সকালে উঠে ফ্যালা আবিষ্কার করে, বিছানায় সহদেবদা নেই। অথচ এমন তো হয় না, রোজ ভোর থাকতে সহদেব তাকে ডেকে তোলে, এ্যাই ফ্যালা, ওঠ্, রোদ যে চনমন করে উঠল।

আর আজ চারপাশে রোদ সত্যিই চনমন করে উঠেছে। বেলা একটু বাড়লে বুঝতে পারে, তাকে না বলে কোথাও গেছে সহদেবদা, হয়ত মালিকের বাড়ি, কোন ফাইফরমাস আছে।

বেলা আরো বাড়লে ক্রমে এসে পড়ে বাকি লেবারেরা, ধপাধপ শব্দ শুরু হয়ে যায়, কিন্তু সহদেবদার দেখা নেই। সেদিন আঙুরদিও কাজে আসে নি। চারপাশে একটা ফিসফিসানি, ওরা পেলিয়ে গেছে।

ফ্যালার বুক ছাঁত করে ওঠে, কারা পেলিয়ে গেছে ?

কারা আবার ? মহসীন খিকখিক করে ওঠে, তোর স্যাঙাত আর স্যাঙাতনী।

শুনে ফ্যালা হাঁ হয়ে যায়, সেদিন পুকুরঘাটে দেখা দৃশ্যটা চলকে ওঠে মনের মধ্যে, সিরসির করে ওঠে তা সারা শরীর, পরক্ষণেই বুকের ভেতরটায় একগলা আকাশ। তাহলে সে একা-একা ইঁট ভাঁটায় থাকবে কি করে ?

মালিক গণনাথবাবুর চিৎকার কানে যায়, এ্যাই ফ্যালা, ইঁট মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়। যা, যা, দাঁড়িয়ে থাকলে রোজ কাটান যাবে যে।

ফ্যালা আবার রোদ-শুকনো ইঁট মাথায় নিয়ে হাঁটে। কিন্তু তার মাথা থেকে ভাবনা ছাড়ে না, রাতের বেলা কি খাবে তাহলে। সে ফুঁ দিয়ে উনুনে আগুন জবালাতে পারে, কিন্তু হাঁড়িতে চাল ছড়িয়ে দিলে কখন ফুট-আসে তা তো জানে না। আর না খাওয়া হলে পরদিন সকালে তো আঙুরদি এসে বলবে না, এই যে ফ্যালা রুটি আর পাটালি। কাল রেতে তো খাসনি কিছু।

ফ্যালার চোখ ফেটে প্রায় জল আসে। মালিক গণনাথবাবুর কানে কথাটা যেতেই খেঁকিয়ে ওঠেন। কেন যেমন থাকতিস তেমনি থাকবি। এ্যাদ্দিন থাকলি; দুটো চাল-ডাল ফুটিয়ে নিতে শিখিস নি ? আর ব্যাটা সহদেবেরও আক্কেল তেমনি, আমাকে যাবার সময়ে ডুবিয়ে দে গেলো ! নেমকহারাম, নেমকহারাম।

তাহলে পরাণ থাকুক। গণনাথবাবু কোন উপায় না দেখে শেষমেশ বললেন।

পরাণের ঘরে বৌ-বাচ্চা আছে, তবু সে নিমরাজী হয়ে গেল। কিন্তু ফ্যালার কোন সুরাহা হল না। নেহাৎ ভালোমানুষ পরাণ যে সন্ধের পর আর মানুষ থাকে না, সেটা ক'দিনেই বুঝে গেল ফ্যালা। সন্ধের পর ইঁট ভাঁটা সুনসান হয়ে যেতে সে ভাঁড় উপুড় করে ঢালতে থাকে তার গলায়, তারপর কখনো হি হি করে হাসে, কখনো বুঁদ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে বিছানায়। কখনো সন্ধেবেলা বলে, আমি বাড়ি যেতিছি ফ্যালা, ভোর-ভোর ফিরে আসব। খবর্দার, মালিককে যেন বলিস নি।

ফ্যালার আর উনুন জ্বালানো হয় না, ভাত রাঁধা হয় না। রাতের পর রাত উপোস চলতে থাকে। কখনো পরাণদা বলে, নতুন রাস্তার মোড়ে কাশীর দোকান থিকে পাঁউরুটি কিনে এনে রাখবি। খিদে পেলেই খেয়ে নিবি।

সেই একা, নিঃসঙ্গ, রাত্রিগুলো ফ্যালার বড় দীর্ঘ মনে হয়, প্রায়ই ঘুম আসে না তার চোখে। চারপাশে একটানা ঝিঁ ঝিঁর শব্দে, তার সঙ্গে ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া শোঁ শোঁ আওয়াজ মিশে এক অদ্ভুত ছমছমে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ফ্যালার গা শিরশির করতে থাকে, তার মনে হয় একটু পরেই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

সহদেবদার উপর খুব রাগ হয়ে যায় তার, ক্ষোভ জমে ওঠে আঙুরদির উপরও। তাকে এই সুনসান মাঠের মধ্যে ফেলে দুজনে কি নিষ্ঠুরের মত পালিয়ে গেল হঠাৎ। একবারও ফ্যালার কথা ভাবল না। ফ্যালা যে কিভাবে এই গা-ছমছমে ঝুপড়ির ভেতর রাত কাটাবে তা একটুও চিন্তা করল না। ফ্যালাকেও তো ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত।

ক'দিন দু-এক পশলা করে বৃষ্টি হয়ে যেতে গণনাথবাবু একেবারে তেরিয়া হয়ে উঠলেন সবার উপর, হাত লাগা। হাত লাগা। সব ইঁটগুলো যে জলদাগি হয়ে গেল। এবারে ডাহা লোসকান।

রসিদ আমিন অনেকদিনের দফাদার, বলল, রোজার সময় যে সবাই দুবলা থাকে, বাবু। হাত তো একটু কম চলবেই। রোজা পেরুলেই সব ক'টা ভাঁটায় আগুন লাগিয়ে দেব।

পাঁচ-পাঁচখানা ভাঁটা, তা হাঁ খুব কম নয়? সবাই মিলে চেষ্টা করেও তিনখানা ভাটা প্রায় ভরো-ভরো হয়ে উঠল। আরো দু'খানায় ভরতে অন্তত পাঁচ-সাতদিন। সারা ইঁট ভাঁটায় রাশি রাশি ইঁট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

বাইশখানা হাতেও সামাল দেয়া যাচ্ছে না অতবড় ভাঁটা। সবাই মিলে গাছিতে সাজিয়ে ফেলতে থাকে ইঁটের পাহাড়। কাসেম মোল্লা মালিককে বলল, রোজাটা সেরে আসি মালিক। একমাস ধরে উপোসে আছে সবাই, হাত আর চলতিছে না।

রোজার দিন আবার সুনসান হয়ে যায় ইঁট ভাঁটা। টানা রোদ্দুর চলছে ক'দিন ধরে, তবু গণনাথবাবুর মুখের বিরাম নেই, ওরা নেই তাতে কি হয়েছে। পরাণ, তুই ফ্যালাকে নিয়ে ভাঁটার ভেতর ইঁটগুলোন সাজাতি লাগ্। সারাদিনে চার-পাঁচশ ইঁট সাজিয়ে ফেললেও কম কি। তোদের রোজ তাহলে কাটান যায় না।

পরাণ আর ফ্যালা মালিকের হুকুমমত ইঁট সাজায়, যত না পরাণ বইল, তার চে ফ্যালা ঢের বেশি। বইতে বইতে প্রায় সন্ধে। গণনাথবাবু ঘরে ফিরে যাওয়ার পর হঠাৎ কোত্থেকে মেঘের ঝিলিক। ফ্যালা আর পরাণ তখন ঝুপড়িতে এসে একটু জিরোচ্ছে। ঝিলিক দেখে বাইরে বেরোয়, দ্যাখে, আকাশে মেঘ পাথার হয়ে জমে আছে। বিজলীর চমক ফালাফালা করে দিচ্ছে ইঁট ভাঁটার শরীর। পরাণ বলল, ভন্না নামবে, ফ্যালা। তেরপল্ বার কর। নইলে সব ইঁট জলদাগি হয়ে যাবে।

বলতে বলতে ছপ্পর ফুঁড়ে বৃষ্টি। একেবারে মুষলধারে। ত্রিপল বার করে গাছি দিয়ে সাজানো ইঁট ভিজে একশা। যেমনি ইঁটগুলো, তেমনি ফ্যালা আর পরাণ। কাল গণনাথবাবু এসে এই ভিজে ইঁট দেখলে কি করবেন কে জানে। ভয়ে, হিম হাওয়ায় ফ্যালার সমস্ত শরীর জুড়ে শীত নামল। সারারতে গায়ে চট জড়িয়েও তার শীত কমে না। ওদিকে পরাণদা ভাঁড় উপুড় করে ঢকঢক করে গলা ভিজোচ্ছে তার শীত কমাতে। কিছুক্ষণ পরে সে আর মানুষ থাকল না।

গণনাথবাবু পরদিন ইঁট ভাঁটায় এসে দুজনকে এই মারে তো সেই মারে। তিনদিনের রোজ তো কাটান গেলই, আরো তিনদিনের রোজ কেটে নেবেন বলে শাসালেন।

ফ্যালা এসব কিছুই জানতে পারল না, সে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে ঝুপড়ির তক্তপোষে। দিনের কাজের পর সন্ধের ঝোঁকে পরাণ যে কোথায় উধাও হয়ে যায় তা কে জানে। মাঝে মাঝে লাল চোখ মেলে ফ্যালা রাতের বেলা চারপাশে কিছু যেন খোঁজে, কিন্তু না পেয়ে আবার চোখ বুজোয়। দিনের বেলা আবার ধপাধপ শব্দ শোনে। দু তিনদিন তার খাবার জন্য একটা

পাঁউরুটিও জোটেনি !

ক'দিন পরে জ্বর কমতে সে উঠে বসতে যায়, কিন্তু বুঝতে পারে ভীষণ দুবলা হয়ে গেছে তার পা-দুটো। ঠকঠক করে কাঁপছে শরীর। রোজা সেরে এসে লেবাররা পুরোদমে কাজ শুরু করেছে, আস্তে আস্তে ভরে উঠছে ভাঁটার মুখ। ফ্যালাকে টলমল পায়ে ইঁট ভাঁটায় দেখে গণনাথবাবু খেঁকিয়ে ওঠেন, এই যে, রাজপুত্তুরের জ্বর থামলো। তা নে, কাজে হাত লাগা। কাজ না করলি খাবি কি ?

মাথায় ইঁট তুলতে গিয়ে ফ্যালা দেখল, তার চারপাশে অন্ধকার। এক-দুই করে চারখানা ইঁট মাথায় তুলে এলোমেলো পায়ে ভাঁটায় গিয়ে ইঁট সাজাতে থাকে। ভাঁটার এখন গলা অব্দি ইঁট, তবু ভাঁটার হাঁ-খানা এত বড় যে তার খিদে মেটে না। সমস্ত লেবাররা যন্ত্রের মত সেই খিদে মেটাবার জন্য প্রাণপণে খাটতে থাকে। কখন আবার বৃষ্টি নেমে পড়ে তার ঠিক কি। ফ্যালার পেছনে দাঁড়িয়ে কে একজন বলল, আটখানা ইঁট তোল, ফ্যালা। নইলে মালিক লিখে রাখছে। তোর রোজ আদ্ধেক হয়ে যাবে।

আটখানা ইঁট মাথায় তুলে ফ্যালার মনে হল, সে আর ভাঁটা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে না। দ্যাখে, সামনে বিশাল মাঠ হেঁটে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, পথ আর ফুরুচ্ছেই না। এক-পা, এক-পা করে কতক্ষণ সে হেঁটে যায়। তারপর সে হঠাৎ মাথায় আটখানা ইঁট সমেত হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

ফ্যালার পেছনেই ছিল মহসীন, মাথায় ইঁট নিয়ে সে তুলতে গেল ফ্যালাকে। কিন্তু পারে না। ফ্যালার শরীর কেমন নিষ্পন্দ, নিথর হয়ে গেছে। সে চেঁচিয়ে ডাকল, রমজানদা, দেখে যাও, ফ্যালাটা নড়ছে না।

সবাই এসে ঝুঁকে পড়ল ফ্যালার উপর, ফ্যালা তখন চোখ বুঁজিয়ে, শ্বাসটাও পড়ছে না। কাসেম মোল্লা বলল, ফ্যালা মরে গেছে রে।

গণনাথবাবু শুনে তো গজগজ করতে লাগলেন, কি অলক্ষুণে ছেলে রে বাবা। কাল ভাঁটায় আগুন লাগানো হবে, আর অমনি অমনি ব্যাটাছেলে মরে গেল। মরবার আর জায়গাও পেলি নে, একেবারে ভাঁটার মুখে। বেলাশেষে এ কি বিটকেল কাণ্ড।

বাকি সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করে, ফ্যালাটা আবার হিঁদু। ওকে তো আবার শ্মশানে পোড়াতে হবে। পরাণটাও আবার সকাল থেকে ভাঁটায় নেই। এখন কে নিয়ে যাবে ওকে।

গণনাথবাবু বিড়বিড় করতে থাকেন, এ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড রে, বাপু।

পুলিশে-টুলিশে খবর পেলে আবার কি হাঙ্গামা হবে কে জানে? এখন এই উৎপাত নিয়ে কি করি আমি।

এমন একটি অস্বাভাবিক ঘটনায় ভাঁটার কাজ বন্ধ, সবাই এককোণে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। ভাঁটার ইঁট সাজানো প্রায় শেষ। লেপা-পোঁছা করে এখন আগুন লাগালেই হয়, কিন্তু ফ্যালার সমস্যার সমাধানে না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজই করা যাচ্ছে না।

শেষে জট ছাড়ালেন গণনাথবাবুই, এক কাজ করা যাক! দাহ যখন করতেই হবে তখন ভাঁটার ভেতর ওকে শুইয়ে দিই। তারপর তোরা আগুন লাগিয়ে দে।

বলে নিজেই ফ্যালার একটা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ভাঁটার উপরে। দু-চারটে ইঁট সরিয়ে ফ্যালার দেহটা রাখেন, তারপর দ্রুত হাতে ইঁট চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, এবার লেপা-পোঁছা কর ফ্যাল্। তারপর আগুন লাগা, দাহটা হয়ে যাক্।

বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর!

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

— আপনার বয়স ?

—উনিশশো চল্লিশে জন্মেছি।

—চাকরীতে কবে ঢুকেছিলেন ?

—যে বছর চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হ'ল।

—কি পোস্টে কাজ করছেন ?

—ইউ. ডি. সি। আমাকে বড়বাবু বলে।

—দেশ কোথায় ?

—খণ্ডঘোষের কাছে, কেওটা গ্রাম।

—তা আপনি ঐ খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে অন্ধকারে নদীর পাড়ে গেলেন কেন ?

থানার বড়বাবুর চোখ টর্চলাইটের ফোকাস মেরে আছে। মেজবাবু, জমাদার, পিওন সবাই ঘিরে আছে। বড়বাবু টেবিলের উপর রাখা পেপার ওয়েটে হাত বুলোচ্ছেন, সেই হাতের দু আঙুলে চাপা সিগারেট ছোট হয়ে এসেছে। দেয়ালে জেলার ম্যাপ। ম্যাপে নীল রং-এ দামোদর নদী।

(আমি চাষীর ছেলে। জাতে মাহিষ্য। বংশে আমিই প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করি। তাইতে আমার বাবা হরিসংকীর্তন বসিয়েছিলেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারী বর্দ্ধমান সদর থেকে এসেছিলেন ঐ হরিসংকীর্তনে। যাবার সময় আমার পিঠে হাত রাখলেন, তারপর একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে মেমারীর এম. এল এ-এর কাছে যাই। আগেকার দিনের এম. এল. এ-রা আজকালকার মত ছিলনা। অতো ঘোরায়নি। চাকরীটা হয়ে গেল।)

—কি করেন ? কোন ইউনিয়ন ? ফেভারেশন না কো-অর্ডিনেশন ?

—এ্যাঁ ?

—কোন্ ইউনিয়ন করেন ?

—ঐতো, মাধব যশ মাসে দু'টাকা করে চাঁদা নেয়, ইউনিয়নের চাঁদা।

—কোন ইউনিয়ন সেটা, ফেডারেশন না কো-অর্ডিনেশন ?

—সেটাতো ঠিক......মানে খোঁজ করিনি স্যার......

(আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। অফিসে কোন পার্টি মিষ্টি খাবার টাকা দিতে চাইলে আমি নিজে কখনো নিইনা, পিওন জগবন্ধুকে দেখিয়ে দিই। জগবন্ধু প্রতি হপ্তায় আমাকে যা দেয়, আমি তাতেই খুশী। আমার অত লোভ নেই। পালবাবু, জানা বাবুদের মত পিওনদের সঙ্গে খিটিমিটি করি না। কাজের ব্যাপারেও আমার কোন ইয়ে নেই। সাহেব যা করতে বলে করে দিই। তক্কো করিনা।)

—আপনার অফিস থেকে দামোদরের পাড় কতদূর ?

- দু-তিন কিলোমিটার হবে।

—কিসে গেলেন ?

—রিক্সায়।

—বে-থা করেছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

- বাচ্চাকাচ্চা ?

—চারটি।

—পরিবার কোথায় ?

—দেশে।

চারটে বাচ্চা ? বাচ্চাগুলো আপনার তো ? হে-হেঁ। তা আপনি খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে ধিঃ ধান্ধায় ঐ অন্ধকারে দামোদরের ধারে গেলেন ?

—ক'দিন হ'ল জয়েন করেছে মেয়েটা ?

—তা বছরটাক হবে।

(সাইকেল রিক্সাটা অফিসের সামনে গাছতলায় দাঁড়ালো। একটা রোগা মত মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—এটাই কি বি ডি ও অফিস ?

আমি বল্লুম—হ্যাঁ।

তারপরই মেয়েটা গাছটার দিকে তাকিয়ে বল্ল—এটা বুঝি কৃষ্ণচূড়া গাছ ? আমি বল্লুম তেঁতুল। তারপর একটা ছেলে মেয়েটাকে ধরে রিক্সা থেকে নামালো। তখনই আমি দেখলুম মেয়েটা খোঁড়া। ছেলেটা ব্যাগ থেকে অশোক-স্তম্ভের ছাপ মারা একটা খাকী খাম বের করল। বল্ল—জয়েন করতে এসেছে।

—কে ?

—এই যে, এ। আমি এর দাদা।)

—মেয়েটার নাম বলুন।

—পূরবী। পূরবী দত্ত।

—বয়স ?

—সার্ভিস বুক না দেখে .....

—আন্দাজে বলতে পারেন না একটা যুবতী মেয়েছেলের বয়স ?

—না-না-না, যুবতী নয় স্যার, মানে বয়স অনুযায়ী যুবতী বলতে পারেন কিন্তু ঠিক যুবতী নয় স্যার। মানে রোগা, খোঁড়া......

—আপনিতো মহা ঘোড়েল লোক মশাই, যুবতী কিন্তু যুবতী নয়......এবার বলুন মেয়েটাকে কিভাবে রেপ করা হয়েছিল, বেশ ভালোভাবে ডিটেল্‌স্‌ এ বলবেন।

—ঠিক বলতে পারব না স্যার। আমাকে আগে ওরা মাথায় মারে। জ্ঞান হবার পর দেখি আমি দামোদরের বালির চড়ায় শুয়ে আছি। আমি ওনার নাম ধরে ডাকলাম। কেউ নেই স্যার, শুধু ক্র্যাচটা পড়ে আছে।

—এবার বলুন আপনি কি ধান্ধায় ঐ সন্ধ্যেবেলা অফিসের মেয়েটাকে নিয়ে দামোদরের পাড়ে গিয়েছিলেন।

—মেয়েটা দামোদর দেখতে চাইছিল স্যার, সেই জয়েন করার পর থেকেই। আমাদের অফিসে স্যার, একটা ম্যাপ, আপনাদের মতই, আমাদের দেয়ালে ঝোলানো থাকে! ওখানে স্যার, নীল রং এ দামোদর নদী আছে। মেয়েটা স্যার ম্যাপে দামোদরের নাম দেখেই কেমন যেন—বিশ্বাস করুন,—কি বলব, বর্ষার ঝলসে মাছের মত, কি বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল - বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তো দামোদর পার হয়ে .....

—পুরোন কথা ছাড়ুন। আজকের কথা বলুন।

—সেই কথাই তো বলছি স্যার, মেয়েটাতো কেবল দামোদর যাব দামোদর যাব প্যাচাল পাড়তো, আমি বলতাম কি হবে ওখানে গিয়ে—ও বলতো না যবো, একদিন নিয়ে চলুন না। তা আজ আমি স্যার, ছুটিতে ছিলাম। কারণ আজ সকালে বর্দ্ধমানে যেতে হয়েছিল। আমার জমিতে স্যার, বর্গা রেকর্ডিং হয়ে গেছে। বর্দ্ধমানে সেট্‌লমেণ্টের এক সাহেবের বাড়ী দুটো মুর্গী আর মিহিদানা নিয়ে যেতে হয়েছিল স্যার, আমার সম্বন্ধী নিয়ে গিয়েছিল। ফিরলাম বিকেলে। চায়ের দোকানে বসে জল-দুধ খাচ্ছিলাম, চা খাইনা।

তখন ক্র্যাচে ভর দিয়ে মেয়েটা যাচ্ছিল স্যার, আমাকে দেখে ফেল্লে। বল্ল—এইযে আপনি। আজ চলুন, নিষেধ শুনবনা। আমি বুঝলাম –দামোদর যাবার বায়নাক্কা। মেয়েটা বল্ল—কতদিন বাদে রোদ উঠেচে। আমি বল্লুম—রোদ উঠেছে ভালকথা। ধানে কীটপোকা লাগবে না।

উনি বল্লেন—সেদিন আসবার সময় ট্রেনে দেখেছি দামোদর পাড়ে কতো কাশফুল, আর সেই ছোটবেলায় পথের পাঁচালীতে দেখেছিলাম। চলুন না দাদা, রিক্সা করে দামোদর পাড়ে যাই। আমি বল্লুম—কাল একগোছা নিয়ে আসব খনে। কাশফুলের ডাঁটি দিয়ে বেশ ভাল ঝ্যাটা হয়।

উনি বল্লেন—আপনার দাদা খালি গেরস্থালীর চিন্তা। চলুন না, রোদ্দুরটা কমলা রং-এর হয়ে যাচ্ছে, কাশফুলগুলোর রংটাও আস্তে আস্তে পাল্টে যাবে না! দেখব। আমার যদি পা ভাল থাকতো, আপনাকে বলতাম না। একাই চলে যেতাম—ছুটে চলে যেতাম। তাই রিক্সা করলাম।

— তখন বিকেল কটা ?

—সাড়ে চার পাঁচ হবে।

—তারপর রাত্তির পর্য্যন্ত কাশফুল দেখালেন।

একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছেন বড়বাবু। দেয়ালে জেলার ম্যাপ। পাশে একটা মা কালীর ক্যালেণ্ডারও আছে। তাতে জবাফুলের মালা পরানো। থানার মধ্যেও মা কালী? মা কালী সর্বত্র। টেপে হিন্দি গান বাজছে। পুলিশ শুনছে। এটাও সর্বত্র।

– সর্বত্র রেপ হচ্ছে বুঝলেন, সর্বত্র। আপনার ওখানে ঐ মহিলাকে নিয়ে যাওয়াই উচিৎ হয়নি বুঝলেন।

(ঠাকুর্মার নাকি বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে! এখন যিনি আমাদের গুরুদেব, তাঁর বাবা শ্রীশ্রীষড়ানন গোস্বামী গুরুপ্রসাদী করেছিলেন ঠাকুর্মাকে। সেট কি রেপ্ ছিল ? সবাই তো তাতে সায় দিয়েছিল। ঢাকঢোল বেজেছিল! বর্দ্ধমান ষ্টেশনে এক ভিখারিণী, ডি. এ. বৃদ্ধির আলাপে ব্যস্ত দুজন ভদ্রলোককে ভিক্ষার জন্য বিরক্ত করছিল। একজন ভদ্রলোক বল্ল—ভিক্ষেতো করছ, ছানাপোনা হওয়া কমাতে পারোনা ?

ভিখারী মা বলেছিল—ছানাপোনা কি এমনিতে হয় বাবু, পুলিশের লোকেরা কিছু না পেলে পেলাটফরমে থাকতে দিবে কেনে ? —লোক দুটো হাসলো। আমিও হাসলাম। মানে কি নায্য কথা ভাবলাম ? হক্ কথা ভাবলাম ? এখানকার বাসন্তী সিনেমা হল – এ একটা সিনেমা চলছে। ডেস্প্যাচে যে

ছেলেটা বসে সে নাকি তিনবার দেখেছে। সেখানে নাকি পাঁচবার রেপ্ আছে। ছেলেটা অফিসের চৌকিদারকে ঐ পাঁচটা রেপের বর্ণনা দিচ্ছিল। সেই গল্প শুনে মণ্ডলবাবু দাঁত ক্যালালো। মিত্র বাবুও। আমিও। রেপ্ কি দাঁত ক্যালানোর মত ব্যাপার? —তবু......)

—তা ওই মেয়েটা খামোকা চাকরী করতে কলকাতা ছেড়ে এখানে মরতে এল কেন?

—ওর বাবা গ্যাস্ট্রিকে মারা যান। কম্পেনসেটরী গ্রাউণ্ডে চাকরী। সরকার এখানেই পোস্টিং দিয়ে দিল। ধরা করার কেউ ছিল না।

— ওনার সঙ্গে কে থাকতেন ?

—ওনার মা থাকতেন। তবে বোধহয় মাসখানেক ধরে উনি একাই আছেন।

- দাদাটি ?

—পিশ্তুতো। শিবপুরে থাকে।

—তাহলে মাসখানেক ধরে একা ?

—হ্যাঁ স্যার।

—তবে তো ও জিনিস হয়েই গ্যাছে।

কয়েকজন হেসে উঠল। জেলার ম্যাপ, গান্ধীজীর ছবি, বিড়ির গন্ধ, ফ্যাকাশে আলো... গল্প চাই। জম্পেশ গল্প।

—তারপর ?

—মানে ?

—শুরু করুন। কাশফুল থেকে শুরু করুন।

- উনিতো রিক্সা থেকে নেমে ক্রাচে ভর দিয়ে নদীর দিকে এগুতে লাগলেন। বালিতে ঐ ক্র্যাচ-লাঠির গোড়া সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। উনি আঙুলটা পশ্চিমের দিকে রেখে বল্লেন—দেখুন ওদিকে কি হচ্ছে। আমি বল্লুম—ওদিকে তো খড়্গপুর যাবার রাস্তা তৈরী হচ্ছে। উনি বল্লেন—আঃ। সূর্য্যটাকে দেখুন না, কি রকম রং দেখুন, জলের মধ্যে চিকিচিকি, কাশফুল সোনালী হয়ে গেছে। আমি বল্লুম এমন কী আর, এরকম তো রোজই হচ্ছে। তিনি আমাকে বসতে বল্লেন। আমি একটু দূরে বসলাম। উনি দামোদরের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—বিদ্যাসাগর। আমি তার চোখের দিকে তাকাতেই তিনি বল্লেন—ছোটবেলায় বইতে বিদ্যাসাগরের ছবি দেখেছি—সাঁতরে পার হচ্ছেন তিনি দামোদর, সেই থেকেই, বুঝলেন, দামোদরের কথা শুনলেই বিদ্যাসাগর মনে পড়ে। দামোদরের এপাড়-ওপাড় জুড়ে বিদ্যাসাগর, তাই না? আমি

বললুম—বিদ্যাসাগরের দামোদর কি আর আছে ? সব চড়া পড়ে গেছে।
এমন সময় স্যার, ঝোড়ো বাতাস আসে। কোত্থেকে শুকনো অশথ পাতা হাওয়ায় উড়ে এসে ওনার শাড়ীতে লাগে। উনি ঐ পাতাটা গালে ঘষছিলেন আর আপনমনে কেমনধারা যেন বক্‌বক করছিলেন। বলছিলেন—সেই কবে ছোট বয়সে উনি শিবপুরে পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলেন, ওনাকে রিক্সায় চাপিয়ে পিশতুতো ভায়েরা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেল একটু পরেই ঘন আর কালো মেঘ। আকাশ ফালা-ফালা—তারপর হাওয়া, বৃষ্টি। রিক্সাওয়ালাতো জোর রিক্সা ছুটিয়ে চলল বাড়ীর দিকে। উনি কেবলই বলেন—আস্তে চলো—আস্তে চলো—আস্তে চলো……
আমি তখন বলি এবার উঠুন মিস দত্ত…
মিস দত্ত বল্লেন—পূরবী বলতে পারেন না, পূরবী, উনি সেই অশথপাতাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। বল্লেন—শুনুন না, একটা জরুরী কথা আছে। আমি বল্লুম—বলুন না, শুনতে পাচ্ছি। উনি বল্লেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি আমায় কত কাজ শিখিয়েছেন অফিসে। কত গাছ চিনিয়েছেন রাস্তায়, আজ কী সুন্দর জায়গাটা দেখালেন …
আমি উড়ে আসা আর একটা অশ্বথপাতা খপ্ করে ধরে ওনাকে দিতে গেলাম—'নিন।' উনি হাসলেন। হাওয়ায় ঐ হাসি উড়ে গিয়ে কাশফুলে মিশে গেল। বল্লেন কী হবে? আমি বল্লুম—ঐ যে এতক্ষণ পাতাটা নিয়ে খেলা করলেন, তাই আর একটা দিলুম। উনি বল্লেন—শুনুন, আপনার জন্য একটা সোয়েটার বুনছি। শীতের আগেই দিয়ে দেব। আমি বল্লুম—ঐ সোয়েটারটা, যেটা আপনি অফিসে মাঝে মাঝে বোনেন, সবুজ আর সাদা ?……
—তারপর? চুপকরে গেলেন কেন মশাই, বলুন, কিচ্ছু বাদ দেবেন না।
—অন্ধকার হয়ে আসছিল, আমি বল্লুম, এবার উঠুন মিস দত্ত, উনি তবু বল্লেন আর পাঁচ মিনিট।

এমন সময় স্যার, একটা প্রাইভেট গাড়ী এসে থামল। তিনজন লোক এগিয়ে এল। আমাকে ঠাস করে একটা চড় মারল। বল্ল শালা—মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি? তারপর ওনাকে বল্ল—এতক্ষণ তো একে আনন্দ দিলেন এবার আমাদের একটু দিন। আমি বুঝলুম সামনে বিপদ। গুরুনাম জপ করতে লাগলাম।

আমি ওনাকে আঁকড়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু লজ্জায় পারলাম না। ওরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গাড়ীতে তুলল। আমি শ্রীহরি মধুসূদনকে ডাকতে লাগলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। আমার পকেটে টর্চলাইট ছিল স্যার, গাড়ীর নম্বরটা দেখলাম। তিন হাজার দুই।

—তিন হাজার দুই ?

সবাই কেন যেন নড়েচড়ে বসল। এ ওর মুখের দিকে তাকালো

—নম্বরটা ঠিক দেখেছেন তো ?

—হ্যাঁ স্যার, তিন হাজার দুই। পষ্ট দেখেছি। নম্বরটা জপ করতে করতে আসছি।

বড়বাবু কলম ঠুকলেন টেবিলে। বল্লেন আপনি আগে বলেছিলেন যে আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ওরা আপনাকে মেরেছিল .....

—স্যার ওটা ঠিক নয় স্যার, মিথ্যে বলেছিলাম একজন সজ্ঞান ব্যাটাছেলের কাছ থেকে একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নেয়া স্বীকার করতে খুব লজ্জা করছিল স্যার, তাই প্রথমে মিথ্যে বলে দিয়েছিলাম ।

—ধুর মশাই, আপনি একজন লায়ার।

—না স্যার, মা কালীর পা ছুঁয়ে বলছি, কিচ্ছু মিথ্যে নেই, সব সত্যি বলেছি স্যার, শুধু প্রথমটায়. ....

—আপনি অন্ধকারে কি করে গাড়ীর নম্বরটা পড়লেন ?

—আমার পকেটে টর্চ থাকে স্যার। নতুন ব্যাটারী পরশুর কেনা, যশোদা ভাণ্ডার থেকে কিনেছিলাম।

বড়বাবু সিগারেট ধরালেন। একটু চুপ থেকে বল্লেন দেখুন মশাই, চাকরী করতে এসেছেন ঝুট ঝামেলায় কেন জড়িয়ে পড়ছেন মশাই, এসব ডায়রী ফায়রী কেন করতে যাচ্ছেন, চেপে যান। আমি বল্লুম – ওদের ধরবেন না ? মেয়েটাকে বাঁচাবেন না ? গাড়ীটার নম্বর তো . ...

তাহলে তো প্রথমে আপনাকেই অ্যারেষ্ট করে দেবো। যদি বলি আপনিই চক্রান্ত করে......

থানা থেকে বেরিয়ে আসি। ঘরে যাই। রান্নাবান্না করতে ইচ্ছে করলনা। শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই উঠে পড়লাম। বাইরে একফালি চাঁদ আলো বমি করছে। পূরবী দেবী যে বাড়ীতে থাকেন ঐ বাড়ীর সামনে গেলাম। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। পূরবী দেবীর নড়াচড়াও দেখতে পাই। আঃ।

ডাকলাম না। যদি কেউ কিছু ভাবে? কিম্বা আমার নিজেরই মুখ দেখাবার লজ্জা। সারারাত নিজের ঘরে একা একা বসে থেকে পরদিন সকালে ওর ঘরে গেলাম।

আমাকে দেখেই ওর চোখ থেকে জল বেরিয়ে গাল বেয়ে পড়ে। আমি কিছু বলিনা, বলতে পারিনা। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। উনি বল্লেন —আমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছিল। গাড়ীর একজন বলছিল—একটা খোঁড়া মেয়েকেই শেষ পর্য্যন্ত......অন্য একজন বলেছিল—দেখি মালটাকে। গাড়ীর আলো জ্বালতেই একজন বল্ল কাকে ধরে এনেছ? একে চেনো না? এতো বি. ডি. ও. অফিসে কাজ করে। অন্য একজন বল্ল—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; এখনো ইটভাটার দিকে গেলে সাঁওতাল টাওতাল পাওয়া যাবে।

আমাকে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ী ঘুরে গেল। আমি বি ডি. ও. অফিসের কেরাণী বলে বেঁচে গেলাম। অন্য একজন হয়তো বা মরল, যার চোখে চশমা নেই, গুছিয়ে কথাও বলতে পারে না।

আমি বল্লাম—খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন ম্যাডাম। উনি বল্লেন—ছিঃ।

ছিঃ, শব্দটা বলার সময় মুখ দিয়ে থুথু ছিটালো। ক্ষোভ আর ঘৃণার পুঁটুলী ছুঁড়ে দিল যেন। থুথু মাখানো ছিঃ শব্দটা চামচিকের মত ঘুরতে লাগল।

এই ছিঃ কি আমি? না আমার চারপাশ।

অফিসে আর আমার সঙ্গে কথা বলতেন না পূরবী দেবী। আমি কোনদিন আগে এসে পূরবীদেবীর ড্রয়ারের ফাঁকে গলিয়ে দিতাম শির বের হওয়া অশথ-পাতা বা মাছরাঙা পাখির নীল পালক। তবু উনি কথা বলতেন না আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝেই মনে হ'ত থুথু ছেটানো ছিঃ শব্দটা চামচিকের মত আমার পাশেপাশে ঘুরছে। একদিন চিমনী কারখানার কনট্রাক্টর এসে আমায় বলে— জলের ব্যবস্থাটা শিগ্‌গির করে দেন দাদা, বহুদিনতো হ'ল। সন্দেশের বাকশোটা টেবিলে রাখলেন। আমি বল্লুম—বাকশোটা হঠান শিগ্‌গির। তারপর বল্লুম —সিরিয়ালি হবে। আপনার টাইম হলেই পেয়ে যাবেন।

বিরক্ত করবেন না। বলেই পূরবী দেবীর দিকে তাকালাম।

দেখি উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বি. ডি ও. সাহেব নিজে বল্লেন—এবার চিমনি ফ্যাক্টরীর জলের ফাইলটা ছেড়ে দিন, আমি বল্লুম ওটায়

প্রায়োরিটি নেই। হাসপাতালের জলটা আগে হবে।

চিমনি ফ্যাক্টোরীর কনট্রাক্টার সাহেব গাড়ী করে এসেছিল। তার নম্বর তিন হাজার দুই।

কিছুদিন পরে গাড়ীটাকে আবার দেখলাম, অফিসের সামনে। গাড়ীর নম্বর তিন হাজার দুই। গাড়ীতে বি. ডি. ও. সাহেবের পরিবার। গাড়ী যাচ্ছে বর্দ্ধমান-টাউন। আমি রুলটানা স্কেলটা নিয়ে ছুটলাম। বেপরোয়া বাড়ি মারতে লাগলাম গাড়ীটার গায়ে। মুখ থেকে থুথু মিশ্রিত ছিঃ শব্দ ঠিক্‌রে বের হ'তে থাকে। গাড়ীতে ঝম্‌ঝম্‌। বি ডি ও-র পরিবার চিৎকার করতে থাকে। সবাই আমাকে ধরাধরি করে সরিয়ে দেয়। টেনে অফিসের মধ্যে নিয়ে যায়। আমি একটি মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল—চারিপাশে তাকাই।

আমার ট্রান্সফার হয়। মুর্শিদাবাদের খুব ভিতরের দিকে। পানিশ্‌মেণ্ট। আমার জিনিষপত্র গোছ-গাছ করছিলাম। পুরবীদেবী ক্রাচে ভর দিয়ে আমার ঘরে আসেন। তখন রাত্রি। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ব্যাং ডাকছে। পুরবীদেবীর হাতে সাদায় সবুজে মেশানো সোয়েটার। বল্লেন দাদা, এটা পরবেন।

আর কী আশ্চর্য। যেন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল দামোদর, বিশাল, বিদ্যাসাগর॥ বিদ্যাসাগর॥

উনি বল্লেন—ভাল থাকবেন। চিঠি লিখবেন। জানাবেন কেমন থাকেন, আর……

আর কিছু দরকার নেই। হারমোনিয়ামের মত বেজে উঠল ঝিঁ ঝিঁর শব্দ, ব্যাং-এর ডাক। হারমোনিয়ামের মত বাজছে মুর্শিদাবাদের রাস্তা।

মায়ের জন্য

ভগীরথ মিশ্র

চিৎরঙের ডাঙায় সেই খেজুর গাছটা

চিৎরঙের ধু-ধু কাঁকুরে ডাঙায় একবুক নিঃসঙ্গতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে খেজুর গাছটা। কতোকাল। আকাশের দিকে নিষ্পলক। তার সরু-পানা কালো শরীর ডানদিকে অল্প হেলানো। খরখরে পোড়া পোড়া গা। তাতে অসংখ্য ফুটো-ফোকর, কাটা-ছেঁড়া। ডগায় বিবর্ণ আলুথালু পাতার ঝোড়। উদোম বাতাসে ফরফরিয়ে ওড়ে। তারই একটা ডালে বসে একটা তেলচুকচুকে গরবিনী ফিঙে লেজ দোলায় প্রায় সারাক্ষণ।

গাছটার সারা গায়ে অসংখ্য চোখ কাটা। হাত দশেক উঁচু থেকে শুরু হয়েছে ওর মরা চোখের গহ্বর। ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেছে সারবন্দী অনেক চোখ।

এ শীতেও চোখ কেটে রস নিঙড়ানো হয়েছে। টাটকা চোখের গহ্বর থেকে অল্প অল্প রস চোয়াচ্ছে এখনো। গুঁজি গোঁজা রয়েছে চোখের মাঝখানটিতে। গুঁজির ডগায় জমে রয়েছে কয়েক বিন্দু রস। একটা কাক উড়ে উড়ে ক্রমাগত ঠোক্কর মারছে চোখের মধ্যে।

গাছটা ইজারা নিয়েছে কেউ। রসের ইজারা। ফলে গাছটাকে ছিবড়ে বানানোর আগে ছাড়বে না কিছুতেই। একদিন গুজি মেরে পরপর তিন দিন রস নেয়। তারপর একদিন জিরোতে দেয় গাছটাকে। তারপর আবার পরপর তিনদিন। এইভাবে পুরো শীতকাল। জীরেন্ রসের স্বাদ বেশী। দো-কাটি, তে-কাটি রস অতো গাঢ় নয়।

ষষ্ঠীবাউরীর মা ও মেজোকর্তা—

এরা তবু গাছটাকে তিনদিন বাদে বাদে একদিন জিরোতে দেয়। ষষ্ঠী বাউরীর মা'কে গাঙ্গুলীরা তা'ও দেয়নি। ছিবড়ে হবার আগের দিন অবধি একটি রাতও ঘুমোতে পায়নি ষষ্ঠী বাউরীর মা।

ষষ্ঠী বাউরী ছেলেবেলার কথা কিছুই ভোলেনি। গাঙ্গুলীগড়ের মেজো-কর্তা বড় ভালোবাসতেন ষষ্ঠীর মা'কে। সেই ভালোবাসার টানে ওর রস খেতেন রোজ। মেজোকর্তা ছিলেন যথার্থ রসিক মানুষ। একা একা রস খাওয়ায় তিনি জোস্ পেতেন না। তাই জয়রামপুরের পুরন্দর কাইতি, বিষ্টুপুরের মহাদেব উকিল,—এরা ফি'হপ্তায় গাঙ্গুলীগড়ে আসতেন ষষ্ঠীর মায়ের রস খেতে। তখন ষষ্ঠীর মায়ের অঙ্গে সবে রস জমতে শুরু করেছে।

তারপর একদিন ষষ্ঠীর মার দেহজুড়ে কম্প দিয়ে যৌবন এলো। গুমরে গুমরে বসবাস করলো। না বলে বয়ে চলে গেল একদিন। এবং পঞ্চরসিকে মিলে এই রস চাখাচাখির মধ্যে একদিন ষষ্ঠী বাউরী জগতের মুখ দেখলো।

গাঙ্গুলী গড়ের থেকে অল্প দূরে বাবুদের আরো একটা কোঠাঘর ছিল। আমোদ-ফুর্তি যা হবার ওখানেই হোত। কোঠাঘরের থেকে অল্প দূরেই একটা ঝুপড়ি ঘরে ষষ্ঠীরা থাকতো। ফি-রাতে ষষ্ঠীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর মা চলে যেতো বাইরের থেকে তালা লাগিয়ে। তারপর সারারাত, সারাটা রাত ষষ্ঠীর নিঃসঙ্গ কেটে যেতো। ওদিকে, রাতভর, মেজোবাবুদের চণ্ডুর সম্মুখে ষষ্ঠীর মা পেতে দিতো একটি একটি প্রত্যঙ্গ। ওরা চোখ কাটতো। গুজি গুঁজতো। রস খেতো। ষষ্ঠী তখন অঝোড় ঝুপড়ির মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলতো সারা রাত। ভারি খিদে পেতো তার। অনেক অনেক খিদে। পেটের, কোলের, সোহাগের, সান্নিধ্যের খিদে।

এইভাবে, গুঁজি পুঁতে রস খেতে খেতে একদিন মেজোকর্তা ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ির মতো চলে গেল ওপারে। ষষ্ঠীর মা'র শরীরে তখন রস বলতে কিছুই নেই। কাঁটাসার শরীর। নিঃস্ব, রিক্ত। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পাখির খাঁচা একটি। কিংবা চিৎরঙের ডাঙার ঐ সিড়িঙ্গে খেজুর গাছ। আর ষষ্ঠী বাউরী, সেই বাচ্চা বয়েস থেকে রসবিহনে সরু ঠ্যাংওয়ালা বকের মতো অবয়ব নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো তার যৌবনের দিকে। এখন তার শরীরে অনেক ব্যাধির নিরঙ্কুশ বসবাস। পেটে, শিরায়, ফুসফুসে, মগজে অনেক রোগের আড়ত। এখন সে অতি কষ্টে টেনে টেনে দম নেয়। নিজের বুকের খাঁচায় হাত বুলিয়ে ভেতরের রুগ্ন পাখিটাকে সোহাগ করতে থাকে সর্বক্ষণ।

আমার মা ও মতিনবাবু

অনেক আগে, আমার সেই ছেলেবেলায়, মতিন বাবু মায়ের কাছ থেকে অনেকগুলো সাদা কাগজে টিপছাপ করিয়ে নিয়েছিল। মা ছিলেন ভারি সরল এবং অসহায়। আমি তখন ছিলাম খুবই ছোট। আমাকে বুকে চেপে অবিরাম কেঁদে যেতেন মা। কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতেন না। তখন থেকেই আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতো মতিনবাবু। ওকে দেখে মা ভয়ে সিঁটিয়ে যেতেন। মতিনবাবু সাবাক্ষণ কারণে অকারণে হেসে উঠতো হ্যা-হ্যা করে। হাসির সাথে তার সোনা বাঁধানো দাঁত ঝিকমিকিয়ে উঠতো। মতিনবাবুর ঐ সোনালী দাঁতের হাসি এখনো মিলোয়নি।

সেই বাচ্চা বয়েসে আমি অনুভব করতাম মতিনবাবুর দৃষ্টির সামনে আমার মা শুকিয়ে যাচ্ছে তিল তিল। আমার কান্না পেতো।

আমার বয়েস তখন পনেরো কি ষোল। একদিন মতিনবাবুর সামনে দাঁড়ালাম সাহসে ভর করে। কচি ভুরু পাকিয়ে বললাম, 'তুমি আমাদের বাড়িতে রোজ রোজ আস কেন '

আমার উদ্ধত ভঙ্গিতে যেন মজা পেলো মতিনবাবু। গালখানা আলতো টিপে দিয়ে বললো, 'এটা যে হামার বাড়ি খোকাবাবু। এই ঘর-বাড়ি, গাছ-গাছাল, পুকুর-জমিন—সব হামার।'

'না। এসব আমাদের।' আমি ফুঁসে উঠি।

আমার দিকে কুতকুতে চোখে তাকায় মতিনবাবু। নিপাট হাসে। বলে, 'কাগজ আছে খোঁকাবাবু। হামার পাশ পাক্কা কাগজ আছে।'

একদিন আমার বাড়ির উঠোনে একগাদা ইট-কাঠ যন্ত্রপাতি এনে জড়ো করলো মতিনবাবু। একখানা হাস্কিং মিল বসালো। চারপাশ থেকে জলের দরে ধান কেনে। আর ঐ হাস্কিং মিলে চাল ভেনে রেখে দেয় আমাদেরই গোলার মধ্যে বস্তাবন্দী করে। গভীর রাতে ট্রাক আসে। চালের বস্তা বোঝাই করে নিয়ে ফের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ছেলেবেলায় ট্রাকের হিংস্র গর্জনে কতো রাত ঘুমোতে পারিনি আমি। যেন এক হিংস্র দানবের গর্জন।

আমি মা'কে বারংবার শুধোই, 'মা, ঐ লোকটা আমার বাড়ীর উঠোনে ধানভানার কল বসালো কেন?'

'আমাদের ভিটেখানা যে ওর কাছে বাঁধা রয়েছে বাবা'। মা কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেন, 'বোধ করি কোনও দিনও তা ছাড়ানো যাবে না।'

তারপর মতিন বাবু আমাদের ভিটেখানার পুরোপুরি দখল নিয়ে নেয়।

জমিতে ডাল-সরষের চাষ করে। ফলের চারা এনে পুকুরের পাড়ে লাগায়। পুকুরে মাছ ছাড়ে। সাবেক কালের বাড়িখানায় আমি আর মা' থাকি বটে। তবে ঐ পর্যন্তই। মাথা গোঁজার বেশি আর আমাদের কোনও অধিকার নেই পৈত্রিক ভিটেয়।

২ চিৎরঙের ডাঙ্গায় সেই সর্বস্রান্ত খেজুর গাছটা এবং আমার মা

আমার সাথে ষষ্ঠী বাউরীর খুব ভাব। দু'জনে সন্ধ্যের দিকটায় রোজই বসি খেজুর গাছটার তলায়। বসে বসে নিজেদের কথা বলে মনের খেদ মেটাই। মাঝে মাঝে থিরপলকে গাছটাকে দেখতে থাকি দু'জনেই। কণ্টটা বাড়তে থাকে। মায়ের মুখখানা মনে পড়ে। একদা যুবতী টসটসে গাছটা থেকে তিল তিল রস নিংড়ে নিয়েছে মানুষ। শুকনো শরীরে এখন অসংখ্য মরা চোখের গহ্বর। ঐ গহ্বরগুলোকে বয়ে বয়ে এই নিঃসঙ্গ প্রান্তরে হয়তো একদিন নিঃশব্দে মরে যাবে গাছটা। অথচ একদিন ওর কতো জৌলুস ছিল। কাঁদি কাঁদি টকটকে লাল ফল বইতো বর্ষায়। পাড়ার সমস্ত বাচ্চা-কাচ্চা এসে ভীড় জমাতো ওর তলায়। ষষ্ঠী বাউরীর দিকে তাকিয়ে বলি, 'আর ইজারা দিলে গাছটা মরেই যাবে। কতো দিনের পুরোনো গাছ—।' ষষ্ঠী বাউরী বারবার দিগন্তের গায়ে বিঁধিয়ে দিচ্ছিল চোখ। বিড়বিড়িয়ে বললো, 'প্রত্যেক বচ্ছর ভাবি, আর ইজারা লয়। বিক্ষো হইলো মা'র মতোন। মাত্ হত্যা হব্যেক্। কিন্তু কি বইল্‌বো আইজ্ঞা, শালা রহমান ঠিক কার্তিকের পয়লা হপ্তায় এইসে হাজির। কার্তিকের পয়লা হপ্তা মানে বুঝেন তো? মায়ে-ব্যাটায় লিরম্বু উপাস চইল্‌ছে তখন। মা ফিট্ হইলে আমি ছাড়াই। আমি ফিট্ হইলে মা ছাড়ায়। অমন মুহূর্তে রহমান দিবেক দু'কুড়ি ট্যাকার লালসা। ভাবতো পারেন? দু'কুড়ি ট্যাকা! এক কুড়ি আগাম দিতে চায়।' মাটির দিকে চোখ নাবায় ষষ্ঠী বাউরী। বলে, 'টাকা গুলান লিতে হয় আইজ্ঞা।'

'কিন্তু এই খেজুর গাছটাকে দ্যাখ্। সারা মরসুম চুষে চুষে কি দশা করেছে ওর।'

মাটি থেকে ঘাড় তোলে ষষ্ঠী বাউরী। খেজুর গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। হুশ করে নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, 'গাছ তো গাছ, এখন যদি কোউ মোর পেট-ধরা মা'টাকে ইজারা লিতে চায়, যদি সিই সুবাদে হাতে গুইজে দেয় এক কুড়ি ট্যাকা, তো লিতে হব্যেক ট্যাকাটা। খিদার বাড়া আগুন, আইজ্ঞা, নাই এই বিশ্ব-সন্‌সারে। লিমেষে খান্ডব দহন কইর্‌তে পারে উ।'

শুনতে শুনতে আমি ক্রমশঃ ভেতর বাগে তলিয়ে যেতে থাকি। সহসা মায়ের মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মা যে এখন কি করছে, দেশের বাড়ীতে!

গতিশীল দেশ ও আমি

বাসায় এসে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লাম আমি। অন্ধকার ঘরে মিটমিট জ্বলতে লাগলো জোনাকির মতো টুকরো টুকরো সবুজ আলো। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন...।

গতকাল রাতেও আমার বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল। ওরা রোজ আসে। মতিনবাবু সে জন্য ওদের মাসোহারা দেয়। আমার অপরাধ হলো, আমি আমার ভিটে থেকে মতিনবাবুকে উঠে যেতে বলেছিলাম। ওর হাস্কি মিলের দেওয়াল শাবলের ঘা মেরে ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। মতিনবাবুর ডাকে সাথে সাথে ছুটে এলো পুলিশ বাহিনী বিষ্টুপুর থেকে। বাঁকুড়া থেকে পুলিশের মেজো সাহেব। পরের দিন গভীর রাতে আমার বাড়ী ঘিরে ফেললো পুলিশ। আমাকে অনেক কৌশল প্রদর্শনের পর ধরলো। তিন দিন তিন রাত্তির পুলিশ হাজতে থাকবার পর আমাকে তোলা হোল বাঁকুড়া কোর্টে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে আমিও চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেলাম। গোটা দশ বারো ডাকাতি-ধর্ষণ আর রাহাজানির আমি নাকি অন্যতম হোতা। একটা খুনের কেসেও জুড়ে দেওয়া হলো আমায়। সবচেয়ে বড় অভিযোগ আমি নাকি বিষ্টুপুর থেকে তালডাংরা জুড়ে গড়ে তুলেছি এক বিশাল উগ্রপন্থী ঘাঁটি। স্বপ্নের মতো শোনাচ্ছিল সমস্ত কথা। আমার জেল হাজতে ঠাঁই হোল।

হাজতে বসে বসে শুধুই ভেবেছি, শুধু মতিনবাবুর হাস্কিং মিলের দেওয়ালে একখানা শাবলের ঘা' মারতেই অতোখানি তোলপাড় উঠলো চারপাশে! পুলিশের রাতের ঘুম চলে গেল। উকিল বাবুদের ছোটাছুটি বেড়ে গেল। শুধু একটি মাত্র ঘায়ে! কেন? কেন?

অনেকদিন বাদে ঘরে ফিরলাম আমি। মতিনবাবু তখন আরো জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের পৈত্রিক ভিটেয়। আমাদের পুকুরে পাকার শান বাঁধানো ঘাট বানিয়েছে। আমাদের সাবেক বাড়িখানাকে সে তার গুদাম বানিয়েছে। ভিটের এক কোণে মা'কে বানিয়ে দিয়েছে এক কুঁড়ে ঘর। ঐ কুঁড়ে ঘরে আমারও ঠাঁই হোল। কিন্তু সর্বক্ষণ মতিনবাবুর লোক আর পুলিশের চর আমাকে নজরে রাখতে লাগলো। নিজের ভিটেয়' চোরের মতো বসবাস করতে

লাগলাম আমি।

দেশ নাকি এগিয়ে চলেছে। এক-ফসলা জমি সব তিন-ফসলা হোল। জোড়গুলোতে বাঁধ হোল। ঝলমলিয়ে বিদ্যুত জ্বললো প্রাসাদে। কল-কারখানা বসলো। পীচ রাস্তা হোল। সারাক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে বাস, লরি, ট্যাক্সি ছুটে চলে রাজপথ দিয়ে। বিষ্ণুপুরে বিশাল স্টেডিয়াম মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রসিকগঞ্জের ডাঙায়। তার উল্টো দিকেই জেলের ফটক। সারাক্ষণ বন্ধ। সেখানে এক গাদা সেপাই শান্ত্রী নিয়ে একজন বেঁটে খাটো লোক সর্বদাই সতর্ক। এই বুঝি কয়েদীর হাতে-পায়ের ডাণ্ডা-বেড়ি ঢিলে হয়ে গেল কিঞ্চিৎ।

সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরী হচ্ছে এখানে ওখানে। বাড়ির সামনে ছবির মতো বাহারী ফুলের বাগান। সকাল-বিকেল বাঁ-ঝাঁ করে ছুটে আসে লাক্সারি বাস। বাহারী ট্যাক্সি। ঝকঝকে মেয়ে-পুরুষ আর প্রজাপতির মতো বাচ্চারা নামে ঝাঁকে ঝাঁকে। ওরা কলরব করতে করতে শহরের পুরাকীর্তি দেখে। ট্যুরিস্ট লজে বাসা বাঁধে রাতে। সেখানে রাত পোহালেই বাহাত্তর টাকা ভাড়া। তাও খালি থাকে না একটিও ঘর। সারাক্ষণ সেখানে গিজ গিজ করে নিটোল মানুষের দল। এতো এতো সুখ সম্ভোগের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে থাকি ষষ্ঠী বাউরীদের কথা।

গতিশীল দেশ ও ষষ্ঠী বাউরীর হরেক কিসিমের ক্ষিদে

শিরীষ গাছের সব পাতা হলুদ হয়ে গেছে। চ্যাপ্টা লম্বা ফলগুলো শুকনো হয়ে গাছভরে ঝুলছে। অল্প হাওয়ায় দোলে। ভেতরের শুকনো বীজ ঝনঝনিয়ে বাজে। আর কিছু দিন বাদে খরা হবে সারা এলাকা জুড়ে। এ যেন তারই সংকেত। কাঁকুরে মাটি তেতে পুড়ে ঝলসে দেবে চারপাশ। মাটির বুক থেকে সোঁ-সোঁ আওয়াজ উঠবে অবিরাম। তখন এক ঢোক জলের তরে উদোম মানুষের দল মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় চষে ফেলবে পাগলের মতো। তখন একদানা চালের জন্য টিপছাপ দিতে দিতে বুড়ো আঙুলে দগেদগে ঘা' হবে। চিত্ রঙের ডাঙায় গনগনে লোহার মতো মাকড়া পাথর ফাটাতে ফাটাতে শীর্ণকায় মানুষের দল ভর দুপুরে ছাতি ফেটে মরবে। কণ্ট্রাক্টরের নীল রঙের ট্রাক ধুলো উড়িয়ে ফিরে যাবে শহরে। সেখানে মাকড়া পাথর দিয়ে কতো কিছু নির্মাণ চলছে।

এমনতরো অনেক করুণ মর্মন্তুদ দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করি প্রতিদিন। আর

সমস্ত করুণ দৃশ্যের মধ্যেই ছায়া ছায়া ভাসতে থাকে আমার কুঁড়েঘরবাসিনী মায়ের শীর্ণ মুখখানি।

বাঁ' হাতে ঝাঁকড়া ওল আর ডান হাতে বুনো খরগোস ঝুলিয়ে ঘরে ফিরছিল উদোম মানুষের দল। ডুবন্ত সূর্যের দিকে পিছন ফিরে হাঁটছিল তারা। আমি বসেছিলাম খেজুর গাছটার তলায়।

গাছটার একেবারে চুড়োয় সদ্যকাটা চোখ থেকে তখনো টিপটিপিয়ে রস ঝরছিল ফোঁটা ফোঁটা। আমার মনে হচ্ছিল, গাছটা যেন অঝোরে কাঁদছে। নিঃশব্দে। দিনরাত। একা একা। ওর চোখের জল টিপটিপ পড়ছিল আমার মাথায়। গাছের কান্নাটা সংক্রামিত হচ্ছিল আমার বুকেও। আমি শিউরে শিউরে উঠছিলাম। রসের ফোটাগুলো আশ্চর্যরকম উষ্ণ। ঠিক আমার মায়ের চোখের জলের মতো।

উদোম মানুষগুলোর পায়ের শব্দে মুখ ফেরালাম। ঝাপটে আসছে ওরা। চিৎ রঙের ডাঙায় ঢলে পড়া সূর্যের আলোয় ওদের ছায়াগুলো যেন যোজন প্রমাণ হয়ে সামনে সামনে হাঁটছে। ঢ্যাঙাপানা সরু সরু মানুষের ছায়া। ছায়ার মিছিল।

ষষ্ঠী বাউরীও ছিল ওদের সংগে। আমাকে দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়লো। অন্যেরা এগিয়ে গেল। এখন দাঁড়ানোর সময় নয়। সারা দিনের উপোসী শরীর নিয়ে দাঁড়ানো চলে না। শরীরের লম্বা ছায়াগুলো এখন দু'পা ধরে সামনে টানতে থাকে সম্মুখ পানে। তবুও ষষ্ঠী বাউরী দাঁড়ালো। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ওর ছায়াখানা সামনে থেকে পেছনে গিয়ে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

'ঘাড় তুলে কি অমন ভালছেন গাছটাকে?' ষষ্ঠী বাউরী শুধোয়।

আমি গাছটার প্রতি তন্ময় ছিলাম। ঐ অবস্থায় ষষ্ঠীর মুখের দিকে তাকাই। এক সময় বিড় বিড় করে বলে ফেলি, 'মা'কে। আমার মা' কে।'

ষষ্ঠী বাউরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো বোকার মতো। কি বুঝলো কে জানে। এখন তার উপোসী শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে একটা অসাড় ঝিঁ-ঝিঁ ধরা ভাব। কোনও কিছু তীক্ষ্ন হয়ে বেঁধে না মগজে।

'গাছটাকে ওরা কবে রেহাই দেবে রে, ষষ্ঠী?' আমি শুধোই।

'ইজারা লিয়েছে আইজ্ঞা, অতো জলদি কি থামে?'

ষষ্ঠীর গলায় অপরাধীর সুর।

আমি কথা ঘোরাই। বলি, 'বনে বনে কন্দকচু খুঁজছিস রে বড় ? মাজুরিয়ার খালে মাটির কাজ হচ্ছে না ?'

'মাটির কাজ বন্ধ।'

'কেন ?'

'কে—জানে। ছিষ্টিধর লায়েক নাকি কুর্টের ইন্‌জাক্‌শন এনেছে। বাঁধ হইলে উয়ার দশবিঘা জমিন নাকি ডুইব্যে যাবেক্ জলের তলায়'।

ষষ্ঠী মুহূর্তকাল থামে। তারপর বলে, 'কুর্টের রায়কে অন্‌গেরাহ্যি করবেক কে ?'

'অথচ বাঁধটা বাঁধা হলে পাঁচশো বিঘা জমি লক্‌লকিয়ে উঠতো। তোরাও কাজ পেতিস সম্বৎসর। কত গরীব চাষীর স্বল্প জমি দো ফাসলা হোত। খালের দু'পাশেতো প্রায় সমস্তই পাট্টা জমিন।'

ষষ্ঠী-বাউরী আরো ঘনিষ্ট হলো। এদিক ওদিক চাইলো। তারপর নীচু গলায় বললো, 'উই পাট্টা জমি বলেই তো কুর্টের ইন্‌জাক্‌শন লিয়ে এইলো উয়ারা। দশ বিঘা জমিন জলে ডুবে যাওয়ার গল্পটা মিছা। আসলে অতো গুলান পাট্টাদারের ঘরে ফসল উঠল্যে নাকি সস্তাদরে লেবার পাওয়া যাবেক নাই।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ষষ্ঠী বাউরীর দিকে। বোকা বোকা মুখে কেমন করে সারা কথাটা উচ্চারণ করে ফেলে ওরা !

ষষ্ঠী বাউরী ভারি অদ্ভূত হাসি হাসলো। শেষ বেলার ম্লান আলোর সাথে মিশে বড় করুণ হয়ে উঠলো সেটা।

বললো, 'ক্ষেতে-ভুঁয়ে কাজ নাই। মাটি কাটবার কাজটাও বন্ধ হয়ে গেল। এ বচ্ছর চুরি চামারিটা বাড়বেক্ আইজ্ঞা।' ষষ্ঠী বাউরীর কথাটা আমার মগজের মধ্যে সিঁদ কেটে কেটে ঢুকতে থাকে। মাটিকাটা, পাথর ফাটানো যে কোনও একটা কাজ চললে এলাকায় চুরি-চামারি কমে যায়। অর্থাৎ কাঠফাটা রোদে পাথর ফাটানোর কাজ পেলেও এরা চুরি-চামারি ছেড়ে দিতে রাজি। সেটাও যখন পায় না তখনই বেরোয় আঁধারে দ'চোখ জেবলে।

ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলাম আমি।

ষষ্ঠী বাউরীর হাতের খরগোসটা দুলছিল। আমি জানি, খরগোসটা এদের কপালে জুটবে না। গাঙ্গুলিরা নামমাত্র দামে কিনে নেবে ওটা। ঐ দিয়ে চাল আটা কিনবে এরা। বাঁক্‌ড়া ওল দিয়ে খাবে।

চোখের সামনে খরগোসটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। যেন বলছে,

সময় বয়ে যায়। এখন খিদের সময়।

অন্য হাতে ওলটা অসংখ্য গভীর চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। ধমকাচ্ছিল আমায়। যেন বলছিল, 'দেখছো না, সময় বয়ে যায়?'

'পালাবো শালা, এদেশ থিক্যে।'

ষষ্ঠী বাউরী মাঝে মাঝেই বলে কথাটা। বলি, 'কোথায় পালাবি রে? কোন্ দেশে?'

'যিদিগে দু-চোখ যায়। যিখ্যেনে অমন অষ্ট পহর খিদা নাই।'

ষষ্ঠী বাউরীর এই 'অষ্ট প্রহরের খিদে'টার খোঁজ রাখি আমি। সে এক বেয়াড়া সর্বনাশা খিদে। সর্বক্ষণের। জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ঘুমে জাগরণে। সারাজীবন প্রতিটি রাতে বাবুদের সামনে যুবতী প্রত্যঙ্গগুলো একে একে এগিয়ে দিতে দিতে ষষ্ঠীর মা হারিয়ে ফেলেছে, ষষ্ঠীর বাপটা কে। অথচ, সেই জ্ঞান হওয়া অবধি ষষ্ঠীর সব খিদেকে ছাড়িয়ে এই খিদেটাই চাগাড় দিয়ে ওঠে শতগুণ হয়ে। বাপ বিহনে কাঁধে চড়ে তুরকির মেলা দেখা হয়নি ছেলেবেলায়। বাপ-বিহনে, এই বয়েসেও কাউকে ঘরে আনতে পারলো না ও। সবাই বলে, 'উ শালা বেজন্মাকে কে মেয়া দিবেক্ হে? বাপের নাম জিগালে, শালা গাছের মগডালের দিকে ভুল ভুল চেইয়ে থাকে।'

হয়তো এই একটা কারণেই নিজের মাকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারে না ষষ্ঠী বাউরী।

লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলি, 'তাই যা। চলে যা কোথাও। যেখানে কাজ-কাম আছে। মা-বেটায় অন্ততঃ একবেলা পেট পুরে খেতে পাবি।'

'মা!' ষষ্ঠীর চোখে অসন্তোষ, 'উ কানি বুড়ীকে কে লিয়ে যাবেক আইজ্ঞা? আমি একলাই যাবো। কালই।'

'কালই?'

'হঁা' আইজ্ঞা কাল ভোরেই।'

সহসা বলে উঠি, 'আমি যাবো।'

'আপনি?' ষষ্ঠী বাউরী যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'আপনি কুথাকে যাবেন আইজ্ঞা?'

'যেদিকে দু'চোখ যায়।' আমি বিড়বিড় করে বলি, 'এখানে পুলিশের নজরে নজরে নিজের ঘরে চোরের মতো থাকা। আর সয় না। মায়ের মুখের পানে তাকাতে পারিনে আমি। এর চেয়ে চলে যাওয়া ভালো। চোখের আড়ালে, স্মৃতির আড়ালে। 'তাই চলুন আইজ্ঞা।' ষষ্ঠী বাউরী উচ্ছ্বসিত

হয়ে ওঠে, 'দু'জনে মিলে থাকবো কুথাও। খাটবো, খাবো। আপনি থাকলে বিদেশে সাহস হবে আমার।'

আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিই।

বলি, 'কাল ভোরে।'

৩. গতিশীল দেশ ও আমার মায়ের কাশি

সন্ধ্যেবেলা হ্যারিকেনের আলোয় খবরের কাগজ পড়ছিলাম। ভারত কারোর থেকে শক্তিতে কম নয়।

আমনে দ্বিগুণ উৎপাদন।

ভাষ্টবিনের খাদ্য নিয়ে প্রতিপক্ষ চতুষ্পদের সাথে লড়াইতে তিন শিশু গুরুতর আহত। সারাদেশে মহা সমারোহে শিশুদিবস পালিত।

সমাজবিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। বিশ্ববিখ্যাত চোরা-চালানকারী মগনলাল বলেছেন, দেশের কর্তৃপক্ষ চাইলে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। চিড়িয়াখানায় শীতের অতিথিদের সমারোহ। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে শৈত্যপ্রবাহে তেষট্টি জনের মৃত্যু।

ও ঘরে মা শুয়ে শুয়ে এক নাগাড়ে কাশছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি অনেকক্ষণ। ইদানিং মা এমনি কাশতে থাকেন যখন তখন। লতাপাতার রস খেয়ে দু'দিনের জন্য একটুখানি কমে। আবার বেড়ে যায়।

হেম ডাক্তার বলে, 'ক্ষয় রোগ। দীর্ঘকাল ধরে সুচিকিৎসা চাই।'

পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম মায়ের সামনে। কাশির দমকে চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুকখানা ওঠা-নামা করছে হাপরের মতো।

আমার দিকে অতিকষ্টে মুখ তুললেন মা। এবং আমি দেখলাম ওঁর ফ্যাকাসে গালে দু'খানি শুকিয়ে যাওয়া জলের রেখা, ভীষণ স্পষ্ট।

সহসা মনে পড়ে গেল, আমার বিরুদ্ধে পুলিশ আর মতিনবাবুর অভিযোগ : আমি নাকি বিষ্ণুপুর থেকে তালডাংরা জুড়ে গড়ে তুলেছি এক বিশাল উগ্রপন্থী ঘাঁটি।

বিষ্ণুপুর থেকে তালডাংরা। টাঁড় মাটি, ধুতমা ডাঙা, কালচে জংগল আর রোগা রোগা আদিবাসী গাঁ। চাঁপা আর ঢেপুরা খাল, 'পিলেন ঘাঁটির' লম্বা চাতাল, পিয়ার ডোবার ইস্টিশন আর কুষ্ঠ রোগীদের ব্যারাক। পুরো এলাকার মানচিত্রটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ছবির মতো।

অপরাধী গলায় মা'কে বলি, 'কাল আমি চলে যাচ্ছি এই এলাকা ছেড়ে।'

আমার দিকে ভাবলেশহীন চোখে চাইলেন মা কয়েক পলক। তারপর প্রবল বেগে কাশতে লাগলেন।

কেন্দ্রীয় গুদামে ইঁদুরের দৌরাত্ম

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। দরজায় মৃদু ঘা' পড়লো। দরজা খুলে দেখি থানার বড়বাবু। পেছনে তাঁর বাহিনী।

উদ্ধত বুটে ছন্দবদ্ধ আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকলেন বড়বাবু। নিঃসংকোচে, যেন তাঁর নিজের বাড়ীতেই ঢুকছেন। দরজার মুখে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে রইলো দু'জন সেপাই।

বড়বাবু প্রথমেই হাত দিলেন আমার কোমরে। পাঁকের মধ্যে যেমন করে শোলমাছ খোঁজে জেলেরা, তেমনি করে টিপে টুপে দেখলেন, কোনও অস্ত্রসস্ত্র লুকোনো রয়েছে কিনা। তাঁর দু'হাতের দশ আঙুল অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালো আমার তলপেট, লিঙ্গ এবং অন্ডকোষের চারপাশে। আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খানিকবাদে আমাকে ছেড়েদিলেন বড়বাবু। আলুথালু তোলপাড় করতে লাগলেন আমার বাক্স-তোরঙ্গ, দেওয়ালের তাক। খাটের থেকে তোষক তুলে ছুঁড়ে দিলেন মেঝেয়। বালিশের খোলে হাত ঢুকিয়ে পরখ করলেন। একে একে জলের কুঁজো, পায়ের জুতো, বইপত্তর, খবরের কাগজ সবকিছু আঁতিপাঁতি পরখ করতে লাগলেন তিনি।

সহসা পাশের ঘর থেকে কাশির আওয়াজ ভেসে এলো। ভীষণ চমকে উঠলেন বড়বাবু। সেপাই দুটো পলকের মধ্যে বন্দুক তাক করে ধরলো ওই দরজার দিকে।

'কাশে কে?'

'আমার মা।'

সন্দেহের চোখে তাকালেন বড়বাবু।

'আর কেউ নেই তো?'

আমি মাথা নাড়ি।

খবরের কাগজগুলো এলোপাতাড়ি নাড়াচাড়া করছিলেন বড়বাবু।

বললেন, 'এসেছিলুম এদিকে একটা কাজে। ভাবলুম, একটিবার ঢুঁ মেরে যাই। শুনছি নাকি খুব মিটিং শুরু করেছো লেবারদের নিয়ে! সত্যি?'—বলতে বলতে খবর কাগজের একটি জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল বড়বাবুর।

কেন্দ্রীয় গুদামে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য…

খবরটার তলায় লাল কালির দাগ দিয়েছিলাম আমি। খবরটা খুব রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল আমার কাছে। ভুরু কুঁচকে উঠেছে বড়বাবুর। আমার দিকে কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'এই কাগজটা আমি বাজেয়াপ্ত করলাম।' কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন বড়বাবু। ঠিক সেই সময়ে বাইরে গর্জে উঠলো মোটরের ইঞ্জিন। চমকে দরজার দিকে লাফ মারলেন বড়বাবু, 'কার গাড়ি এটা?'

'মতিনবাবুর।' আমি নিস্তরঙ্গ গলায় জবাব দিই, 'ওর চোরাই চালের ট্রাক রওনা দিচ্ছে কোলকাতায়।'

'ও—' নিশ্চিন্ত হলেন বড়বাবু। ছুটন্ত সেপাইরাও দুলকি চালে ফিরে এলো হাসতে হাসতে। বড়বাবু চৌকাঠ পেরোতে পেরোতে বললেন, 'চললুম। গুড বয়'টি হয়ে থাকবে। একটুখানি বেগড়বাই দেখলে, ডানাটি একেবারে ছেঁটে দোব।'

বড়বাবু দলবল নিয়ে চলে গেলেন।

আমি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মতো।

একটু বাদেই দরজার মুখে ষষ্ঠী বাউরীকে দেখা গেল। তার কাঁধে একখানা শীর্ণকায় পুঁটলি। বললো, 'চলুন আইজ্ঞা। ভোর ভোর রওনা দিলে কষ্টটা কম হবেক্ রাস্তায়।'

আমি নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগলাম ষষ্ঠীর কথাগুলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ষষ্ঠী বাউরী! সন্দেহের ছায়া পড়লো চোখে।

'আপনি তিয়ার হন নাই ইখনো?'

পাশের ঘর থেকে একনাগাড়ে কাশির আওয়াজ শুনছিলাম আমি। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ষষ্ঠী বাউরীর দিকে। ওর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বললাম, 'কোথায় যাবি রে ষষ্ঠী? মা'কে ছেড়ে কোন বিভুঁইয়ে যাবি? তার বুকে আমরা যে বেঁচে আছি আজন্মের শেকড়-বাকড় ছাড়িয়ে। প্রজন্ম ধরে তার হাড়ে-পাঁজরায়, রক্তে-মজ্জায়, তার মাটিতে, আকাশে, আলোয়, হাওয়ায়—।'

ষষ্ঠী বাউরী আমার কথাগুলো পুরোপুরি বুঝলো কিনা কে জানে!

বললো, 'এদেশে থাকলে একদিন নির্ঘাৎ মইরে যাবো আইজ্ঞা।'

'না, মরবো না।' আমি প্রগাঢ় আস্থায় উচ্চারণ করি, 'ঘরে ফিরে যা তুই। সব্বাইকে খবর দে। আজ রাতে কাওয়াশোলের জংগলে মিটিং হবে।'

কাঁচা সোনায় সুন্দরবাবুর বাগানে

অজিতেশ ভট্টাচার্য

হারিয়ে যাবার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। স্বস্তি। মুক্তিও বলা যেতে পারে। অবিনাশ বহুদিন মনে মনে এই মুহূর্তটি খুঁজেছে। সুন্দরবাবুর বাগানে আকাশ থেকে যেন টুক করে খসে পড়লো। ছোটবেলায় আত্রেয়ীর তীরে ঘুরে ঘুরে এই আনন্দের ছোঁয়া বারবার পেয়েছে। ভুলে গিয়েছিল সেই দিনগুলি। সুন্দরবাবুর বাগান আবার ফিরিয়ে দিল।

—ও অবুদা, বেলা হলো যে, বাড়ী ফিরবে না? মঞ্জুরী তাড়া দেয়, মাঠ ভেঙে অনেকটা পথ যেতে হবে কিন্তু। আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

অবিনাশ কাঁঠাল গাছের ঘন পাতার ফাঁকে আকাশ খোঁজার চেষ্টা করে। ঊর্ধ্বমুখ অবস্থাতেই বলে, তোদের গ্রামের নাম কি যেন, কাঁচাসোনা?

মঞ্জুরী খিল্ খিল্ করে হাসে। ওর তরুণ-গলা এই পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে যায়। অবিনাশ চেষ্টা করলেও এরকম আর হাসতে পারবে না।

—তুমি যেন কি? সব কিম্ভূত প্রশ্ন। কাল সন্ধ্যায় বললে, তোদের গ্রামের জল এত মিষ্টি কেন রে।

—মিষ্টি নয়? অবিনাশ যেন মর্মাহত।

—হাতি! নাও, চলো, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

প্রথম দু'দিন অবিনাশ শুধু ঘুমিয়েছে। কাকা বাইরের কাজে ব্যস্ত, কাকিমা ঘরের। কথা বলার লোক একজনই—মঞ্জুরী। কাকীমা প্রথম দিনেই বলেছে, সতেরোয় পড়েছে। এবার পাত্র খুঁজতে বলো বড় ভাসুরকে। গ্রামে ছেলে কোথায়?

—আচ্ছা, ক'দিন ঘুমোও নি, বলো তো ? মঞ্জুরী প্রশ্ন করে।
—কোলকাতায় কারো ঘুম হয় না। ট্রাম-বাস-রেলের শব্দ-ধোঁয়া-মিছিল-স্লোগান—বুঝলি তো, এক রণক্ষেত্র !
—যাঃ ! মঞ্জুরী ছোট্ট করে ধমক দেয়, তুমি যা-তা বললেই আমি বিশ্বাস করবো, না ?
তারপর আবদার করে, অবুদা, আমায় একবার কোলকাতা নিয়ে যাবে ?
অবিনাশ চোখ পাকিয়ে রীতিমত ধমক দেয় খবরদার ! কোলকাতা যাবার কথা মুখে আনবি না !
—ওমা ! কি কথা !
—একবার কোলকাতায় পা রাখলে এই হাসি আর জীবনে হাসতে পারবে না।
—যা। তোমার শুধু ঠাট্টা। তারপর আনুনাসিক গলা ছেড়ে দিয়ে মঞ্জুরী হঠাৎ গম্ভীর হয়—তুমি না নিলে কি ! দ্যাখো, আমি একদিন কোলকাতা যাবোই।

সুন্দরবাবুর বাগান থেকে ফেরার পথে অবিনাশ আবার ভয়ানক কৌতূহলী হ'য়ে উঠে—মঞ্জুরী, এই মাঠে চাষ হয় ?
—কেন হবে না ?
—মানে, ধান ! অনেক ধান। শত শত বিঘা। কি বলিস্ ? আর ধান থেকেই চাল।
—আজ্ঞে হ্যাঁ ! আর সেই চাল যাবে তোমাদের কোলকাতায়। নাও দাঁড়িয়ে থেকোনা। হাঁটতে হাঁটতে যা মনে আসে প্রশ্ন করো। আমি সব উত্তর দেবো।

—অবিনাশ আলের উপর দিয়ে হাঁটে। টাল মাটাল পায়ে। যে কোন সময় আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা।
—মঞ্জুরী তোর তো খুব অহংকার ! সব প্রশ্নের উত্তর তুই জানিস ?

সমান গলায় মঞ্জুরী উত্তর দেয়, কেন জানবো না ? তুমি তাল গাছ দেখিয়ে প্রশ্ন করবে, মঞ্জুরী, এটা কি তাল গাছ ? আমি বলবো, হ্যাঁ, তাল গাছ। তারপর তুমি জিজ্ঞেস করবে, খুব উঁচু, তাই না রে ? আমি বলবো, হ্যাঁ, খুব উঁচু। এই তো !

তখনই অবিনাশ হোঁচট খেলো। এবং উপুড় হ'য়ে পড়লো সোজা। চোখে দেখেও মঞ্জুরীর বিশ্বাস হয় না। এইভাবে কেউ পড়ে ? তারপর ছুটে

গিয়ে অবিনাশকে তোলার চেষ্টা করে। অবিনাশ উঠে বসে। হাঁটু ছড়ে গেছে। মুখে ধুলোমাটি। কনুইতেও চোট লেগেছে। অবিনাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখে।

মঞ্জুরীর আর ধৈর্য নেই। যা মুখে আসে, তাই বলে। ভয় শ্রদ্ধা সমীহ সব চলে গেছে। ছোট হলে আচ্ছা করে দুই গালে দুটো চড় বসাতো।

অবিনাশ নিঃশব্দে হাঁটে। একটু পরে মঞ্জুরীর কেমন কান্না পায়। রাগ হাসি কান্না—সব কিছু বড় তাড়াতাড়ি আসে তার মধ্যে।

দিন সাতেক পর ছোট কাকার যেন খেয়াল হয়—হিসেব তো কিছুই দেখলি না। মহীতোষ কিন্তু দু'দিনের মধ্যে সব বুঝে নিয়েছিল। অবিনাশ ধামায় এক গাদা মুড়ি নিয়েছিল, আর নাড়কেল। খুব উৎসাহের সঙ্গে খাচ্ছে। সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললে, কাকা, সকালে উঠে মনে হচ্ছিল পুরো গ্রামটাই সুন্দরবাবুর বাগান। বিউটিফুল। কোলকাতায় এত সকালে আমরা উঠি না।

তারপর খুড়ো ভাইপোতে গ্রামের গল্প হয়। শেষে প্রশ্নটা এসে পড়ে, বড়দা লিখেছে, তোর নাকি অফিসে ছুটি পাওনা নেই, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই ফিরে যাবি।

অবিনাশ চোখ বুজে ফেলে, অফিসটা জঙ্গল। বাঘ সাপ কুমির মাকড়সায় ভর্তি। সব ওৎ পেতে বসে আছে। একবার নাগালের মধ্যে এসে গেলে আর রক্ষা নেই।

মঞ্জুরী পেছন দিক থেকে বাবাকে ঠেলা দেয়—সাত দিন ধরেই এরকম হেঁয়ালিতে কথা বলে যাচ্ছে, অবুদা। বাবা, আমার কিন্তু ভয় করে। তুমি ওকে কোলকাতায় জেঠুমণির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিকেলে ঘুরে এসে অবিনাশ ঘোষণা করলো আমি চাকরী ছেড়ে দিলাম। কাকার সঙ্গে গ্রামে থাকবো। নিজের হাতে চাষ আবাদ করবো।

মঞ্জুরীর মা হাসে, তা'হলে তো ভালোই হয়, বাবা। তুমি তো আমাদেরই ছেলে। বুড়ো বয়সে কাকার হাড়ে তাহলে একটু বাতাস লাগে।

মঞ্জুরী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ফোঁড়ন কাটে, তোমাদের যতো কথাবার্তা। কোলকাতার অফিসবাবু কাঁচা সোনায় হালচাষ করবে? সুন্দরবাবুর বাগানে হাওয়া খাবে? কেন, জেঠুমণির বেলেঘাটার তিনতলা বাড়ীতে দু'ছেলের কুলুবে না? আমার মতো মেয়ে তো নেই, যে ভাগ বসাবে?

অবিনাশ গভীর রাতে জাগে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। এই সব রাতে গ্রামে

ডাকাতি হয়। কাকার বন্দুক আছে। ডাকাতের ভয় আছে, তেমনি তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতিও আছে। কিন্তু অবিনাশ আক্রান্ত হয়েছিল অতর্কিতে। আত্মরক্ষা করতে পারেনি। যেখানে ডিলিং ক্লার্ক, যেখানে বড়বাবু, যেখানে বস্ স্বয়ং—তুমি কোন্ বড়লাট, কোন্ বিবেকানন্দ! টাকা নেবে না, মানে? আবগারী দারোগা তোমার বাবার তো অঢেল টাকা, তবু গ্রামের ভাগের সামান্য পাওনা না পেলে মন ভরে না! তাই না?

যাবার সময় মঞ্জুরী লুকিয়ে পড়েছিল। কাকীমা বললে, পাগলি মেয়ে। দাদা কি জিনিস্, এবার জানতে পেরেছে। সহ্য করতে পারবে না, তাই পালিয়ে গেছে। ছুটি ছাটায় মাঝেমধ্যে এসো, বাবা। কাকা-কাকীমাদের নির্বাসনে ফেলে রেখো না। বোন্‌টার কথাও মনে রেখো।

অবিনাশ হেঁট হয়ে প্রণাম করে। মনে মনে ভাবে কাকীমার পায়ের তলায় কিন্তু কাঁচা সোনার ধুলো আছে। কিছু নিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো।

মুখে বলে, তীর্থে কি বারবার আসা যায়, কাকীমা? কাকীমা বলে, ঠিকই তো, বাপ্ ঠাকুর্দার জন্মস্থান তো তীর্থই।

লাইনের বাস দশ মিনিট দেরী করে আসে। এক ঘণ্টায় নিয়ে যাবে সদরে। সেখান থেকে এক্সপ্রেস বাসে দশ ঘণ্টায় কোলকাতা।

ধীরে ধীরে অবিনাশের বোধোদয় হতে থাকে। বড় জোর বারো ঘণ্টা। ফেলে আসা ঘেরাটোপে ঢুকে পড়তে না পারলে তার অস্তিত্বের সংকট। জীবন-মরণ সমস্যা। এগার নম্বর সিটে হেলান দিয়ে অবিনাশ ভাবে, মানুষ বাঁচে কেন?

বৃষ্টি ছিল না

অমর মিত্র

সুলোচনা মাঝ রাত্তিরে উঠে মাকে বলল, 'আমার সব্বোনাশ হ'ই গি'ইছে মা।'

ঘুম ভাঙল মায়ের। মেয়ে তার গা ধরে ঝাঁকাচ্ছিল। মা দেখল ঘরে কুপি জ্বালিয়েছে মেয়ে। কুপির লালচে আলো মেয়ের মুখের উপর কাঁপছে। পিছনের দেয়ালে ছায়া, সে ছায়াও স্থির নয়। মায়ের সন্দেহ হচ্ছিল ক'দিন ধরে। বিধবা মেয়ের মুখে যেন আষাঢ়ের মেঘ। হতেই পারে, এখনো যে মেয়ে সময়ে অসময়ে তার মরা স্বামীর জন্য কাঁদে। এই আষাঢ়ে বছর ঘুরল বিয়ের। আগের আষাঢ়ে এর বিয়ে দিয়েছিল তিন বিঘে জমি বিক্রি ক'রে। জোয়ান মরদ, খাটে খোটে, পাঁচ ভাইয়ে একান্ন, চাষ বাস আছে যা হোক। তিনমাস না যেতেই আশ্বিন মাসে তিনদিনের জ্বরে মায়ের জামাই চোখ বুজল। মেয়ে শাঁখা সিঁদুর ফেলে এসে উঠল আবার মায়ের ঘরে।

মা মেয়ের মুখের দিকে তাকালো গভীর সন্দেহ নিয়ে, তারপর বলে উঠল, 'কী করেছিস সব্বোনাশী, তুই যে বেধবা।'

সন্দেহ সত্য হলো। মেয়ে চোখ নামাল, মাথা নামাল। মায়ের চোখ ঘোরে মেয়ের উপর, হাতটা হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে মেয়ের তলপেট ছোঁয়। ছুঁয়েই কাঁপুনি টের পায় মা, মেয়ের সর্বাঙ্গ কাঁপছে। সেই কাঁপুনি মায়ের দেহেও সঞ্চারিত হয়। চোখ জ্বলে ওঠে মায়ের, মেয়ে তো নয় সর্বনাশীই বটে। জন্মের এক বছরের মাথায় বাপকে খেয়েছিল, বিয়ের তিনমাসের মাথায় স্বামী। ওর রূপ তো নয়, জ্বলন্ত অঙ্গার। শ্বশুর ঘর ছাড়তে হয়েছে ওই রূপের জন্য। দেওর ভাসুরে টানাটানি আরম্ভ করেছিল শোনা যায় বিধবা ভাই বউকে। ফলে জায়গা হলোনা সেখানে। তাদের বউরা তাড়িয়েছে ওকে। না তাড়ালে তাদের কপাল পুড়ত এই সব্বোনাশীর জন্য।

মা জ্বলে উঠল ভিতবে, হাত বাড়িয়ে মেযেব চুলেব মুঠি ধবল, 'মবা সোযামীব কথা মনে কবেও ঠিক থাকত্যা পাবলিনে ....।'

মেযেব মাথা উঠল না।

মা হাঁপাচ্ছে, মেযেব চুল ছেড়ে জিজ্ঞেস কবল, কে?

মেযে মাথা তুলল। ক্ষুদি পালেব ছেলে বিনু পাল।

মাযেব মাথা একদিকে ঢলে গেল। গা সিব সিব কবে উঠল। মা মেযেব দিন চলেনা এমনিতে। মেযেব বিযেব সময মা সর্বস্বান্ত হয়েছে প্রায। তিন বিঘে জমি চলে গিযে আছে বিঘে খানেক, পাহাড়েব কোলে। মেযে বিধবা হযে ফিবে আসাব পব কাজে দিযেছে ক্ষুদি পালেব বাড়ি। ক্ষুদি পাল বেঁচে নেই তাব ছেলে বিনোদ পাল আছে সে বড মদ ব্যবসাযী, এম আব ডিলাবও বটে।

মা বলল, তুই তাহলে মব।

মেযে মাথা ঝাঁকায, ধবা গলায বলে, মোব দোষ নাই।

—দোষ নাই! মা হিস হিস কবে, তোব বযসী আব কোন মেযে কাজ কবেনা লোকেব বাড়ি?

মেযে মাথা নামায।

মা বলল, নিজেব সব্বোনাশ নিজে এমনভাবে কবে!

মেযেব মুখে জবাব নেই। নিজেব সর্বনাশ নিজে কবেনি সে, হযে গেছে। তাকে বাধ্য কবেছে। সে নিজে কি কববে। শ্বশুব ঘব ভাসুব হলো গুরুজন, তাবাও যদি—। সে তো কাবোব পা ছাড়া মুখেব দিকে তাকিযে কথা বলত না কখনো। বিনোদ পালেব বউ ঘবে আছে ছেলে আছে চাব বছবেব, মেযে দু বছরেব। তবু সে তো ছাড়েনি তাকে। চৈতি মাসেব দুপুবে যখন পশ্চিমী হাওযা সবে ঢুকতে শুরু কবেছে এইসব এলাকায়, সেই হাওযাব সঙ্গে তাকে টেনে নিযে ঢুকিযে দিল তাব দোকান ঘবে। সব্বোনাশ কবে কুড়িটি টাকা তাব হাতে ধবিয়ে দিযে বলেছিল আবাব আসবি আবার দিবো।

ছয বাবে ছয কুড়ি নিযে শেষ পর্যন্ত যে তাব এমন সব্বোনাশ হযে যাবে কে জানত! ভয ছিল, কিন্তু সে বলেছিল, ভয় নাই, তেমন হলে আমি আছি!

কিন্তু সে এখন আব তাব পিছনে নেই। ক'দিন আগে যখন বিনোদ পালের কাছে গিযে কেঁদে বলল, আমাব কি হব্যা?

সে বলেছিল, খালাস হ।

—টাকা!

—টাকা কিসেব, মোবগা পাহাড়েব ধাবে সাঁওতাল পাড়ায যা, বিশ পঁচিশ

লাগবে হয়ত, দেয়া যাবে, উখেনে এক বুড়ি আছে।

কিন্তু কোথায় সেই বুড়ি লক্ষ্মী বেওয়া। সাঁওতাল মেঝেন লক্ষ্মী বেওয়ার যশ ছিল এ ব্যাপারে খুব। মোরগা পাহাড়ের কোলে সেই সাঁওতাল গ্রামে আজ দুপুরে মেয়ে গিয়েছিল একা একা। মাথায় শেষ আষাঢ়ের দম বন্ধ আকাশ। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ধুলোর উপর ঘামাচির মত বিজবিজে বিন্দু তুলে মাটির তৃষ্ণা বাড়িয়ে উধাও হয়ে গেছে মহাশূন্যে। বৃষ্টিহীন পথে তিন মাইল হেঁটে মোরগা পাহাড়ের কোলে সেই সাঁওতাল গাঁয়ে গিয়ে লক্ষ্মী মেঝেন এর খোঁজ করতে বউ ঝিরা মুখ টিপে হেসেছিল তার দিকে চেয়ে। সন্দেহ করে বারবার তাকে জরিপ করছিল, তারপর একযোগে বলেছিল, 'সে নাই, মরি গিছে বোশাখ্‌খো মাসে।'

লক্ষ্মী মেঝেন মারা গেছে যখন, তখন আর উপায় নেই। শোনা যায় ছ'মাসের পোয়াতির গর্ভনাশও করাতে পারত সে। সে গেছে তো সুলোচনার সর্বনাশ। যাবে কোথায় এখন। ফিরেছিল আবার বিনোদ পালের দোকানে। সে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে।

মা বলল, ইবার তুকে গাঁ থিকে তাড়াই দিবে, সে লক্ষ্মী মেঝেন যখন নাই, তুর সরম থাকবেক নাই।

মেয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, হাসপাতাল।

মা বলল, মর মর তুই, হা ভগবান ইরে কি পেটে ধরেছিলাম আমি, কত ঘরে তো মেয়ে আছে।

মেয়ের চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। তার রূপটা তো এ গাঁয়ে আর কারোর নেই। ভাবে বলে, যার রূপ নেই সে খুব সতী। তার ভিতরে ক্রোধ জন্মালো মায়ের উপর। মাকে যেন দুই চোখ দিয়ে দগ্ধাতে লাগল সে।

মা বলল, তুর ইমন হয় বেনে, জন্মালি বাপ খেলি, বেহা হলো স্বামী খেলি, মেয়েমানুষের প্রথম সন্তান তারেও খাবি কপালে সাউর ঘব টেকে না, তু কি ডাইন, ও শয়তানি!

মেয়ে কেঁপে উঠল থর থর। চোখের আগুন নিভে গেল ঝপ করে। ভয় পেল সুলোচনা। ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরল এক হাত দিয়ে। অন্য হাতে মুখ চাপা দিল মায়ের।

২.

পরদিন মা বুড়ি গেল। খোঁজ নিতে গেল শুকনো মাঠ পাহাড় ভেঙে ছ' মাইল দূরে হাসপাতালে। মেয়েকে ব'লে গেল, 'তুই ঘরে থাক, মু খোঁজ

নিয়ে আস, বেবস্থা তো করতে হবেক।'

মেয়ে থাকল ঘরে। শুয়ে থাকল শুকনো মেঝেয়। বাইরে রোদ নেই, গুমোট। অন্ধকার অন্ধকার ভাব, না দিন না সন্ধ্যা। মেয়ে ভাবছিল আগের আষাঢ়ে সেই জোয়ান পুরুষটার সঙ্গে যখন এই সময় বিয়ে, তখন বৃষ্টি নেমেছিল আকাশ ভেঙে। কী বৃষ্টি আর কী বৃষ্টি! প্রথম রাতে ঘর ভেসে গিয়েছিল জলে। তারা বিছানা নিয়ে এদিকে সরে ওদিকে সরে—! আর এই আষাঢ়! সুলোচনার দুচোখে বাষ্প জমা হয়। জল বেরোতে বেরোতেও বেরোয় না।

ক্ষুদি পালের ছেলে বিনোদ পালের নজর ছিল তার উপরে অনেকদিন। সেই বিয়ের আগে থেকেই। নতুন বিয়ের পর যখন সে স্বামী সঙ্গ পেয়ে থৈ থৈ, দিন কয়েকের জন্য যখন সে এসেছিল মায়ের ঘরে, সেই সময়ে একদিন—! খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছিল সুলোচনা। পাহাড়ের দিকে তাকে একা পেয়ে গিয়েছিল বিনোদ পাল। আজ মনে হয় সব্বোনাশটা সেদিন হয়ে গেলেই মা বেঁচে যেত, সেও। গলায় রশি বেঁধে ঝুলে পড়ত পাহাড়ের ধারে বনের ভিতরে।

বিকেল বিকেল মা ফেরে, মায়ের মুখে ঘন মেঘ ধুলোয় ভরা দেহ। ঘরে ফিরে পা ছড়িয়ে মা বুড়ি বলে, জল দে।

জল দিল মেয়ে।

বুড়ি কপালে হাত দিল, যখন মেয়ে পেটে আসে, ঘরে তার বাপ, এবেলা ওবেলা খাটে, সংসারটা সুখের হলো ভাবলাম, তা গেল। কপালে মোর সুখ নাই, দিলাম মেয়ের বিয়ে, তিন বিঘে জমি বেচে এক বিঘে রেখে, নাতি হবে নাতিন হবে, জুয়ান জামাই, পোয়াতি মেয়ে—আহা এর চেয়ে সুখ কোথায় হবে। জামাইঘরে গিয়ে থাকবো, নাতি নাতিন নাচাবো—সে জামাই গেল। জামাই গেল মেয়ে হলো পোয়াতি। পোয়াতি মেয়ে দেখে বুকে এল ভয়, ছ মাইল ছ মাইল আসা যাওয়া করতে হলো হাসপাতাল, কেন? না, নাতি নাতিন যেন না জন্মায়। এমন কপাল কার?

মায়ের কান্নায়ও মেয়ের চোখে জল আসে না।

মা বলল, পাঁচশো টাকা লাগব্যা বুললো ডাগদার।

মেয়ে স্তম্ভিত।

মা বলল যে জমিন আছে তা বিকে দিবো।

শিউরে উঠল মেয়ে, ওই জমিই তো তাদের অন্ন দেয়।

মা বলল, পথে ক্ষুদি পালের বেটার সঙ্গে দেখা।

উৎকর্ণ হলো সুলোচনা।

—সে বুললো, লক্ষ্মী মেঝেন বাঁচি থাকলে চিন্তা ছিল নাই, যা হোক, জমিন বিকে দাও, মু কিনে লিবো।

—তুই কুছু বুললি না। এতক্ষণে মেয়ের মুখে কথা।

—উ শুনলো নাই, মোটর সাইকিলে ধুঁয়া উড়াই চলি গেল।

মা মেয়ে চুপ করে বসে থাকল। বুড়ি গরমে বুকের কাপড় ফেলে আঁচড়াতে লাগল দু'হাতে। গা ভর্তি ঘামাচি। ঘামাচি মারতে মারতে বলল, মু তো কম বয়সে স্বামী হাঁরাইছিলাম, কিন্তু বেপথে যাই নাই, উ বিনু পালের বাপ ক্ষুদি পাল কম চেষ্টা করিছে।

মেয়ে কিছু বলল না প্রথমে, তারপর তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল, তখন তো লক্ষ্মী মেঝেন বাঁচি ছিল।

মা থরথর করে কাঁপল, পয়সা নাই, গরীব ঘরের মেয়্যাছেল্যার ভাল থাকা কঠিন, কঠিন বটে।

মেয়ে ধরল মায়ের হাত, তুমারও তো রূপ ছিল মা।

মা মাথা কাত করল, হাঁ, গরীব ঘরে রূপ না থাকল্যাই ভাল, রূপ যৈবন।

মা মেয়ে সে রাতে কেউ কিছু খেল না। আষাঢ় মাসের রাত্রি, আকাশে পাতলা জলহীন মেঘের স্তর ধুলো ময়লার মত লেগে। তারা দেখা যায় না, চাঁদ নেই। রাতে মা একবার শুধু বলল, ইবার ইখেন থিকে উঠি যাব, উঠি যাব ঠিক, উ লক্ষ্মী মেঝেন নাই, মেয়্যামানুষের কলংক ঘুচাবার উপায় নাই, সব চান্দের দশা, পুরুষ গুলান তো সেইরকমই আচ্ছ্যা বটেক।

রাত বাড়ে।

৩.

জমি বিক্রি হয়ে গেল খুব গোপনে। গোপন তো করতেই হবে নাহলে আষাঢ় মাসে জমিন বিক্রি, এমন তো কোন চল নাই। আর মা মেয়ে হঠাৎ জমিন বিক্রিই বা করবে কেন? গাঁয়ে যারা কলংক দেয়, তারাই আবার রটায়।

জমি কিনল বিনোদ পাল। সে না কিনলে সব চাউর হয়ে যেত। মা মেয়ের সঙ্গে নিজের ধম্মোও রক্ষা করল সে। দশজনের কাছে ছোট কেন, দশজনে কানাকানি করবে।

জমি পাহাড়ের কোলে। বর্ষা নামলে পাহাড় ধোয়া জল আসে তাই চাষ হয় ভাল। এবারে জল নেই আকাশে, দুর্বল মেঘ। মা মেয়ে দুর্বল মেঘের নিচ দিয়ে চলে হাসপাতালে। উঁচু নিচু, চড়াই উৎরাই ভেঙে যেতে যেতে মা

বুড়ি দাঁড়ালো, 'তুর বাপের সব চিহ্ন হাঁরাই গেল. জমিনটো তবু ছিল বটেক।'

মেয়ে মাকে দেখল. বলল না কিছু।

মা ভেবেছিল মেয়ে কাঁদবে, হা হুতাশ করবে তাবই মত তার সঙ্গে, কিন্তু তা না দেখে জবলে উঠল যেন, 'তু হচ্ছিস কাল সাপ খেতেই আসছিস বটেক, তুব চোকে কি জল নাই'।

মেয়ে চুপ।

—অহ্. খেঁত তুব ভাল লাগে জমিন চলি গেল, ইহাতেও কুনো কষ্ট নাই।

মেযে আর নিজেকে চেপে বাখতে পারল না, তাব এক চোখে আর্দ্র বাষ্প, অন্য চোখে আগুনের ধোঁয়া. সে গর্জে উঠল, 'কিনছে তো উ শযতান. ক্ষুদি পালেব বেটা, উহাতে ফসল হবেক নাই।'

মা তাকাল মেযেব দিকে, বুললেই হবে. তু বুললেই হবে?

—হাঁ হবে, ফসল সব খাই নিলাম, খেঁত এসেছি না।

মা বলল, আসছিসই তো, তু বাপ খাকী, ভাতার খাকী, জমিন খাকী, পুত খাকী—

মেয়ে বলল. ফসল খাকী, মেঘ খাকী, বৃষ্টি হবেক নাই, ফসলও না, উ মা, মুখ ভিতবে ডান আসছ্যা গো·· ।

মেয়ের চুলেব খোপা ভেঙে গিয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছে পিঠময। তেলহীন রুখু চুল. গোড়ার দিকে জটও লেগেছে যেন। জট মানে—! মা মেযেকে নিবিষ্ট হয়ে দ্যাখে। হ্যাঁ ঠিক এই রকমই দেখেছিল যেন কাল মধ্যবাতে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে মা দেখেছিল মেযে তাব পাশে নেই। মুহূর্তে মায়ের ভয় হয়েছিল, মরবে না তো! না মরেনি সে, উঠোনে দাঁড়িয়েছিল একা, এমনিভাবে চুল ছেড়ে। হাঁ করে চেয়েছিল আকাশের দিকে। অনেকক্ষণ, বহুক্ষণ। তাবপব নিজে নিজেই ফিরে এসেছিল ঘরে। ও বোধ হয় সত্যি কথা বলছে। মা ভয় পেল আবার দিনের আলোর ভিতরে। মেয়ে কি ডাইন হয়ে গেল, সত্যি!

সুলোচনা বলল, বিনোদ পাল বেহাই পাবেক নাই।

মা ভয় পেয়ে স'রে গেল। দেখল মেয়ের দেহে যেন যৌবনেব বান ডেকেছে। দপদপ করছে চৈতিমাসের আগুন। তামাটে রঙ, কালো চোখ, কোমলে পাথরে দুটি পাহাড়ের মত বুক, সরু কোমর, ভারি দেহ—মেয়ে চলেছে যেন, স্বামী সঙ্গ আকুল অন্য মেয়েরা যেমন যায়। লাজ নাই সরম নাই, দুঃখ নাই কষ্ট নাই. চোখে জল নাই এক ফোঁটা।

মা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, ও সুলো, তুই বিছুটের পাস?

মেয়ে চমকে পেটে হাত দেয়, না, না।

—ও কথা লয়, অন্য কিছু?

—কি!

মা বলতে পারল না। মা বলতে চাইছিল, কাল রাতে যেমন দেখেছে মেয়েকে অন্ধকার উঠোনে তা জড়িয়ে, মেয়ের এখনকার কথা জড়িয়ে সন্দেহ…., মেয়ে তো আর নিজের ভিতরে নাই।

মেয়ে মায়ের চোখে চোখ রাখল। আস্তে আস্তে বুঝল মায়ের সন্দেহ। তার ইচ্ছে হয় বই কি! হয়! সব ইচ্ছে হয়। সব গিলে খেযে নিতে, পেটে এটা আসার পর থেকেই এমন হচ্ছে। ভাবতেই মেয়ে কাঁপল। খেতে ইচ্ছে হয় বলেই কি সে হাসপাতাল যাচ্ছে নিজের ভিতরেরটাকে খেতে। তার ভিতরের আগুন আর ক্ষুধা দুইই যেন মিলেমিশে গেছে। ভাবতেই তার দেহে যেন নদী বইল খরার দেশে, ভিতরে বর্ষণ শুরু হলো। মেয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ডাকল, ও মা!

—কি!

—মু হাসপাতাল যাব নাই।

—যাবি নাই; সে কি! মা অবাক হলো।

—গেলে মু ডাইন হঁই যাব, মু যাব না।

—তবে! মা ধরল মেয়েকে।

মেয়ে বসে পড়ল পাহাড়ের কোলে, 'বসি মা, যে আসছ্যা আসুক না কেনে, কদ্দিন বাঁচত্যা হবেক, একা যে ভয় লাগে।'

—নষ্ট করবি নাই!

—না! মেয়ে এই প্রথম কাঁদল, 'সত্যি তো ইচ্ছে করেনা মা, তুমি যতই বলনা কেনে, আমি ফসল খাবো না, মেঘ খাবো না, পেটেরটাকেও না।'

সুলোচনা কিন্তু বিনোদ পালের নাম করল না। ঝরঝর ক'রে কাঁদতে লাগল পাহাড়ের কোলে ব'সে। তার পেটে তখন প্রাণ ন'ড়ে উঠল। আকাশে মেঘের ভিতরেও এল চঞ্চলতা। পাহাড়ের দেশে বৃষ্টি নামল বহুদিন পরে।

ফাইল

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

টিলার ঠিক ওপরে চিলটা উড়ছে। যেন ভীষণ অস্থির। বসছে না। দুই ডানা মেলে রয়েছে বাতাসে। দূর থেকে দেখলে উড়ন্ত ছোট ছাতা মনে হয়।

ড্রাইভারের পাশে বসে স্পীডোমিটারের কাঁটার দিকে চোখ রাখছিল সে। ৪০ কিঃ মিঃ....৫০....৬০...। ক্রমে ৬০ ও প্রায় পেরিয়ে যায়। দু-পাশে অনুর্বর, পাথুরে জমির মাঝখান দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেছে সোজা রাস্তা। এক দীর্ঘ, সমাপ্তিহীন, ময়াল সাপের পিচ্ছিল পিঠ। হাওয়ার ঝাপটা। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চুল। সমতল পাথুরে জমি যেন হঠাৎ বেখেয়ালে উঁচু হয়ে ছোটো ছোটো টিলার আকার নিয়েছে। কমলপুর নামে যে গ্রামটিতে যেতে হ'বে সেটির এগ্‌জ্যাক্ট লোকেসান্‌ ড্রাইভারেরও ঠিক জানা নেই। আশেপাশের পথচলতি মানুষকে জিগ্যেস ক'রে যেতে হবে।

গতকাল তার টেবিলে টাইপ-করা অর্ডার-সারকুলারটি এল। দেখেই বিরক্ত হ'য়েছিলো সে। একি ছুটির দিনেও কাজ? আজ যে ছুটির দিন সেটা ভেবেই সে মোটামুটি ঠিক ক'রে নিয়েছিলো কিভাবে কাটাবে অবসর। সকালে বেলা ক'রে ঘুম ভাঙার পরও বাসি মুখে সিগারেট ধরিয়ে ঘরের সিলিং-এর দিকে আনমনে তাকিয়ে দীর্ঘ আলসেমির পর ভেবেছিলো খাওয়া-দাওয়ার পর গোটা দুপুর আর বিকেল না ঘুমিয়ে পড়ে শেষ করবে বই আর পত্রিকাগুলো।

আর আজ সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভেস্তে দিয়ে ছুটতে হ'চ্ছে সকালবেলাই। ইনস্‌পেক্‌সনের কাজে। দিল্লী থেকে পাঁচজনের এক'টি কমিশন আসছে জেলায়। গ্রামে গ্রামে অনুন্নত তপশীলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাস কিরকম, তাদের মধ্যে জন্ম-হার, শিক্ষার হার, কর্মী-অকর্মীর সংখ্যা, কাজের ধরণ,—ইত্যাদি গুরু-গম্ভীর ব্যাপারে এক স্পষ্ট ধারণা নিতে আসছেন এই পঞ্চপাণ্ডবের টীম। এবারকার আগত বাজেটে নাকি একশ-কোটি টাকার মত ঢালা হ'বে এই অনুন্নত শ্রেণীর

পিছনে। তাদের সমৃদ্ধি হবে। বেঁচে-বর্তে থাকবে। পেট-পুরে হাপুস হুপুস খাবে। তাদের ছেলেমেয়েরা আরও বেশী সংখ্যায় জামা-জুতো, পেণ্টুলুন ফ্রক পরে ইস্কুল-পাঠশালে যাবে। এখন বাবু হবার পালা।....

জীপটা একটা বাঁক পেরোতেই ঝাকুনি দিয়ে শ্লথ হ'য়ে যায়। এক পাল ছাগল সামনের রাস্তায়। গাড়ির সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় তারা যে যেদিকে পারে নীচু জমিতে নেমে যায়।

—'আর কতটা নিতাইবাবু?'

—'এখনও বেশ কিছুটা হবেক স্যার।'

—তবুও কত ভেতরে ঢুকতে হবে আপনার কোনো আন্দাজ আছে?

—আর আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব মনে হচ্ছে বটে।

—'ও'। একটা সিগারেট ধরায় সে।

'দিস্ ইজ্ দি ডেড্ ল্যান্ড ....; যতদূর দৃষ্টি যায় বালি, লাল মাটি, পাথর। শুধু চোখের ক্লান্তি। এই জেলার নিজস্ব যা বনজ সম্পদ—শাল, পলাশ, মহুয়ার ঘন অরণ্য—তা এসব জায়গায় আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। লোকের কাজ নেই। পেট চালাবার মত পয়সা নেই। তাই সুযোগ পেলেই অরক্ষিত এই বনের গাছ কেটে কাঠ বাজারে বিক্রী করে পেট চালাবার উপায় বের করেছে এরা। তাতে মানুষ হয়তো বাঁচছে কিন্তু মরছে অ ণ্য। অবশ্য এখন ফরেষ্ট ডিভিসন্ রাস্তার দুধারে ইউক্যালিপটাস বসিয়ে সেই ন্যাড়া জায়গাগুলো ঢাকার চেষ্টা করছে। তার মনে হয়, কলকাতার মত কাঠফাটা শহরের লোকের কাছে এই যথেষ্ট প্রকৃতি। বাকিটা সবই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পড়া মেকী অভিজ্ঞতা।

কমিশন! 'সিগারেটে জোরে টান দিয়ে কাশতে কাশতে অথবা হাসতে হাসতে বিষম খাবার যোগাড় হ'তেই সে সামলে নেয়। কয়েকমাস অন্তরই এ ধরনের নানারকম কমিশন তৈরী হয়। আবার কোথায়, কবে বিভ্রান্তির বা ঔদাসিন্যের ধুলোর মধ্যে চাপা পড়ে যায়। ফাইল খোলা হয়। রীম রীম কাগজ টাইপ হয়,—রিপোর্ট পিন-আপ করা হয়; ....পরিসংখ্যানের হিসেব মার্ক টোয়েনের সেই লিজেণ্ডারী লাইব্রেরীর বইয়ের মত উঁচু হ'তে হ'তে সিলিং ছোঁয়। কমিশন-মেম্বাররা সরেজমিন তদন্তে আসেন। রাজকীয় আপ্যায়ন! গার্ড অব অনার! মুরগীর রোষ্ট, আঞ্চলিক প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নের তুমুল পাহাড়, কনভয়, কাঁটা-চামচের সুরেলা টুং-টাং, তর্ক-বিতর্ক,... কাস্টার্ড। .. তারপর আবার সব নৈঃশব্দে ভরে যায়। কোথায় থাকে পরিসংখ্যান? কোথায় লাল ফিতে? কোথায়

ফাইল? কোথায় বাজেট? রক্তের আঁশটে গন্ধে আগের মতই ভারি হ'য়ে থাকে বাতাস! এখনও হরিণের স্পীডে জীপ ছুটছে। যতদূর চোখ যায় উলঙ্গ আকাশ। মানুষের হৃদয় যতটা প্রশস্ত হ'তে পারে যেন ততটাই। চলতে চলতে হঠাৎ থামায় তার খেয়াল হয় তারা বাজার এলাকার মধ্যে এসে গেছে। চারদিকে পোকার মত মানুষজন। সিগারেটের প্যাকেটে আর একটিমাত্র। নেমে কিনতে হবে। ইত্যবসরে সে নিমাইবাবুকে বলে : 'দেখুন জিগ্যেস করে কাউকে, কোনদিকে আর কতদূরে গ্রামটা?' রাস্তার ধরে বটগাছের তলায় উবু হ'য়ে চারজন। একটা হুঁকো এ-হাত, ও-হাত ঘুরছে।

—কমলপুর কোন্‌দিকে ভাই?

—কমলপুব? এই গুইরাম বল্ না বটে--

গুইরাম একটা লম্বা টান দিযে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়্‌ছিলো। সে উত্তর দেবার আগেই জটলার মধ্যে থেকে একজন বলে—'সামনেই তো গ্রামটা। যা না সাহেবের সঙ্গে।' গুইরাম কিন্তু মনস্থির করার আগেই আর তিনজন তাকে প্রায় ঠেলে জীপের পেছনে তুলে দিলো। সরু. মোরাম ছড়ানো রাস্তা দিয়ে জীপ ছুটতে লাগল আবার। দূরে হাস্কিংম'ল কলের আওয়াজ। পাখী উড়ছে।—'ওই যে দেখাচ্ছে গ্রামটা।' গুইরামেব পথনির্দ্দে'শ। একটু দূরে পাতায় ছাওয়া ঘন-সন্নিবিষ্ট কতকগুলি ঘর। চেষ্টা কবলে আঙুল দিয়ে গোনা যায়। এই সীমিত বসতি নিযেই কমলপুব।

—'এখানে ভূমিজদের বাস—।' গুইরামের গলা।

গাড়ি একবার হর্ন বাজিয়ে থামতেই আনাচ-কানাচ থেকে পিলপিল করে বেবিয়ে আসে মানুষ। যেন উড়ন্ত চাকীর দবজা খুলে বাইরে আসছে অজানা গ্রহের অলৌকিক অবয়ব সব। মানুষ বলে চিনতে ভুল হয়। কালো মাথা। কালো শরীর। বর্ত্তুলাকার পেট। কাঠি কাঠি হাত-পা। শিশুই বেশী। দু-একজন যুবতীও চোখে পড়ে। ময়লা, ছেঁড়া, প্রায় ন্যাকড়া জড়ানো শরীরে। জামা নেই। একটি চকচকে গাড়ি আর সুসজ্জিত তাকে দেখে হাঁ হ'য়ে গেছে তারা। এসব কি তাদেরই গ্রামে? কি ব্যাপার? ধরপাকড় করতে আসোন তো? অবাক-চোখে, আত্মচেতনাহীন তারা তাকিয়েই থাকে। আর সে দেখতে থাকে হাওয়ায় সরে যাওয়া, কাপড়ের ফাঁক দিয়ে কষ্টিপাথরের মত কালো, প্রলুব্ধ স্তন! এত অপুষ্টিসত্ত্বেও এদের স্তন এত সতেজ আর সুগঠিত থাকে কি করে?

সামনেই বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বৃদ্ধকে নিতাইবাবু ডাকে।

—'এই এদিকে আয়, কি জিগ্যেস করবেন সাহেব—।' গাড়ি থেকে ইতিমধ্যে নেমেছে সে। হাতে টাইপ-করা দুটি শীট ও ডটপেন। নেপোলিয়নের ভঙ্গীতে ঘাড় উঁচিয়ে চারধার একবার দেখে নেয়। যেদিকে চোখ যায় কৌতূহলী চোখ, ঘোলাটে দৃষ্টি, তোবড়ানো গাল, কালো খস্‌খসে চামড়ার তলায় স্পষ্ট দৃশ্যমান হাড়ের সারি! মানুষ আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

—তোমাদের এ গ্রামে কত ঘরের বাস?

—'উনত্রিশ আজ্ঞা।' হাতে ধরা প্রো-ফরমায় নির্দিষ্ট শূন্যস্থান পূরণ করতে থাকে সে।

—'পদবী কি?'

—আজ্ঞা?

—'জাত কি তোদের?' অথরিটেটিভ গলায় নিতাইবাবু।

—ভূমিজ।

—'কি করো তোমরা? মানে, জীবিকা কি? কি কাজ করে সাধারণতঃ উপার্জন হয়?'

—'খেতে মুনিষ কামিন খাটি। নিজেদের জমিজমা নেই বটে, অন্যের '

—'ডে-লেবার, লিখুন স্যার।' নিতাইবাবু বলে।

ইতিমধ্যে সামনের ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকজন খাটিয়া পেতেছে।

—'বসেন স্যার বসেন।'

—'ঠিক আছে। ঠিক আছে।'

—'আচ্ছা তোমাদের অন্য কোন প্রফেসন,—মানে,—এই খেতে কাজ করা ছাড়া আর কি কাজটাজ করা হয়?'

—'আর কিছু নাই। ইখেনে আর কিছু কেউ জানে না।'

—'ঝুড়ি-টুড়ি বুনে বাজারে বেচিস না?' নিতাইবাবু।

—'নাই। উ কাজ ইখেনে কেউ করে না বটে।'

—'আচ্ছা, এ গ্রামের লোকজনের পড়াশোনা কদ্দুর? কেউ কলেজে পড়ে?'

—না বাবু। দু-বেলা পেট ভরে খেতেই পায় না, তা আবার পড়া-লেখা। 'একজন অবশ্য ছিলো, কেলাস সিক্স অবধি পড়ালেখা জানা,—তা সেত টাউনে গেছে,—মিলে কাজ করে।'

—'স্যার!' হাড়গিলে চেহারার একজন হাতজোড় করে তাকে ডাকে।

—'হ্যাঁ, বলো।' কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ঘাড় ঘোরায় সে।

—গরমেণ্ট থেকে কি আমাদের কিছু দেওয়া হবে?

—'মানে?' কথাটা সত্যিই বুঝতে পারে না সে।

—'খানিকটা জমি চাইছিলুম, বেশী নয়—।'

—'আমি কোথা থেকে জমি দেব?' সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে সে।

—'না বাবু জিগ্যেস করছিলুম—নিজেদের জমি নেই,—পরের জমিতে খেটে বড় কষ্ট,—মেহনত হয়, আয় আর কত? বাচ্চাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে—এই দেখুন।'

লোকটি আঙুল দেখায়। তার চোখ চলে যায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ছেলের দিকে। অপুষ্টি কামড়ে রয়েছে সমস্ত শরীর। —'মাঝে মাঝেই জীপে চড়ে আপনার মত বাবুরা এখানে আসেন। আমাদের কত কি বলে যান, কিন্তু কই কিছুই তো হয় না।' লোকটি হাত জোড় করে কিন্তু যেন তাকে অপমান করেই বলে যেতে থাকে। তার দুই কান গরম হ'য়ে ওঠে। আর ঠিক সেই সময় তার মুখে এসে যায় কথাগুলো।

—'হ্যাঁ, ইয়ে, তো, তোমাদের ভালো ব্যবস্থা করার জন্যেই তো এতসব খবর নিয়ে যাচ্ছি,—এই রিপোর্ট দিল্লীতে যাবে তারপর সেখান থেকে টাকা-পয়সা আসবে,—তোমাদের নানারকম উন্নতি হবে,—বুঝলে না?'

কথাগুলি বেশ জোরেই বলে সে। বেশ জোরে, আত্মপ্রত্যয় দিয়ে। যে লোকটি হাত জোড় করে কথা বলছিলো, সে নিঃশব্দে হাসে. দাঁতগুলি অস্বাভাবিক সাদা। চারিদিকে তাকিয়ে সে শুধু হাসিমুখ দেখতে পায়। হাসে অদূরে দণ্ডায়মান অগুনতি শিশু, বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক এবং যুবতীরা। নিঃশব্দে হাসে তারা। তোবড়ানো গালে, ঘোলাটে চোখে কুৎসিত সেই হাসি। যেন তার কথাতেই সকলে হাসছে, বিদ্রূপ করছে তাকে, তার মনে হয়। আর তাই পরিসংখ্যান-বোঝাই টাইপড্-সীট খামচে তুলে নিয়ে সে যেন বা লাফ দিয়ে জীপে ওঠে। জোরে হুকুম করে,—'চালাও'। এই বীভৎস, কদাকার হাসির মিছিল থেকে সে যেন ভয় পেয়ে, পালিয়ে যাচ্ছে এরকম মনে হয় তার। জীপ ছুটতে থাকে। কম্পমান হাতে তিনবারের বার দেশলাই জ্বেলে সে সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে। আবার ক্লান্তিকর নীল আকাশ। আবার লাল মাটি, পাথর, কাঁকরের বিস্তার। দূরে চেয়ে সে দেখতে পায় এক ঝাঁকড়া গাছের আড়াল থেকে সাঁৎ করে একটি চিল বেরিয়েই উড়তে থাকে উঁচুতে, আরও উঁচুতে। শূন্যে ভাসমান তার ডানা দুটিকে দেখে হঠাৎ মনে হয়: ওগুলি আসলে ডানা নয়। ব্রাউন রঙের দুটি ফাইল...।....ফাইল!

যার তলায় একটু পরে চাপা পাড়ে যাবে কমলপুরের ওই হাড়হাভাতে মানুষগুলো!

হাত

সমীরণ দাস

১.

এ এক ছবির ফ্রেম যা অনিন্দ্যর বুকের মধ্যে সাঁটা আছে শৈশব থেকে যৌবনের এই মধ্যভাগ পর্যন্ত। একটা পেশীবহুল লম্বা হাত ধীরে ধীরে নেমে আসছে, আর অনিন্দ্যর অবুঝ, রাগী মুখ ও চোখের দৃষ্টি সেই হাতের তলায় কেমন ত্বরিতে পাল্টে যাচ্ছে। হয়ে পড়ছে ফ্যাকাশে, শাদা, প্রাণহীন। নিজের মুখ ও দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছে এই পরিবর্তন। বাবার সেই হাত নামছে। ক্রমাগত নেমে আসছে মাথার ওপর, পিঠে, শরীরের সর্বত্র। আশে-পাশে কোথাও মা-কে দেখা যাচ্ছে না। চিৎকার করে কেঁদে উঠে ছুটে পালাতেও যেন ভুলে গেছে বালকটা।

একবার মাথায় আচমকা আঘাত পেয়েছিল অনিন্দ্য। মুহূর্তে চারপাশের তাজা রোদ, সবুজ পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। জ্বলে উঠেছিল অসংখ্য তারা। চকিতে, মুহূর্তের মধ্যে। এই বুকের ছবিও যেন তেমনি জ্বলে ওঠে। কিন্তু নিভে যায় না, শেষ হয় না।

আচমকা শব্দ হল। অনিন্দ্য চমকে তাকাল। সংহত চিন্তা ছিন্ন হ'ল। মনে হ'ল তীব্র শব্দে চারদিক মথিত করে দমকল ছুটে যাচ্ছে। জয়ন্তী এসে ফোনটা ধরল। কয়েক সেকেন্ড পর চিৎকার করে ওকে ডাকল।

অনিন্দ্য তাকাল। আত্মস্থ হয়েছে সে। হাসল। হাতে সিগারেট, টেবিলে ওর চারপাশে কয়েকজন স্টাফ ঘাড় নীচু করে বসে আছে। তাদের মধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল। ফোন ধরল।

অনিন্দ্যর দাদা হাসপাতালের ডাক্তার। সেখান থেকেই টেলিফোন এসেছে। অনিন্দ্য কয়েক মিনিট কথা বলল। মুখের ওপর কালো ছায়া নামল। চারদিকে তাকাল।

কাউণ্টারের সামনে একটা ক্ষ্যাপা লোক চিৎকার করছে, ‘ড্রয়্যারের মধ্যে বাণ্ডিল বাণ্ডিল এক টাকা-দু’ টাকার নোট। ন্যাশানালাইজেশানের জন্যই তো ব্যাংকের এই অবস্থা, বাণ্ডিল ভাঙবে না। পুরোটা গুনতে হবে যে, অত ঝামেলা কে করে।’

‘বাজে কথা বলবেন না। ছোট নোট নেই, কোত্থেকে দেব। অসুবিধা থাকলে ম্যানেজারকে জানান।

অনিন্দ্য রাগী লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে জানে কিভাবে কথা বললে লোকজনকে শান্ত করা যায়, ‘আপনি তো পুরনো লোক দাদা, আপনি কেন রেগে যাচ্ছেন! এদিকে আসুন, আমি দেখছি।’ এবং একপাশে টেনে নিয়ে বসাল। অন্য কাউণ্টার থেকে কিছু ছোট নোট এনে লোকটাকে ঠাণ্ডা করে নিজের টেবিলে ফিরে এলো।

অনিন্দ্যর শীর্ণ শরীর। দু’বার টি-বিতে ভুগেছে। বয়স প্রায় চল্লিশ। বিয়ে করেনি। করবেও না। সিটের কাছে ফিরে আসতে আসতে দুর্বলতা অনুভব করল। মাঝে মাঝে দম ধরে, হতাশ লাগে। সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাবে কোথায়! কী-ই বা করবে! যতদিন বেঁচে আছে, একটা কিছুর মধ্যে তো নিজেকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিতে হবে! নিজেকে খুঁজে পেতে হবে!

সমর জিজ্ঞেস করল, ‘কি ব্যাপাব! লোকটা চিৎকাব করছিল কেন!’

‘পেটি কেস!’ বলল অনিন্দ্য। তারপর, অফিসের বলিগদের জন্য লজ্জায় আমার মাথাকাটা গেল!’

সকলে কৌতূহলী চোখে তাকাল। অনিন্দ্য সিটে বসে একটু দম নিল। বলল, ‘পি-জি থেকে দাদা ফোন করছিল। সুকুমারের কথা জিজ্ঞেস কবল।’

‘কেন?’

‘ওর স্ত্রীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হবে। কাল আমার কাছে এসে বলল, একটা ব্যবস্থা করে দিন। দাদার কাছে পাঠিয়েছিলাম। ফ্রি বেডের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। অপারেশনও হত বিনা পয়সায়। শুধু ওষুধের জন্য দু’শো টাকা জমা দেওয়ার দরকার ছিল ইমিডিয়েটলি। সুকুমার কি করল জানিস?’

সকলের চোখে কৌতূহল, ‘দাদা তখন কোয়ার্টারে। সুকুমার হন্তদন্ত হয়ে দাদার কাছে এসে বলল, ওর কাছে টাকা নেই। দাদা যদি পেমেণ্টটা করে দেয়, পরে ও শোধ করে দেবে। দাদা এইমাত্র ফোনে জিজ্ঞেস করল,

'ছেলেটা কেমন! টাকাটা দেবে কিনা!'

সুকুমারকে টাকা দিলে ঘোরাবেই। সমর বলল 'তুমি দিতে বললে? ওকে টাকা দিলে কিন্তু ফেরৎ পাওয়া মুশকিল। কাজ হয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কি করব বল! জানি, ও ঘোরাবে। তবুও বলতেই হল, দিয়ে দাও। একটা মানুষ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, টাকা না দিলে ও-টিতে নিয়ে যেতে পারছে না! আমি বলতে পারি—দিও না?'

চারপাশের লোকজন কথা বলল না। অনিন্দ্যর জন্য সুখ অনুভব করল। লোকটা মানুষের জন্য এত করে, তবুও একফোঁটা অহংকার নেই। অন্য কেউ হলে সোজাসুজি বলে দিত, টাকা দিও না!

অনিন্দ্য সামনের দিকে তাকাল। হাজরা রোড ব্রাঞ্চ থেকে সদ্য ট্রান্সফার নিয়ে আসা যুবকটা ওকে স্থির ভাবে দেখছে! অনিন্দ্য ছেলেটার চোখে গভীতার আভাস পেল। ঋজুতারও। সে চোখ সরিয়ে নিল।

* * *

তিন মাস এখানে এসেছে দীপক। ও শান্ত, নম্র, ভদ্র। অন্ততঃ সেরকম দেখানোর চেষ্টা করে। অন্য ব্রাঞ্চে থাকতে যে রকম ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিটি দেখিয়েছে—এখানে তার একাংশও নেই। যারা ওকে আগে চিনত, তারা বুঝতে পারছে না কী ব্যাপার। ছেলেটা কী সবকিছু ছেড়ে দিল! আসলে ওর একটা অন্য পরিকল্পনা আছে।

দীপক নতুন কোথাও গেলে প্রথম-প্রথম কিছুদিন নতনম্র রাখে নিজেকে। সবার সঙ্গে সহজভাবে মিশে সেই পরিবেশের পালস্ জেনে নিতে চেষ্টা করে। এখানেও সেটা করছে।

নতুন জায়গা। নতুন মানুষ। নতুন পরিবেশ। পুরনো ব্রাঞ্চ থেকে অনিন্দ্য সম্পর্কে অনেক শুনেছে। এখানে এসে আরও কাছ থেকে দেখছে। অত্যন্ত চতুর, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও জনপ্রিয়। ওর ওপর কর্মচারীদের অগাধ বিশ্বাস।

দীপকের মধ্যে ভয় আছে। আছে জড়তাও। নিজের সংগঠনের দশজনের মধ্যে কাজ হবে ক'জনকে দিয়ে, ঠিক বুঝতে পারছে না। অনিন্দ্য কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের লোক। দীপক কর্মী ইউনিয়নের। সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে ওকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে, অ্যাসোসিয়েশান থেকে যত পারো লোক ভাঙ্গিয়ে নিজের সংগঠনে জড় কর। কিন্তু কাজের ছেলের সত্যিই অভাব। সদস্যদের মধ্যে

একমাত্র জয়ন্তীই মনে হয় ওর বিশ্বস্ত থাকবে পুরোপুরি। সে জয়ন্তীর আচরণ থেকে একটা ভিন্ন কিছু আঁচ করতে পারছে।

সমরের কথা মনে হ'ল। এক সংগঠনের লোক হলেও দীপক বুঝতে পারে, সমর কখনোই ওর বিশ্বস্ত হবে না। কারণ — জয়ন্তী। সমর দীপককে ঈর্ষা করে — ।

আর যারা আছে প্রত্যেকেই একটু এলোমেলো। নিষ্ক্রিয়। তাদের সক্রিয় করতে হবে। এখানকার মেজরিটি সংগঠন কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের চাপে সকলেই গুটিয়ে আছে। তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। কিন্তু ও বুঝতে পারছে, সেটা করতে গেলে প্রথম ধাক্কাটা এসে পড়বে ওর ওপরই। অনিন্দ্য সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। দীপক সেজন্য ভয় পায় না. কিন্তু অনিন্দ্য যদি নীতিহীন কিছু করতে চায়? হেরে গিয়ে ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়ে ওকে ফাঁসিয়ে দেয়? ব্যাংকের চাকরিতে ইচ্ছে করলে একজন আরেকজনকে সহজেই ফাঁসিয়ে দিতে পারে!

দীপকের আশংকা আছে কিন্তু দ্বিধা নেই। এত বছর যাবৎ সংগঠন করে, নীতি-নিষ্ঠার সঙ্গে আদর্শকে মেনে নিয়ে চলতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে, ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। রিস্‌ক্‌ নিতেই হবে। ও সেটা নেবেও। সম্ভবতঃ আক্রান্তও হবে। কিন্তু প্রাথমিক আক্রমণে যদি বসে যায়, তাহলে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। বরং সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই আক্রমণকারীরা ওকে সমীহ করে চলতে শুরু করবে। সেটাই নিয়ম।

দীপক একাধিক পরিকল্পনা ছকেছে নিজের মধ্যে। ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা যাচাই করেছে। কোনটা সত্যি সত্যিই এফেকটিভ হবে, কোনটা হবে না! তবে একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত, কর্মচারীদের দলে টানতে হলে প্রথমেই তাদের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কিছু করতে হবে! তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করে দিতে হবে, যা অনিন্দ্য পারেনি বা চেষ্টা করেনি। কিন্তু কীভাবে!

ব্রাঞ্চে কর্মী ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসল দীপক, কী করা যায়! প্রথমে বুঝিয়ে বলল, ওর কি উদ্দেশ্য! সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে ওকে কি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে! তারপর প্রশ্ন রাখল, 'এবার আপনারাই বলুন, কিভাবে সংগঠনকে বড় করা যায়!'

আলোচনা চলছে ব্যাংক প্রেমিসেসের এক কোণে। চেম্বারে ম্যানেজার বসে আছেন। মাঝে-মধ্যে তাকাচ্ছেন এদিকে! একটু দূরে বসেছে তাসের আড্ডা। চিৎকার ভেসে আসছে. এবং সেই চিৎকার যে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিটিং

ডিসটার্ব করার জন্য, সেটা বোঝা যায়! পাশে অনিন্দা দাঁড়িয়ে, খেলছে না। খেলা দেখছে, এদিকে তাকাচ্ছে।

দীপক আবার বলল, 'সমর, আপনি কিছু বলুন!'

দীপক এখানে আসার আগে সমরের সঙ্গে জয়ন্তীর কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। এ নিয়ে অনেকে অনেক ঠাট্টা-রসিকতাও করেছে। সমর গভীরভাবে চেয়েছে জয়ন্তীকে, কিন্তু জয়ন্তী ওকে বন্ধুর থেকে বেশী কিছু ভাবেনি। অথচ তিন মাস মাত্র দীপক এসেছে ব্রাঞ্চে, এর মধ্যেই সমর বুঝতে পারছে—দীপকের প্রতি একটা গভীর টান জয়ন্তীর তৈরি হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। সে সহ্য করতে পারছে না, কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না! জোরে জোরে মাথা নাড়ল সমর, না! কিছু বলবে না!

সূক্ষ্ম হাসির রেখা জাগল দীপকের মুখের ওপর। বলল, 'জয়ন্তী, আপনি?'

জয়ন্তী প্রথমে বিব্রত হ'ল। তারপর সামান্য লজ্জা। সে কোন মিটিং-এ বা আলোচনাসভায় এভাবে যোগ দেয়নি। আচমকা তার নাম ধরে অনুরোধ করায় বিচিত্র ভাবে তাকাল দীপকের দিকে 'আমি কি বলব! আমার চাকরি তো ক দিনের মাত্র। তবে একটা জিনিস মনে হয়, অন্যান্য ব্রাঞ্চে যেরকম আছে, আমরা যদি একটা স্টাফ কো-অপারেটিভ করি, তাহলে কেমন হয়?'

'আর কেউ কিছু বলবেন, সুমন আপনি?'

সুমন নামধারী যুবক কথা বলল না। বিব্রত আড়ষ্টতায় মাথা নাড়ল। অপ্রতিভতা ফুটে উঠল। দীপক সকলের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ সময় পেরলো। তাসের আড্ডা থেকে হৈ-হৈ চিৎকার ভেসে এলো—ফোর স্পেড রি ডাবলে গেম হয়েছে। পাশে দাঁড়ানো অনিন্দা সেই চিৎকারের মধ্যে ডুবে গিয়ে আবার এদিকে তাকাল। দীপক বলল 'জয়ন্তীর প্রস্তাব ভাল প্রস্তাব। অনেক ব্রাঞ্চেই এটা আছে। আমরাও যদি করতে পারি, কর্মচারীদের উপকার তো হয়ই—তারা প্রয়োজনে স্বল্প সুদে বা বিনা সুদে টাকা ধার নিতে পারবে। অন্যদিকে আমরা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকও অনেকটা এগিয়ে যেতে পারব। কিন্তু এটা ছাড়াও আমার একটা প্রস্তাব আছে। ব্রাঞ্চে লাইব্রেরী নেই। এখানকার বিভিন্ন লোন পার্টির কাছ থেকে ডোনেশান ও কর্মচারীদের কাছ থেকে সাধ্যমতো চাঁদা নিয়ে যদি একটা লাইব্রেরী চালু করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরও ফ্রুটফুল হতে পারে।'

দীপক থামল। প্রত্যেকেই ওর কথায় রাজী। দুটো প্রস্তাবই পছন্দ হয়েছে

সকলের। একটু দূরে তখনও তাসখেলা চলছে। কলরব ছুটে আসছে, আসছে অনিন্দ্যর কৌতুহলী চোখ।

* * *

ডেপুটি ম্যানেজারের টেবিল থেকে দীপকের দিকে ছিটকে এলো রতন, 'সই করতে দিচ্ছে না আমাকে।'

'কেন?'

'ইউনিফর্ম পরে আসিনি বলে।'

হেড অফিস থেকে সারকুলার এসেছে, প্রত্যেক সাবষ্টাফ যেন ইউনিফর্ম পরে ডিউটিতে আসে। মাঝে কয়েকবার জোনাল অফিস থেকে ইনস্‌পেকশানে এসে গেছে। কয়েকজন ড্রেস পরেনি বলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ধমক খেয়েছে।

দীপক জিজ্ঞেস করল, 'ইউনিফর্ম পরোনি কেন?'

রতন বলল, 'সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলল। সারকুলার অনুযায়ী এতদিন আমাদের উইন্টার লিভারিজ পাওয়ার কথা। কিন্তু ওরা সেটা দেয়নি। সামার ড্রেস এখন কেন পরব?'

উঠে দাঁড়াল দীপক, 'চলো।'

দীপক ডেপুটি ম্যানেজারের টেবিলে চলে এলো, 'ওকে জয়েন করতে দিচ্ছেন না কেন?'

ডেপুটি বল্লেন, 'আমাদের কিছু করার নেই। জানেন তো সবই, হেড অফিস থেকে প্রায়ই ইনস্‌পেক্‌শানে আসছে। এ' অবস্থায় ইউনিফর্ম ছাড়া আমরা জয়েন করতে দিতে পারি না।'

দীপক স্থির ভাবে বলল, 'ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে ওদের উইন্টার লিভারিজ পাওয়ার কথা। আপনারা দেননি। কেন দেননি?'

ডেপুটিকে সামান্য বিব্রত দেখাল 'এখনো তো শীত তেমন পড়েনি সেজন্যই ....।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দীপক জোরের সঙ্গে বলল, 'সেই সুযোগটা আপনারা নিচ্ছেন, তাই তো? আপনারা আইনের কথা বলেন, অফিসিয়াল নিয়ম-কানুনের কথা বলেন, আগে আপনারাই সবকিছু ঠিক মতো মেনে চলুন —তারপর আমাদের শেখাতে আসবেন। রতনকে জয়েন করতে দিতে হবে।'

রতন খাতা টেনে সই করল। ডেপুটি কোন প্রতিবাদ করলেন না। চারপাশে ভীড় জমে উঠছিল। কর্মচারীরা ম্যানেজমেন্টের কাজকর্মে ক্ষুব্ধ। তারা খুশী হ'ল।

২.

সেই হাতে কি শুধুই ক্রোধ? শাসন? শাস্তি এবং বেত্রাঘাত? অনেক কিছুই ছিল, আবার অনেক কিছুই নয়। যা-যা ছিল তার অনেকটাই বাদ গেছে অনিন্দ্যর স্বপ্ন কল্পনায়। আবার যা ছিল না, সেটাও আরোপিত হয়েছে সেই হাতের মধ্যে। যা ওর চিন্তা-চেতনায় তৈরি করেছে এক গভীর বোধ।

ও শুধু হাত দেখেছিল। পুরুষ্টু এবং লোমশ হাত। আর তার পেছনে ছিল দুটো জ্বলন্ত চোখ। সেই চোখ থেকে আগুন বেরিয়ে আসছিল। ও উত্তাপ পাচ্ছিল। অসহায় বোধ করছিল। বালকটা আর্তনাদ ছাড়া অন্যকিছু ভুলে গিয়েছিল। সে বাবাকে ইতিপূর্বে কখনো এই মূর্তিতে দেখেনি।

মা পাশের ঘরে ছিল। বসেই ছিল। নভেল পড়ছিল, পড়ছিল কী! এখন সন্দেহ হয় অনিন্দ্যর। পড়ছিল না, বরং নিজেকে সামলানোর জন্যই বই খুলে রেখেছিল মুখের সামনে। ছেলের তীব্র আর্তনাদ তার সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করছিল।

এটাই এখনকার বিশ্লেষণ অনিন্দ্যর। কিন্তু মা-কে ঐ চরম সময়েও বইয়ের সামনে বসে থাকতে দেখে এক নিদারুণ অভিমান ওকে উথাল-পাথাল করে দিচ্ছিল। মা কেন প্রতিবাদ করছে না! বাবাকে কিছু বলছে না! তাহলে মা কি ওকে ভালবাসে না? ও প্রতিবারই তো পরীক্ষায় প্রথম হয়। শুধু একবার। এই একবারই মাত্র প্রথম হতে পারেনি।

মা-কে অনড় দেখে গভীর অভিমানের পাশাপাশি একটা চিন্তা চকিতে উঠে এসেছিল ওর সত্তার মধ্যে। এটা কি সত্যিই অন্যায়! ও-কি প্রথম না হতে পেরে সত্যিই কোন বড় রকম অপরাধ করে ফেলেছে!

অনিন্দ্য সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ লুকিয়ে চেতনার মধ্যে এই সব স্মৃতি প্রবাহিত করছিল। অস্পষ্ট জলছবির মতো একবার ভাঙছিল, একবার ভাসছিল। ওর চারপাশে তখন কয়েকজন মানুষ একে একে এসে বসছে, জরুরী আলোচনা হবে।

অনিন্দ্য দীপক সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পেরেছে, যা এখানকার অনেকেই জানে না। দীপকের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, কি করতে চায়—কিভাবে করতে চায়, অনিন্দ্য সবকিছু বলল।

প্রত্যেকেই অনিন্দ্যর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সকলের মুখেই আটকে যাচ্ছে উদ্বেগের জাল। অনিন্দ্য আবার একটা সিগারেট ধরাল, 'আপনারা প্রত্যেকেই আশা করি এ' বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। সমস্ত সদস্যদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন। আমাদের সংগঠন সেন্ট্রাল লেভেলে দু'বার ভেঙেছে, সেজন্য

ম্যানেজমেণ্টের কাছে কর্মচারীরা হয়ে পড়েছে অনেক দুর্বল। তার ওপর চলছে এই নোংরা কর্মচারী ভাঙিয়ে নেওয়ার খেলা। এটা বন্ধ করতেই হবে।'

প্রবীণ আশুতোষ মণ্ডল বল্লেন, 'আমি বিশ বছর অ্যাসোসিয়েশানে আছি। এর অনেক উত্থান-পতনের সঙ্গে পরিচিত। অনিন্দ্যর রিপোর্টিং এর পর একটা কথাই বলার আছে—যে কোন ভাবেই হোক না কেন, এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা রুখতে হবে। লাইব্রেরি তৈরীর জন্য ওরা অনেকটাই এগিয়ে গেছে, সেটা বন্ধ করতে হবে।'

'ঐটি করবেন না কমরেড।' ব্যস্ত ভাবে অনিন্দ্য বলল, 'লাইব্রেরির ব্যাপারে বেশির ভাগ কর্মচারী উৎসাহী।'

'ওরা অবশ্য বলছে, লাইব্রেরি কোন সংগঠনের ব্যানারে তৈরি হবে না।'

'সেটা ওদের চাল।' বলল অনিন্দ্য, 'কোন সংগঠনের ব্যানারে লাইব্রেরি তৈরি না করে—নিজেরাই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে নিজেদের ইমেজ বাড়িয়ে নিচ্ছে। তবুও লাইব্রেরি তৈরির বিরুদ্ধে কিছু করলে কর্মচারীরা সেটা ভালো চোখে দেখবে না। এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন।'

ক' মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। অনিন্দ্য আবার বলল, 'এখন আমাদের একটা জিনিসই করার আছে। লাইব্রেরি হবে। আমাদেরও অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে। আস্তে আস্তে দীপককে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে। নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিতে হবে। এবং এগুলো ঠিক মতো করতে পারলেই লাইব্রেরি তৈরির দায়িত্ব ও কৃতিত্ব এসে পড়বে আমাদের ওপর। দীপকের পক্ষে তখন সহজভাবে মুভ করা মুশকিল হবে।'

* * *

ইণ্ডিয়ান অ্যাডভারটাইজিং-এর বিমানবাবুর সঙ্গে দেখা করল দীপক। বিমানবাবুর লোক প্রায়ই ব্যাংকে আসে। তবুও অপেক্ষায় না থেকে সরাসরি তাঁর অফিসে গিয়েই কথা বলল ওরা, 'এক হাজার টাকা চাই।'

বিমানবাবু ফোন করছিলেন। টেবিলের ওপর চকচকে ফ্যাশান ম্যাগাজিন। নগ্ন নারী পুরুষের সুগঠিত শরীর এলোমেলো। তৈলাক্ত টেবিলে আলো ঝলক তোলে।

বিমানবাবু ফোন রেখে তাকালেন। ভারী ফ্রেমের চশমার নীচে চতুর চোখ। মোলায়েম হাসলেন। তারপর বল্লেন, 'কেন?'

দীপকও হাসল। বুঝিয়ে বলল, টাকাটা লাইব্রেরির জন্য ডোনেশান। ক' মুহূর্ত ভাবলেন বিমান বাবু। প্রতি বছরই ব্যাংকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

নামে হুল্লোড়বাজী হয়। সেখানে স্যুভেনিরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নামে টাকা ঢালতে হয়। আবার ডোনেশান। তবুও কি ভেবে বল্লেন, 'ঠিক আছে। তবে এ-মাসে তো ভাই হবে না। সামনের মাসে।'

দীপক মনে মনে ভাবল, দেবে না মানে! দশ লাখ টাকা লোন নিয়েছে, এখন আমাদের দিকে একটু তাকাবে না! চা খেয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। সবশুদ্ধ কয়েক হাজার টাকা কালেকশান হয়েছে। একটা নোটিশ টাঙ্গানো হ'ল নোটিশ বোর্ডে। আগামী সপ্তায় বই কেনা হবে। প্রত্যেক ষ্টাফ যেন তাদের প্রয়োজন মতো বইয়ের তালিকা তিন দিনের মধ্যে লাইব্রেরিয়ানের কাছে জমা দেন।

লাইব্রেরিয়ান হয়েছে অমিতাভ ও গৌর। দু'জনেই কর্মী ইউনিয়নের সদস্য। জয়ন্তী দশটা বইয়ের একটা লিষ্ট তৈরি করে লাইব্রেরিয়ানের হাতে তুলে না দিয়ে দীপককে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার বইগুলো যেন কেনা হয়।'

* * *

দিনে দিনে অনিন্দ্যর টেবিল থেকে লোকজনের ভিড় কমে যাচ্ছে। বাড়ছে দীপকের টেবিলে। অনিন্দ্য অস্থিরতা অনুভব করছে। বুঝতে পারছে না, এখন কি করবে! কীভাবে এগোবে! এরকম অসহায়তা সে কখনো অনুভব করেনি। দীপককে দমানো যাচ্ছে না কিছুতেই।

ওরা এখানে দশজন। আমরা পঞ্চাশ। ভাবল অনিন্দ্য। কিন্তু যে কোন সময়ই এই দশ বেড়ে যেতে পারে। কমতে পারে পঞ্চাশ। এখন পলিটিক্যালি ওদের সঙ্গে ফাইট করা দরকার। কিন্তু সেরকম পপুলার ইস্যু কোথায়! কর্মচারীদের ধরে রাখার জন্য বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে যে নির্দিষ্ট কর্মসূচী দরকার, তা সংগঠনের নেই। এই অবস্থায় কিভাবে লড়বে অনিন্দ্য!

সমর এসে বসল। অনিন্দ্যর চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ কি যেন পেয়েছে সে। জয়ন্তীর সঙ্গে দীপকের সম্পর্ক সমর কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সুতরাং কর্মী ইউনিয়নের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও নির্ভয়ে সমরের সামনে দীপকের সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'নিজেকে প্রোজেক্ট করার জন্য ছেলেটা পাগল হয়ে গেল।'

'কেন?' সমর কৌতূহলী হল।

'বিমানবাবুর কাছ থেকে মাত্র এক হাজার টাকা নিয়ে এসেছে। শালা দু'দিনের যোগী, জানে না আমাদের সঙ্গে বিমানবাবুর কোন লেভেলে সম্পর্ক। দরকার হলে আমরা ও'র কাছ থেকে দশ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারতাম।'

'ধরো না ওকে তোমরা। আমি খুব খুশী হব।'

দাঁতে দাঁত চেপে অনিন্দ্য বলল, 'সুযোগ পেলেই ধরব।'

'আমার সম্পর্কে ওর ধারণা ভাল না।'

'কেন, তোমরা তো একই সংগঠনের লোক।'

'তোমাদের সঙ্গে মিশি বলে ওরা আমাকে বিশ্বাস করে না। আমি বুঝি না ইউনিয়ন করি বলে কি লোকজনের সঙ্গে হিসেব করে মিশতে হবে! মানুষের সঙ্গে মানুষের হিউম্যান রিলেশান থাকবে না!'

'তোমরা ছেড়ে দাও কেন! কিছু বলো না বলেই তো এই অবস্থা। একটা নিরীহ মেয়েকে নিয়ে যা শুরু করেছে—ওকে শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না।' কথাটায় বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

সমর চমকে তাকাল। ওর সমস্ত অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠল, 'কেন, কি করছে?'

'কি করছে, সেটা কি করে বলি! ছেলেটা তো দু' নম্বরী। এর আগে যে ব্রাঞ্চে ছিল, সেখানেও একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে। তোমার সঙ্গে তো জয়ন্তীর ভালো সম্পর্ক, ওকে একটু সাবধান করে দিতে পার না।'

সমর চুপ করে রইল। ওর চোখ দুটো জ্বলছিল। ভাবছিল কি করা যায়! নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। অনিন্দ্য হাসল।

গতকাল বিকেলের ডাকে একটা বিল কালেকশান হয়ে এসেছে। আজ সকালেই ছেড়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু লাইব্রেরির কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য দীপক সময় দিতে পারেনি। ভেবেছে, তাড়া তো নেই। কাল পাঠাব।

বিলটা জমা দিয়েছিল সমরের এক বন্ধু। সে সকালে এসে ওর কাছে বসে আছে। সমর একবার দীপককে অনুরোধ করে গেছে। দীপক বলেছে, 'দিচ্ছি।' কিন্তু ভুলে গেছে অন্যান্য কাজের মধ্যে।

আধঘণ্টা পর সমর আবার এলো। দীপক টেবিলের ওপর মুখ ঝুলিয়ে স্টাফদের রিকুইজিশান থেকে কমন বই খুঁজছিল। সমর সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'আপনি লাইব্রেরির কাজ করছেন, ভালো কথা। কিন্তু সময়মতো অফিসিয়াল কাজগুলো তো করবেন।'

দীপকের চোখে বিস্ময় লাফিয়ে উঠল। বিব্রত হ'ল। সমরের আচরণে সে যেন কিসের সংকেত পেল। শান্ত ভাবে বলল, 'কেন, কি হয়েছে! এত চিৎকার করছ কেন?'

সমর থামল না, 'শালা অফিসটা যেন নিজের বৈঠকখানা। সবসময় গুজগুজ-ফুসফুস। কার পেছনে কিভাবে কাঠি দেওয়া যায় সেই ধান্দা।

একটা ভাউচার তৈরি করতে কত সময় লাগে?'

দীপক নীচু স্বরে বলল, 'পাঠিয়ে দিচ্ছি।' মাথা গরম করল না। অপমান গায়ে মাখল না। কিন্তু এই নীরবতায় সমর আরও রেগে গেল, 'লাইব্রেরি তৈরির নাম করে নিজের আখের গোছানোর মতলব। কেউ কিছু বোঝে না, না?'

দীপক ভাবল, ছেলেটাকে নিয়ে চলা তো খুব মুশকিল। চারদিক থেকে অনেকে এগিয়ে এলো — অফিসের মধ্যে এসব কি! সমরকে সরিয়ে দিল। অনিন্দ্য তাকাল। যা আশা করেছিল, তাই-ই ঘটেছে। মনে মনে খুশী হ'ল। সবে তো শুরু!

৩.

কী আছে সেই হাতের মধ্যে? এখন কিন্তু সেই হাত আর আগের মতো নেই। পুরনো হাত পেয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। সেই হাতে শিরাতোলা শক্ত পেশী নেই। নেই ছড়িও। আছে আদর। ভালবাসা। শান্ত করস্পর্শ, যা ওর বাবারই। আসলে অনিন্দ বুঝতে পারছিল না কোনটা বাবার প্রকৃত রূপ— শান্ত, স্নেহ প্রবণ পিতা, না ক্রোধী শাসন করতে থাকা এক ভয়াল পুরুষ! প্রথমে বাবার ওপর যে ক্রোধের জন্ম হয়েছিল, পরবর্তী সময়ের স্নেহ, ভালবাসা, আদরে সেই সবই যেন গলে-মিশে জল হয়ে গেছে।

ওর মনে যে সন্দেহ জেগেছিল, প্রথম তো সবাই হতে পারে না। ক্লাশের একটি মাত্র ছেলেই প্রথম হয়! তাহলে অন্যান্য যারা, তাদের প্রথম না হতে পারা কি অপরাধ? অথবা এই ন্যায় অন্যায় বোধ ওর ক্ষেত্রে ভিন্ন!

হ্যাঁ ভিন্ন। ওর ক্ষেত্রে, ওর পক্ষে প্রথম হওয়া, সবাইকে পেরিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। বাবার স্নেহ— পাশাপাশি মা-ও এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। ওকে কোলে নিয়েছে। আদর করছে। তখন অনিন্দ্যর আর কোন রাগ নেই। বরং এক তীব্র জেদ জন্ম নিচ্ছিল।

'বাঁচতে হলে প্রথম হয়ে, সবার সেরা হয়েই বাঁচতে হবে। যেন তেন প্রকারে কেন্নোর মতো বাঁচার কোন মানে হয় না।'

সেই কথাটা সেই হাতের মতো এখনো ওর বুকের মধ্যে ছবি ও শব্দ হয়ে আছে। যে মানুষটা ওকে ভালবাসে, তাকে খুশী করতেই হবে। তার কথাটা রাখতেই হবে। অনিন্দ্য চেতনার গভীরতম স্তর থেকে সেই ঘন, জমাট, গভীর অনুভূতির উষ্ণ স্পর্শ পেলো, যা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার সাধ্য ওর নেই।

অনিন্দ্য বিয়ে করেনি। বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্ততঃ ও সেই রকমই মনে করে। ওর রুগ্ন শরীর, দু'বার টি. বি-র আক্রমণ যা বিবাহিত

জীবন সম্পর্কে তৈরি করেছিল দুর্বলতা। ভীরুতা।

তবুও মনে-প্রাণে এই জীবনও সে গ্রহণ করতে পারেনি। অস্থিরতা ছিল। অতৃপ্তি ছিল। প্রত্যেক মানুষই বেঁচে থাকার জন্য একটা অবলম্বন খোঁজে। সঙ্গী চায়। চায় আশ্রয়। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনহীন জীবনে ওর সেই আশ্রয়স্থল ক্রমে ক্রমে সরে আসছিল বাবার কথাগুলোর মধ্যে। শ্রেষ্ঠ হওয়ার তীব্র ইচ্ছার মধ্যে। জীবনের সমস্ত জমাট রহস্য যেন সে সেখানেই খুঁজে পেতে চাইছিল, যা হারানো চলবে না। চলে না।

অনিন্দ্য প্রতিবারই প্রথম হয়ে এসেছে। প্রতি জায়গাতেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেছে, কারণ সেটাই ওর বাঁচা। একমাত্র বেঁচে থাকা।

কিন্তু এখন কি করে অনিন্দ্য! এখন কি করবে? জীবনে এরকম সমস্যায় কখনো পড়েনি। ইতিমধ্যেই দু'জন সদস্য কর্মী অ্যাসোসিয়েশান ছেড়ে ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে ওর সিংহাসন কেড়ে নিচ্ছে দীপক। ওর বেঁচে থাকার ভীত নড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ ও কিছুই করতে পারছে না। ওর চোখ বসে যাচ্ছে, ঈর্ষা জন্মাচ্ছে, উদারতা কমছে।

দীপক যেভাবে এগোচ্ছে, এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, এখানে টিঁকে থাকা যাবে না। অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হবে। ক্ষমতাহীন, প্রতিপত্তিহীন অবস্থায় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সেটা মৃত্যু, ওর মৃত্যুই।

দিনে দিনে রুগ্ন শরীর আরও রুগ্ন হতে লাগল অনিন্দ্যর। চোখের নিচে কালি পড়ল। মুখে না-কাটা দাড়ি। তখন একটা ভাউচার এল। চমকে উঠল অনিন্দ্য। ভাউচারটা দীপকই করেছে। পাঁচ হাজার টাকার একটা এম টি। জমা হবে দীপকের মা ও দাদার জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে। ভাউচার হাতে নিয়ে ক' মুহূর্ত ভাবল অনিন্দ্য—যদি পাঁচ হাজারের আগে আরেকটা পাঁচ বসিয়ে দেয় এবং ওয়ার্ডসে লেখার জায়গার শুরুতেই দীপকের লেখা নকল করে লেখে 'ফিফ্‌টি', তাহলে কী হয়!

যখন ব্যালান্‌স্‌ তোলা ও মেলান হবে, প্রশ্ন উঠবে ভাউচার কে করেছে? কোন অ্যাকাউণ্টে জমা পড়েছে? একটা সুস্পষ্ট জালিয়াতির চেষ্টা!

অনিন্দ্য ক' মুহূর্ত ভাবল। দীপককে প্রতিরোধ করতে এ' ছাড়া উপায় নেই। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সুযোগ বেশি আসে না। সে ভয়ে ভয়ে পাঁচকে পঞ্চান্ন করে এবং আরও কয়েকটা কাগজপত্র ঠিক-ঠাক করে ভাউচারটা কাউণ্টারে রেখে এলো। কেউ দেখেনি। যে অফিসারটা সই করেছিল, মাঝখান থেকে

সেই নির্দোষ লোকটাও ফেঁসে যাবে। যাক! পরে দেখা যাবে।

* * * *

ব্রাঞ্চে তুমুল হৈ-চৈ। দীপক ও সিগনেটরী অফিসার ধরা পড়েছে। কিন্তু ওরা কিছুতেই বোঝাতে পারছে না, এই কাজ ওরা করেনি। জয়ন্তী দীপককে অন্য চোখে দেখছে। ওর সংগঠনের লোকেরাও চুপসে গেছে। কর্মচারীদের মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ঝড়ের মতো বহে যাচ্ছে।

বুকের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করছে অনিন্দ্য। সে এককোণে নিজের টেবিলে মাথা নীচু করে বসে আছে। ওর চারপাশে সকলেই দীপক সম্পর্কে নানা কথা বলছে—কিন্তু অনিন্দ্যর সেদিকে মন নেই। তখন সেই হাত আবার চলে এলো ওর চোখের সামনে। বাবার সেই কথা বুকের মধ্যে। মস্তিষ্কের কোষে।

শ্রেষ্ঠ হওয়া, প্রথম হওয়া ছাড়া ওর বাঁচার কোন উপায় নেই, কিন্তু এভাবে! এরকম অসৎ ভাবে একজনের সর্বনাশ করে! ওকে আবার অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত, বিপর্যস্ত লাগল। চোখ বন্ধ করল। বাবার সেই হাত যেন ফাঁস হয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো। কণ্ঠ রোধ করল। দম বন্ধ হয়ে এলো, হাওয়া চাই, একটু হাওয়া চাই ওর। গলা দিয়ে অস্পষ্ট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, কি করবে —এখন কী করবে অনিন্দ্য!

কিন্তু সেই হাত শুধু ছবিই। বুকের ছবি। কথার উত্তর দেয় না।

গন্ধপোকা

প্রিতম মুখোপাধ্যায়

জুনের এক গুমোট বিকেল। সূর্য নেই, তবু সারাদিনের অসহ্য উত্তাপটুকু এখনো কমেনি। একদিকের ফুটপাত ধরে হাটছিল নীলকমল। আর সামান্য এগিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই চৌমাথার মোড়। করিতকর্মা লোকের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে সে সামনের মোড়ের দিকে পা বাড়াল। এখন থেকেই রাস্তার ধারে, আনাচে-কানাচে লোক জমতে শুরু করেছে। চৌমাথায় এসে একবার দাঁড়াল নীলকমল। মনে মনে পরিকল্পনাটা ঠিক করে নিল। সমস্তরকম সন্দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য হাল্কা শিস সহ চুল আঁচড়ে নিল দোকানের আয়নায়। আড়চোখে আশপাশের বাড়ী, কাঁচের জানলা, উৎসুক জনতায় চোখ বুলিয়ে নিল একবার।

সবে পাঁচটা দশ। অন্তত আরো চল্লিশটা মিনিট হাতে আছে। বিকেল পাঁচটার তুলনায় একটু বেশিই গরম লাগছে। এই তো গতকালই ঝমঝমে বৃষ্টি হয়েছিল। রাতে ঠাণ্ডা হাওয়া। গতরাতেও রেগুলেটার কয়েক পয়েণ্ট কমাতে হয়েছে। হয়তো ভেতরের চাপা উত্তেজনার জন্যই গরমটা বেশি লাগছে। অন্যদের কপাল, গলা বা বগলের তুলনায় নিজেকে আরো ঘর্মাক্ত মনে হচ্ছে যেন। রুমালে ঘাড়-মুখ মুছে সমস্ত অবসাদ কাটাতে চেষ্টা করল নীলকমল। অবশ্য একটা লোকের মাত্রাতিরিক্ত ঘাম বা তদ্রূপ চেহারা নিয়ে মাথা ঘামানোর দায় এখন কারোমধ্যেই নেই।

তবু ব্যাপারটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। নিজের নিরাপত্তার জন্যই। কারণ আর চল্লিশ মিনিট বাদে সমস্ত ঘটনার মোড়, ছিটকে উঠে, অন্য দিকে ঘুরে যাবে। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই জনতার মাঝখানে মিশে যেতে হবে তাকে, কাউকে এতটুক সুযোগ না দিয়ে আতঙ্কিত, রুদ্ধশ্বাস জনতার গায়ে গা ঘেঁষে লুকিয়ে ফেলতে হবে নিজেকে।

নীলকমল রাস্তার দিকে তাকাল। একটা খোঁড়া লোক ভিক্ষে চাইছে। হতেই পারে যে লোকটা আদৌ খোঁড়া বা ভিখারি কোনটাই নয়; হয়তো একটা সাদা পোষাকের পুলিস। সামনেই একজন স্মার্ট পুলিস অফিসার লোকেদের ফুটপাথে উঠে যেতে আদেশ করছে। ফুটপাথের ধারে বেড়ার নিষেধ। ফাঁক গলে রাস্তার জনতা ভেতরে চলে যাচ্ছে। উত্তর কি দক্ষিণে যতদূর দেখা যায় প্রায় খাঁ খাঁ রাস্তা। মাঝে মধ্যে দু-একটা গাড়ীর চকিত পলায়ন। এই রাস্তা ধরে উনি আসবেন। এই মোড়ে উনি সামান্য দাঁড়াবেন। একটা বাচ্চা মেয়ে ওঁর গলায় মালা পরিয়ে দেবে।

ভীড়ের মধ্যে পথ করে, সানগ্লাস পরা ভারী চেহারার একটা লোক এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে। হাল্কা আতরের গন্ধ পেল নীলকমল। মনে পড়ল, সেদিনের সেই মোড়কের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণে টাকা, খাপেঢাকা ফোল্ডিং ছাতা আর আতরের একটা শিশি। টাকাটা গুণে পকেটে রেখেছিল। খাপটা হাতে নিয়েই বুঝেছিল ছাতা নয়, ভেতরে রিভলভার। তারপর আতরের শিশিটার দিকে তাকাতে ওদের একজন বলল, ,ঐ গন্ধটাই আমাদের সিম্বল। মাইন্ড ইট।'

সানগ্লাসপরা লোকটা আরো দূরে চলে যাচ্ছে। গন্ধটা ভাসছে হাওয়ায়। কিন্তু তবু কোনরকম ঔৎসুক্য দেখাল না নীলকমল—এইসব বিচিত্র পরিস্থিতির প্রভাব থেকে উদাসীন না থাকলে সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে।

এই ধরণের কাজকর্মে তার অভিজ্ঞতা খুব একটা বেশিদিনের নয়। বলতে গেলে এই প্রথম সে একজনকে খুন করতে চলেছে। আঘাত করতে চলেছে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। টাকাটা কম হলে সে কখনই এইসব আবোল-তাবোল রাজনৈতিক ব্যাপারে নিজেকে জড়াতো না। কিন্তু মুশকিল এইটাই যে সে কখনই তার উদভ্রান্ত লোভ বা হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাবার ইচ্ছেটাকে দমন করতে শেখেনি। ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে সে কোনদিনই আগ বাড়িয়ে চিন্তা করেনি বরং প্রতিটি মুহূর্ত আর তার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সে অত্যন্ত দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করেছে।

গুলিটা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার গতি তীব্র মোচড় দিয়ে লাফিয়ে উঠবে। সিকিউরিটির ছোটাছুটি, হুইসেল সংকেত, জনতার ইঁদুর-পলায়ন। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষিপ্রতায় লুকিয়ে ফেলতে হবে নিজেকে। সাদা পোষাকের পুলিস ছাড়া আর কারো দিক থেকেই বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। হয়তো পালাবার

সময়, সিকিউরিটির অব্যর্থ লক্ষ্য তার মাথা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে, কিন্তু তাই নিয়ে এতটুকু চিন্তিত নয় নীলকমল।

পেছনে গলির মুখে একটা সাদা এম্বাসাডার। গুলির শব্দ পেতেই গাড়ীটা এগিয়ে এসে যেন বেরোতে চাইছে এমন নিরীহভঙ্গিতে গলির প্রবেশপথ বন্ধ করে দেবে। আর তার ফাঁক গলে ডানদিকের প্রাইভেট বাইলেনে ঢুকে যাবে নীলকমল। ওটা একটা রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স। ভিক্টোরিয়া ম্যানসন। সামনে লম্বা ইউকেলিপ্টাস—পেছনে স্কাইস্ক্র্যাপার। ম্যানসনের পেছনের গেট অন্য রাস্তায়। সেখানে অপেক্ষা করছে ব্ল্যাক এম্বাসাডার। মাঝের এই আঁকাবাঁকা রাস্তা আর অবশেষে কালোগাড়ীর নিরাপদ আশ্রয়। বাস্, তারপর ষাট, সত্তর কি আশীর স্পিডে আরো অনেক—অনেক দূরে মিলিয়ে যাবে সে।

লটবহর নিয়ে টি.ভি-র লোকেরা এসে পড়ল। অমনি জনতার ডেলা সরে গেল সেদিকটায়। ঘড়ি দেখল নীলকমল। আরো বিশ মিনিট। এর মধ্যেই তৎপরতা বেড়ে গেছে। পুলিসরা পজিসান নিচ্ছে রাস্তার ধারে ধারে। তার মানে, এই জনতার মধ্যেও মিশে রয়েছে সাদা পোশাকের নিরাপত্তা রক্ষক। এতটুকু বেচাল দেখলেই অলআউট ঝাঁপিয়ে পড়বে। ডানবাঁয়ে প্রত্যেকটা মানুষকে সন্দেহ করছিল—যদিও এ নিয়ে সে যে খুব একটা চিন্তিত, তাও নয়।

এখন শুধু দুটো ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। প্রথমত, এয়ারপোর্টে ও'র বিমান ঠিক সময়ে এসে পৌঁছল কিনা এবং দ্বিতীয়ত গলায় মালা দেবার পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত বহাল আছে কিনা। নিরাপত্তাকর্মী আর টি.ভি-ওলাদের ব্যস্ততা দেখে দুটো ব্যাপারেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে নীলকমল। মালা নেবার জন্য উনি নিশ্চয়ই বুলেটপ্রুফ গাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াবেন। বা যদি গাড়ীর কাঁচ নামিয়ে মাথাটা সামান্য বাইরে নিয়ে আসেন তাহলেও কাজটা সেরে ফেলতে বিশেষ অসুবিধে হবে না। সবার অলক্ষ্যে খাপের বাইরে নিয়ে আসতে হবে রিভলবার—তারপর ঠিক শূন্য মুহূর্তে কয়েক পা সরে গিয়ে ট্রিগারে চাপ আর ডান হাতের নিভুর্ল ঝাঁকুনি।

রিভলবারের কথাটা মনে পড়তেই ফোল্ডিং ছাতার মোড়কটা একবার হাতবদল করে নিল। ওপরের বোতাম খুললে দেখা যাবে ছাতার কালো ডাঁটি। যাতে কারো কোনরকম সন্দেহ না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা। কালো হ্যাণ্ডেলটা আলতো করে রাখা আছে ওপরে, তলায় মারণাস্ত্র। পাইলট ভ্যানের আর্ত সংকেত পেলেই পুট করে, আঙুলের চাপে. খুলে যাবে মোড়কের বোতাম। স্রেফ এই পর্যন্ত চিন্তা করেই নীলকমলের চোখেমুখে সাফল্যের সুষমা ছড়িয়ে

পড়ল।

আর মাত্র দশটা মিনিট। টি. ভি. ক্যামেরাম্যান শেষ প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে। ব্যাটারিচালিত সানগানদুটো একবার জ্বালিয়ে ঔজ্বল্য পরীক্ষা করে নেওয়া হল। ভাগ্য ভাল যে জনতার সমস্ত আগ্রহ এখন টি. ভি ক্যামেরার দিকে কেন্দ্রীভূত। কয়েক পা পিছিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় সরে গেল নীলকমল।

সত্যি বলতে কি, এইবার নীলকমলের মধ্যে একটা উত্তেজনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কনুই-এর তলা থেকে ডানহাতটা একবার কনকন করে উঠল। অপর হাতে ডানকব্জিটা চেপে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সামান্যক্ষণ। সত্যিই বড় বেয়াড়া ধরণের গরম পড়েছে। মুখের ভেতর তেতো আর টকটক স্বাদ। নিঃশ্বাসের গরম হলকা। লম্বা করে বুকভর্তি শ্বাস নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আতরের হাল্কা গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ল নাকে, মাথায়।

লাল পতাকা দুলিয়ে একটা জীপ চলে গেল। এইবার যে কোন মুহূর্তে উনি এসে পড়বেন। দূরে আগমন সংকেত। যেমন ভাবা ছিল সেইভাবেই হাতের সামান্য চাপে প্যাকেটের বোতামটা খুলে ফেলল। কিন্তু ডানহাতটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। ঠিক প্রয়োজনের সময় নিজের এই সামান্য অক্ষমতাটিকে এতটুকু আমল দিতে চায় না নীলকমল। ঐ হাতটার এখন অনেক দায়িত্ব। হাতটাকে ঝাঁকালো, তারপর কব্জি ঘুরিয়ে, মুঠো খুলে বন্ধ করে সমস্ত জড়তা কাটিয়ে নিতে চেষ্টা করল। রাস্তার ও মাথায় ফুটে উঠল কয়েকটা মটরবাইক।

দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, তার মানে কাঁটায় কাঁটায় একদম ঠিক সময়ে, ঠিক পাঁচটা উনপঞ্চাশ মিনিট কয়েক সেকেন্ডের মাথায় উনি ঢলে পড়বেন মৃত্যুর অবধারিত অন্ধকারে।

জনতা ধ্বনি দিচ্ছে। ওঁর কালো গাড়ী—চারপাশে সিকিউরিটির বেড়াজালসহ ধীরছন্দে এগিয়ে আসছে। কালো গাড়ী আর তার মধ্যে উপবিষ্ট ধপধপে উনি ছাড়া আর কোনদিকেই খেয়াল নেই নীলকমলের। এবার সে ডানহাতটাকে পকেটের বাইরে আনতে চেষ্টা করল। কিন্তু আশ্চর্য, বার করে আনার শেষ শক্তিটুকুও যেন নিঃশেষিত। যেন ইতিমধ্যেই অস্পষ্ট অথচ ভয়ংকর কোন সম্ভাবনার আশঙ্কায় জুবুথুবু হয়ে পড়েছে ডানহাত।

অথচ আর সময় নেই। দশ-পনের ফুটের তফাতে কালো-গাড়ীটা হল্ট করেছে। ঠোঁট কামড়ে হাতটাকে চালু করতে চেষ্টা করল। নিজেকেই একটা খিস্তি করল। যেন ঐ অবাধ্য হাতটার মালিক সে নয়, অন্য কেউ। গাড়ীর দরজা খুলে উনি বাইরে এলেন। হাততালি দিয়ে উঠল সমবেত জনতা। উড়ে

গেল, একঝাঁক রঙীন বেলুন। ঐতো, মালা হাতে এগিয়ে আসছে একটা বাচ্চা মেয়ে। উনি আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। জ্বলে উঠল সানগান। ক্যামেরাম্যান ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। উনি সামান্য মাথা নামালেন। বাচ্চাটা গলায় মালা পরিয়ে দিল। মৃদু হেসে, বাচ্চার গালে আলতো হাত বোলালেন। জনতা 'জিন্দাবাদ' করে উঠল। ঠোঁটে গর্বিত হাসি, জনতার দিকে হাত নেড়ে নেড়ে উনি পিছিয়ে যাচ্ছেন গাড়ীর দিকে।

'এখনও সময় আছে—।' শেষবারের মতো ককিয়ে উঠল সে। যেন তার নিঃশ্বাস জমাট হয়ে গেছে, অবরুদ্ধ প্রচেষ্টায় চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালে, নাকের নীচে ঘাম জমছে। তবু নিশ্চল হাতটাকে এতটুকু নাড়াতে সমর্থ হল না নীলকমল। শুনল, গাড়ীর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, সংহর্ষ জয়ধ্বনি, হাততালি এবং পাইলট ভ্যানের 'ওঁয়া - ওঁয়া' সংকেত।

গাড়ীগুলো ধীরে ওঁনার পেছন পেছন চলতে শুরু করল আর প্রত্যেকটি উষ্ণ নিঃশ্বাসের টানে ভেতরে কেঁপে উঠতে থাকল নীলকমল। দর্শনশেষে লোকেরা ছড়িয়ে যাছে। একজন কি যেন জিজ্ঞেস করল কিন্তু উত্তর দেবার জন্য ওঁর ঠোঁটদুটো নড়ে উঠলেও গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হল না। তাহলে কি প্রতিটি অঙ্গই অকেজো হয়ে গেছে? ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য মাথাটা কয়েকবার ডান-বাঁ ঘুরিয়ে নিল। লক্ষ্য করল, পেছনের সাদাগাড়ীটা একটু একটু করে চলতে আরম্ভ করেছে এবং অদ্ভুতভাবে সেই আতরগন্ধ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নাকে এসে লাগল।

চকিতে, ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল নীলকমল। বুঝতে পারল, এইবার ওদের বিষাক্ত ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। যদিও এই আশুবিপদ সম্পর্কে ও মোটেই চিন্তিত নয় বরং শারীরিক অক্ষমতার কারণটা বুঝতে না পারার জন্যই বিরক্তি বোধ করছিল।

ভীড়ের মধ্যে লম্বা পা ফেলে ও এগিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিমদিকে। রাস্তায় গাড়ীর জটলা, ফাঁকফোকর গলে লোকেরা রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। আরো কিছুটা এগিয়ে একটা ট্যাক্সি পেল নীলকমল। কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। পশ্চিমাকাশে এখনো লাল-বেগুনি আলো ছড়িয়ে রয়েছে। আপাতত ট্যাক্সিকে গঙ্গার দিকে চালাতে বলল সে। ঠিক করল, গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ মাঠ, সেই মাঠের অন্ধকারে মিশে গিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য আত্মগোপন করবে সে।

গঙ্গার ধারে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেবার আগে নীলকমল নিশ্চিন্ত হল যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। ঝুলে থাকা ডানহাতটার দিকে একবার অসহায়ের

মতো তাকাল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, নিজের ব্যর্থতা সে এখনো মেনে নিতে পারেনি।

রাস্তার ধারের গাছতলাগুলো ফাঁকা, বরং ভেতরের দিকে পর পর গাছে হেলানো মশগুল বসে আছে প্রেমিক-প্রেমিকার দল। দূরে কাছে ফুচকা, ঘড়াভর্তি চা, চিনেবাদামের ফুরফুরে মেলা। রাস্তা থেকে দেখা যাবে না এবং সহজে কারো পা পড়বে না এমন একটা নিরাপদ জায়গা দেখে বসে পড়ল নীলকমল। একটু শুতে পারলে ভাল হত। চিন্তা করার ব্যাপারে যদিও তেমন পোক্ত নয়, তবু এই মুহূর্তে চিন্তিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার।

চিন্তার শুরুতে চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই তেকোণা ঘরটা। একটা টেবিল ল্যাম্পের তলায় তিনজন মোটাসোটা লোক, ভারী সোফার মধ্যে বসে কতকগুলো রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করছে। পেছনের দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ছিল ওদের কালো ছায়া। প্রতিটি কথাতেই মাথা নেড়েছিল নীলকমল কারণ রাজনীতি নয়, টাকার অংকটাই ছিল তার ধর্তব্যের বিষয়। সবচেয়ে মোটা লোকটার ঠোঁটের দুপাশে জমাবরফের মতো সাদা দাগ। কথা বলার সময় দাগটা ছোট-বড় হচ্ছিল। শুধু টাকার কথাটা বলার সময়, মাত্র একবারই, লোকটার দাঁতের খয়েরি পেছনদিক, চকচকে লালা ও জিভটাকে দেখতে পেয়েছিল সে।

ঘাসের বিছানায় শুয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই দৃশ্যটা আবার দেখতে পেল নীলকমল। ওপরে হাল্কা মেঘ, তারা, ফিকে স্লেটরঙের জ্যোৎস্নাময় আকাশ। নরম হাওয়া বইছে। ট্রেনের জানলায় বসা ঘুমন্ত বৃদ্ধের মতো আকাশের মধ্যে ঢুলে পড়ছে গাছের মাথাগুলো। গুলিটা ছুঁড়তে পারলে জনতার প্রিয় নেতা এতোক্ষণে ঐ গাছ বা তারাদের মতো নির্বাক অমরত্ব লাভ করত। মনে মনে হাসল নীলকমল। সামান্য রসেকতা করে যতটা সম্ভব হাল্কা হতে চেষ্টা করল।

নীলকমল বুঝতে পারছিল, যারা টাকা দিয়েছে, যাদের গোপনীয়তার অনেকটাই ওর জানা — তারা এত সহজে ব্যাপারটাকে হজম করে নেবে না। মনে মনে অনুশোচনা হল, যেহেতু এই ব্যর্থতার দিকটা এবং তার পরের কাজগুলো আগেভাগে চিন্তা করেনি সে। টাকাগুলো একটা বিশেষ জায়গায় লুকোনো আছে। আর যাই হোক, সেখানে তো একবার যেতেই হবে। অথচ এইদিকটা কখনোই সে ভেবে দেখেনি। গুলিটা যে অব্যর্থ হোতই তারও কোন মানে নেই—এ রকম একটা অবস্থার মধ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই পারত। কিন্তু যা হয়েছে সেটা যে আরো অনেক শোচনীয়। ওরা নিশ্চয়ই এটাকে একটা পরিকল্পিত

প্রবঞ্চনা বলেই ধরে নিয়েছে। না, কাপুরুষ ভাবার মতো এতটা দয়া ওরা দেখাবে না। ঠোঁটে বরফজমানো লোকটা একটা পাগলা কুকুরের থেকেও বিপদজনক।

একটা কুকুরের ডাক শুনতে পেল নীলকমল। উঠে বসল। একটা ফেঁতীর বাচ্চা পেছনের অন্ধকার থেকে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। ডান-বাঁয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার। কোনাকুনি, গাছের তলায় এক অস্পষ্ট চুমু খাওয়ার দৃশ্যে চোখ বসে গেল। চুকচুক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বেশ মজা লাগল। তড়িঘড়ি নিজের শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিল একবার।

আরো কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। আর মজা নয়. এবার রাগ হতে থাকল। আজকের দিনটা ক্রমাগত তাকে উত্যক্ত করে যাচ্ছে। এই আকাশ, তারা. গাছের স্থিরচিত্র থেকে আরম্ভ করে চুম্বনরত পুরুষ ও নারী. তাদের প্রেম ও শরীর ঘিরে গড়ে ওঠা সুস্থজীবন যেন তুষারপাতের মতো নিঃশব্দ হাহাকার ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার মধ্যে। খাপেভরা রিভলভারটা মুঠোয় তুলে নিল। চোখ বন্ধ করল দৃঢ়ভাবে। যতই ইচ্ছে হোক আর কিছুই দেখবে না নীলকমল। বুলেট জীবন ছাড়া আর কোনদিকেই ফিরে তাকাবে না সে।

এগুলো প্রত্যেকটাই অত্যন্ত বিপদজনক ফাঁদ। এইরকম একটা বিপর্যয়ের সময় হয়তো সেই ভালভাবে বেঁচে থাকরে ইচ্ছেটা মাথার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। যা হয়না তা নিয়ে চিন্তা করা অর্থহীন। এখন যে করেই হোক. ভোরের আগেই, লুকোনো টাকার কাছে ফিরে যেতে হবে তাকে। তারপর একটা ট্রেন। নতুন পরিচয়ে, নতুন কোন একটা জায়গা।

চোখ বন্ধ রেখে আবার ঝুপ করে শুয়ে পড়ল। হাঙ্গামা আর ছোবল এড়িয়ে কি করে গা ঢাকা দেবে সেইটাই ছকে নিচ্ছিল মাথার মধ্যে। আর কোন ধান্দা যদি নাও করে, যা টাকা আছে, মেয়েছেলে সহ নানান ফুর্তিফার্তার একটা জীবন সহজেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। চিন্তাটা প্রথম থেকে অনেকদূর গড়িয়ে গিয়েছিল. তার মধ্যেই আতরের তীব্র গন্ধটা ঝাপটার মতো নাকে এসে লাগল। ছিটকে উঠে পড়ল। দ্রুত দেখে নিল চারপাশ। মাঠ প্রায় ফাঁকা। লম্বা নাক টেনে গন্ধটা বুঝতে চেষ্টা করল। হ্যাঁ আছে, এবং গন্ধের উৎসটা কাছেই।

নেশাধরানো সেই আতরের তীব্র ঝলক। মাঠের আরো ভেতরের দিকে ছুটতে শুরু করেছিল। মনে পড়ল, কুকুরের ডাকটা ওদিক থেকেই এসেছিল। ঘুরে দাঁড়াল নীলকমল। বড় করে শ্বাস নিল একবার। এবার আরো পরিষ্কার —পেছনের ঐ অন্ধকারেই গন্ধের উৎস। দূরে আলোকিত রাস্তা। সিধে ছুটে

গেলে ওদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করানো যাবে না। এমন চরম সময়েও মাথাটা কাজ করছে। আঁকাবাঁকা ছোটায় অনেকটা পেরিয়ে এসে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে। প্রতিটি পদক্ষেপেই আশঙ্কা করছিল, একটা গুলি ঐ পেছনের অন্ধকার থেকে ছুটে এসে তার মাথা চিরে বেরিয়ে যাবে।

হাঁফাচ্ছিল নীলকমল। যে কোন উপায়ে বিপদসীমা অতিক্রম করে যেতে হবে। আক্রমণকারীরা কোনদিকে এবং সংখ্যায় কতজন সে হিসাবটা নির্ভুল হওয়া দরকার। শুধু ঐ ভয়াবহ গন্ধটা ছাড়া, সন্দেহজনক আর কিছুই তার চোখে পড়েনি। মুখে, ঘাড়ের ঘাম মুছে নিল।

বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল নীলকমল। আসলে এমন একটা নিরুপায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যাওয়ার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। মাঠ প্রায় ফাঁকা। প্রেমিক-প্রেমিকার দল, ফেরিওলা প্রায় সকলেই চলে গেছে। মৃদু হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে গাছ থেকে গাছে। পাতা নড়ছে। ঘাসের ওপর তাদের ছায়া নড়ছে। এমনকি সেই গন্ধটারও আর কোন হদিস নেই। তাহলে সবটাই হয়তো মনের ভুল। বা হয়তো ঐ একই আতর ব্যবহারকারী কোন রাজসিক প্রেমিক।

হাসি পেল নীলকমলের। খামোকা ভয় পাওয়ার জন্য নিজেকে তিরস্কার করল। তারপর আরো নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস নিল। একটা ফুলের গন্ধ। হাল্কা স্নিগ্ধতা মেশানো বুনো গন্ধ। গাছটাকে ভাল করে দেখল। পলাশ বা ঐ জাতীয় কিছু একটা। নামটা মনে পড়ছে না, কিন্তু গাছটাকে খুব চেনা লাগল। কোনদিনই গাছেদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া ছিল না, তবু তার প্রাণীসত্তার গভীর থেকে যেন ছোটবেলার স্মৃতি ভেসে উঠতে থাকল। একসময় নীলকমলের চারপাশে একটা সংসার ছিল। ছিল বাবা, মা আর ছোট দুই বোন। ছিল উঠোনছাওয়া কাঁঠালগাছ। গ্রীষ্মের দুপুরে কাঁঠালের ঠাণ্ডা ছাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল তার কৌতুহলের শৈশব—ভোঁতা যৌবন। তারপর নানান ঘাটে-অঘাটে ধাক্কা খেয়ে আজ সে ভাড়া করা গুণ্ডা। টাকায় রফা হলে কোনকাজই তার অসাধ্য নয়। ছাতার খাপটাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরল। ভেতরে রিভলভার। পুট করে বোতাম খুলে কালো যন্ত্রটা বার করে আনল। ওরা যদি আক্রমণ করে, নীলকমলও ছেড়ে কথা বলবে না।

ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করল নীলকমল। সময় বোঝা যাচ্ছে না। আবার দম নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আতরের গন্ধটা সরাসরি তার বুকের ভেতরে গিয়ে সপাটে আছড়ে পড়ল যেন। মনে হল, এবার গাছের ওপর থেকে ওটা ভেসে আসছে। হয়তো পাতার ফাঁক দিয়ে আসা জ্যোৎস্না ভেদ করে গুলি ছুটে

আসবে। টিকটিকির মতো শরীরটাকে গাছে সেঁটে ধরে সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করল। এবার তার ভয় করছে। গলা, ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে। এখনই পালাতে হবে। সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল নীলকমল।

পায়ের তলা থেকে ঘাসের মাঠ পিছলে যাচ্ছে। ফাঁকা ফুটপাত। রাস্তা। দু-একটা ধাবমান গাড়ী। গাড়ীর চাপা হর্ন। রাস্তা পেরিয়ে গেল নীলকমল। একটা ট্রাফিক পুলিস ঘুরে লক্ষ্য করছে। রাস্তার ওধারে জড় করা রাবিশ। কোনক্রমে টাল সামলে নিল। গন্ধটা এখনো তাকে তাড়া করছে। আরো দূরে চলে যেতে হবে। সকলের থেকে দূরে। একটা নতুন দেশ। একটা সমুদ্রঘেরা অদ্ভুত দ্বীপ। পাহাড়ের মাথায় বড়-উঁচু পাঁচিলওলা দুর্গ। দুর্গের গবাক্ষে কামানের মুখ। আঃ, চমৎকার।

টানা অনেকটা ছুটে এসে একটা অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল নীলকমল। আর দম নেই। নিজের ছোটার গতি দেখে নিজেই বেশ সন্তুষ্ট বোধ করল। মুখটা হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল। আতরের আর কোন অস্তিত্ব নেই বরং খুব কাছ থেকে একটা বস্তাপচা দুর্গন্ধ উঠে আসছে। শহরের বাতাসে জিলজিল করে ছড়িয়ে পড়ছে এই কটুগন্ধ। আহ্, লম্বা করে ঘ্রাণ নিল সে। চারপাশে তাকাল। দেখতে পেল, কয়েকহাত দূরেই দিগন্ত বিস্তৃত আঁস্তাকুড়, জঞ্জালের স্তূপ। সেদিকে এগিয়ে গেল নীলকমল।

দুটো কুকুর অদ্ভুত চাপাস্বরে গোঁ গোঁ করছিল। যুদ্ধপূর্বের প্রস্তুতি। নীলকমলকে দেখে দুজনেই চমকে উঠল। হঠাৎ এ সময় একটা মানুষের উপস্থিতি যেন ওদের হতবাক করে দিয়েছে।

'যাঃ—হুশ।' তাড়ানোর ভঙ্গি করল। লেজ গুটিয়ে স্তূপের ওধারে চলে গেল কুকুরদুটো। দুর্গন্ধকে আরো নিবিড় করে পাওয়ার জন্য আস্তাকুড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল নীলকমল। একটা টক্‌টকে পচা গন্ধ। কয়েকটা মাছির বোঁ বোঁ শব্দ।

বমি পাচ্ছিল নীলকমলের তবু ঐ সুগন্ধটাকে তাড়াতে পারার জন্য বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। সভ্যতার বুকের ওপর গজিয়ে ওঠা এই বদগন্ধের পাহাড় যেন অসামাজিকতার প্রবল উল্লাস। হ্যাঁ, সেইরকমই মনে হল নীলকমলের। যারা সুখে শান্তিতে বেঁচেবর্তে আছে তাদের প্রত্যেকের পেছনে যেন এক-একটা পদাঘাত। গন্ধটাকে বারবার বুক ভরিয়ে নিয়ে একটা নিষিদ্ধ মজা পাচ্ছিল। পৃথিবীটাকে ওরা যতটা চিত্তাকর্ষক ভাবে, জিনিষটা তার তুলনায় অনেক বেশী নোংরা আর হতকুচ্ছিত। গোলগাল গোলাপি জীবনকে চিরকালই ঘৃণা করে

এসেছে সে। আর তাই কোনরকম রাজনীতির ধারকাছ দিয়ে না গিয়েও ঐ ফর্সা, টুকটুকে নেতাটাকে সরিয়ে দিতে তার কোন দ্বিধা ছিল না।

অন্ধকার চোখে সহে গেছে। দেখতে পেল বাঁ পাশে কালো মতো একটা বড় ধরণের জন্তু পড়ে রয়েছে। মোষ হতে পারে। বা একটা কালো কুকুর— পচে, ফুলে ঢোল হয়ে গেছ। এধার ওধার তাকাল। জঞ্জালের মধ্যে পোঁতা একটা ছোটবাঁশ। হিঁচড়ে বার করে আনল সেটাকে। খিলখিলে হাসি উঠে আসছিল ভেতর থেকে। একটা চিৎকার করে ওঠার জন্য বুকটা উশখুশ করছিল। নিজেকে সংবরণ করল নীলকমল।

প্রথমে জন্তুটার ফোলা পেটে বাঁশের চুং মারল। ফেড়ে ঢুকে গেল বাঁশ। ছড়িয়ে পড়ল নীল ডুমো মাছি। কটু গন্ধ। আরো কয়েকবার এফোঁড়-ওফোঁড় চালিয়ে গন্ধটাকে দারুণভাবে উসকে দিল। উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা বিষাক্ত ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে যাক বদগন্ধ। বড়বড় বাড়ী, ফুলের বাগান, ঝকঝকে মেয়েছেলে তাদের হলুদ বাথরুম সমস্তকিছুতে ছেয়ে যাক নীল ডুমো মাছি আর এই বিষাক্ত ধোঁয়া। একটা পৈশাচিক আনন্দ নীলকমলকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

একসময় তার জামা ঘামে লেপ্টে গেল। হাতটা টনটন করে উঠল। ঘুরে উঠল মাথা। চোখের সামনে চাপচাপ অন্ধকার। ঝপ করে বসে পড়ল। বগলের তলা থেকে খসে রিভলভারটা গড়িয়ে পড়ল আস্তাকুঁড়ের মধ্যে।

বুঝতে পারল, যুযুধান দুই পক্ষের মাঝখানে হাস্যকরভাবে ঝুলে আছে সে। বমির মতো কি যেন উঠে আসতে চাইছে। বুকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অভূতপূর্ব মৃত্যুভয় ঘিরে ধরল নীলকমলকে। পেটের মধ্যে মোচড়। কাগজের মতো খসখসে, শুকনো জিভ, গলা। কয়েকটা টাকার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। লোকটাকে মেরে ফেললেও আত্মরক্ষার ঝুঁকি নিতেই হত। এবং সেই আত্মরক্ষার বিনিময়ে পাওয়া যেত আরো টাকা। আতরের গন্ধমাখা অনেক টাকা। হড়হড় করে বমি করল নীলকমল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, মৃত্যুকে আমি বড় সহজ ভেবেছিলাম।'

তার নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বমির প্রবল স্রোত। এক, দুই, তারপর আবার—পরপর তিন ঝলক বমি। থকথকে জঞ্জালের মধ্যে মুক্তোদানার মতো ছড়িয়ে পড়ল বমির বুদ্বুদ। সেই আস্তাকুঁড়ে ঠেসান দিয়ে এলিয়ে পড়ল নীলকমল। অবসন্ন দু চোখ বন্ধ হয়ে এল একসময়।

একটা নীল মাছি তার শুকনো, ফ্যাকাসে ঠোঁটের ওপর উড়ে বেড়াতে লাগল। দূরে তখন পাইলট ভ্যানের সংকেত শোনা যাচ্ছে। নেতা ফিরে চলেছেন এয়ারপোর্টে।

কুসুমতলা

নলিনী বেরা

চামটু সিং কিয়াঝরিয়া গ্রামের ফুটবল টীমের বরাবর ক্যাপ্টেন, সুধন্য গোল-কীপার, টুম্পা (ভাল নাম সত্যরঞ্জন) নাম করা স্ট্রাইকার। সেবার নারদা গ্রামের ফুটবল দল তাদের এই তিনজনকে 'বরো' নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করল। তাদের ম্যাচ ছিল চাঁদাবিলা 'ইয়ুথ ক্লাব'-এর সঙ্গে। বড় শক্ত টীম। নারদা একা একা তার সঙ্গে পারবে কেন? নারদার 'মাহাতো যুবক যুবতীরা সব এক কাট্টা, জিততেই হবে। জিতা চাই—বাই হুক অর বাই ক্রুক। 'বাই এনি মীনস' 'এ্যাট অল হ্যাজার্ডস'—এসব 'ইডিয়মস' তখন সুধন্যদের মুখস্থ। একেবারে কণ্ঠস্থ।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি এক দুপুরবেলা দড়ির খাটিয়া পেতে বারান্দায় ঘুমুচ্ছিল সুধন্য। খালি গায়ে শুলে দড়ির গিঁটের দাগ পড়ে যায় চাকড়া চাকড়া। একদিককার পিঠে যখন এমন্নি দাগ ধরে গিয়েছিল বেশ মোটা মোটা, সুধন্যর ঘুমটাও বেশ গাঢ় হচ্ছিল ধীরে ধীরে—ঠিক তখনই তিনটে সাইকেল 'বেল' বাজিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সাইকেল আরোহীদের এক পা সুধন্যদের রাস্তার ধারে মাটির দাওয়ায় আরেক পা তখনও সাইকেলের প্যাডেলে। তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, 'তুমি সুধন্য না?' —'হুঁ, কিন্তু কি ব্যাপার?' সে বলল 'সামনের রোববার আমাদের একটা ম্যাচ আছে। চাঁদাবিলা ইয়ুথ ক্লাব ভার্সেস নারদা। আমরা নারদার হ'য়ে তোমাদের তিনজনকে বরো নিতে এসেছি।' বরো? স্বভাবতই সুধন্যর ফাণ্টা একটু বেড়ে গিয়েছিল। প্রথমে সে চুপ করে থাকল একটুক্ষণ। এসব ক্ষেত্রে খেলিয়ে খেলিয়ে দর বাড়াতে হয় অথচ সে সময় কোথা থেকে ছিটে ফোঁটাও ডাক এলে সুধন্যরা বর্তে যেত। পরে গম্ভীর হয়ে সে বলেছিল, 'আমার অসুবিধা আছে।' বলতেই লোকগুলো সাইকেল ছেড়ে সুধন্যর খাটিয়ায় উঠে বসল, হাত ধরাধরি শুরু করল। বারবার বলতে লাগল, 'এবারের মত

বাঁচিয়ে দাও ভাইটি, সারা নারদা গ্রামের 'পেস্টিজ' বলে কথা!' সুধন্য এঁড়ে বাছুরের মত ঘাড় নেড়ে সেই এককথা বলে যেতে লাগল, 'আমার অসুবিধা আছে, আমার অসুবিধা আছে—।' কি অসুবিধা, কেন খেলতে পারছি না, ইত্যাদি কবুল না করে দর বাড়াতে বাড়াতে অবশেষে সে বলেছিল, 'আচ্ছা, তোমরা ক্যাপ্টেন চামটু সিং-এর কাছে যাও।'

চামটু সিং-কে পাওয়া খুব সহজ ছিল না। সে প্রচণ্ড রকমের গরীব। তার ওপর সে বিয়ে করে বসেছিল এরই মধ্যে। ঘাস কেটে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি যোগান দিয়ে সংসার নির্বাহ করতে সে এখন ভারি ব্যস্ত। তাকে পাওয়া গেল অর্জুনতলায় দিগো বেহেরার পাটক্ষেতের ভিতর, সে পিরো দণ্ড়পাটের মোষের জন্য ঘাস ছুলছিল দা দিয়ে। নারদা গ্রামের সেই তিনজন তাকে ধরা-ধরি করায় সে ঘাস কাটা থামিয়ে কোমরে দা গুঁজে কোনক্রমে ঘাসের বাণ্ডিল ডেলিভারী দিয়ে এল পিরো দণ্ড়পাটের বাড়ি বয়ে। তারপর চামটু সিং দা দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে ক্যাপ্টেনী গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'অসুধিবার কথা বলছিলি সুধন্য কই কি ধরণের অসুবিধা শুনি? কোথাও কোন চোট আছে কি?' সুধন্য তাকে ধাপ্পা দিয়ে বলেছিল, 'সে তোমাকে পরে বলব, তাছাড়া আমার মা—।' চামটু সুধন্যর কথার মাঝখানে বলল, 'আচ্ছা তবে খুড়ীমাকে বলি? আমি বললে—।' এই বুঝি সুধন্যর দাম ক জন বহিরাগত লোকের সামনেই তরতর করে পড়ে যায়, একেবারে মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে সুধন্য, তাই চামটুর মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বলে উঠেছিল, 'এখন খবরদার না, পরে একসময় পটিয়েসটিয়ে মাকে রাজি করাব, তোমরা যাও।'

রোববার দিন চামটু ও টুম্পাকে সুধন্যর জন্য এক মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি, বরঞ্চ সুধন্যই তাদের ডেকেডুকে জড়ো করে সকাল সকাল নারদা চলে গেল। আর সেদিন কী খেলাটাই না খেলেছিল! একসময় বল ধরতে ধরতে সুধন্যর হাঁটু দুটো রুগড়ি (ছোট ছোট নুড়িপাথর) ভরা মাঠে ঘষা লেগে ছাল উঠে রক্তাক্ত! অথচ তখনও যে অনেক বল ধরতে বাকি! সুধন্য চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'রুমাল! রুমাল চাই!' —রুমাল নয় মাহাতো যুবক যুবতীরা বলে 'উরুমাল, চাওয়ামাত্র দু'জন সুন্দরী যুবতী দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে তাদের খোঁপায় বাঁধা রুমাল খুলে মাঠে ঢুকে পড়ে দিয়ে গেল সুধন্যর হাতে। বেশটি করে দু' হাঁটুতে রুমালের ফেট্টি বেঁধে সুধন্য পরমুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বল ধরতে। এবারের বলটা একটু কায়দা করে টুম্পাকে দিল, টুম্পা সাপের মত এঁকেবেঁকে ,ডজ' করে বিপক্ষকে বোকা বানিয়ে শট নিল

গোলে। ডান পায়ে বাঁ পায়ে তার দারুণ কিক! বল খুব সহজেই গোলে ঢুকল। নারদা হারিয়ে দিল চাঁদাবিলাকে।

শুরু হয়ে গেল বিজয়োৎসব। ধামসা, মাদল, কাঁসি—কতরকম বাজনা বাজল! কালি পটকা, দো-দমা, তাল পটকা—সে কতরকম বাজি! ঐ ত রুমাল দিয়েছিল যে দুটো মেয়ে তারা দু' হাতে দুটো দুটো চারটে ফুলঝুরি ধরিয়ে অল্পবিস্তর নাচানাচি শুরু করল। এর মধ্যেই মাঠময় সে কী তাণ্ডব নৃত্য! যেহেতু টুম্পা-ই গোল করেছিল তাই টুম্পাকে চ্যাঙদোলা করে লোকগুলো নাচতে লাগল। পরে সুধন্য যেহেতু বাঁচিয়ে দিয়েছিল অবধারিত অনেকগুলো গোল তাই তাকে নিয়েও নাচবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সুধন্য নিজের আরেকটু দর বাড়াতে বলেছিল, 'আমার অসুবিধা আছে।' তবু লোকগুলো ছাড়ল না। গলায় কুড়চি ফুলের মালা পরিয়ে সুধন্যার চারধারে একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে নেচে নেচে গাইতে লাগল—

'ও ঝিঙাফুল মনে রাখিও।
জলকে যাবার বেলা ডাকিও॥'

এই করে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেলে নারদা গ্রামবাসীরা সুধন্যদের ধরে বসল, 'বন্ধুগণ! আজ রাতকে খুকড়ার মাংস আর সরু চাউলের ভাতের 'ফিস্টি' হবে তোমাদের থাকা চাই-ই-চাই।' টুম্পা আর চামটুও বলল, 'হ্যাঁ থাকলে হয়, বেশ ফুর্তি হবে। একটা রাত ত মোটে, থেকেই যাই কি বলিস সুধন্য?' যদিও ফুলঝুরির আলোয় আলোকিত মেয়েদুটোর টসটসে মুখ সুধন্যার বারবার মনে পড়ছিল তবু চেপে রেখে কোনমতে বলল, 'আমার অসুবিধা আছে।' 'অসুবিধা, অসুবিধা—' চামটু রাগ দেখিয়ে ক্যাপ্টেনী করে বলেছিল, 'কিন্তু অসুবিধাটা কি?' 'তোমাকে পরে বলব' বলেই একরোখা সুধন্য নারদা ছেড়ে সেদিন হাঁটা দিয়েছিল কিয়াঝরিয়া গ্রামের দিকে। একা একা সুধন্যাকে ছেড়ে দিতে সাহস হয়নি চামটুর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও টুম্পা আর চামটু পিছু পিছু আসতে লাগল। সুধন্যাকে রাস্তায় ধরে ফেলে চামটু পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'থেকে যেতে তোর কি অসুবিধা ছিল, সুধন্য?' বাড়িতে একবারের জন্যও বলে আসা হয়নি কিম্বা তার মা সারারাত অপেক্ষায় বসে থাকবে—এসব বললে মিথ্যেই বলা হবে, তাই সেই একই উত্তর, 'তোমাকে পরে বলব।' বাড়ি যখন পৌঁছুল সুধন্য তখন বেশ রাত আর দু' হাঁটুর নীচে ব্যথাটাও বেশ বাড়ছে মনে হ'ল। তখন ও হাঁটু থেকে রক্তাক্ত রুমাল দুটো এক মুহূর্তের জন্যও খুলেনি—আঃ মনে পড়লে ব্যথা যেন জুড়িয়ে যায়! ঘরে ঢুকেই সমুখে ভূত দেখল—তার মা কালি পড়া

হেরিকেনটার সামনে বসে মাথা থেকে একমনে পাকা চুল তুলে ফেলছে। বলল, 'এতক্ষণে আসার সময় হল বাবুর? কোন রাজকার্যে গিয়েছিলি শুনি?' কোন কিছু উত্তর না দিয়ে ঢেকে রাখা ভাত গোগ্রাসে গিলতে বসেছিল সুধন্য, তার মা 'আর ক'দিন পরেই ত রেজাল্ট, বাবুর কেরামতি কত সে বুঝা যাবে' অনর্গল বলেই যাচ্ছিল, বলেই যাচ্ছিল—

দিনকতক পরে চামটুর সঙ্গে ফের নদীবালিতে দেখা। সে তখন মজুরী নিয়ে যাচ্ছিল রনজিতপুরের মোহিনীমোহন সাউয়ের দোকান থেকে চারু হাটুইয়ের মুদীখানার মাল গোস্ত করবে। কথার জের টেনে সুধন্য তাকে বলেছিল, 'না না, আমার অসুবিধা আছে।' কথা শুনে হায় হায় করে উঠেছিল চামটু, 'সে কী আচানক কথা রে! ও কথা বলিসনে সুধন্য খারাপটাই আগে ভাবছিস কেন? আমি বলছি দ্যাক তোর ভালই হবে।' সুধন্য বলেছিল, 'সে যদি হয় ত ভালই আর তা না হলে আমার অসুবিধা আছে।' সেদিনটা রোহিনী হাইস্কুলে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার 'রেজাল্ট আউটের' দিন। সেই রেজাল্ট আনতে সুধন্য যাচ্ছে—সুধন্য আর চামটু—তারা দু'জনে নদীবালিতে মসমস করে হাঁটছিল। বালিয়াড়ী পেরুলেই খুদুপাড়ের কাঁটাগুল্মের চর, তার ওধারে গড়কাটা খাল, আর তার ওপারেই রোহিনী গ্রাম। উ'হু, গ্রাম কি আর সুধন্যদের রোহিনী সে ত কলকাতার চেয়েও বড়! দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সুধন্যর 'ফাস্ট' ডিভিসন' পায় যদি ত ভালো আর তা নাহলে বাড়ি ফিরবে না, যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে এ জীবনের মত। আর তাই শুনেই না চামটুর অত হাতে ধরে সাধাসাধি সেই জন্যই কাকুতিমিনতি অত!

হাটতলা পেরিয়ে ইস্কুল গেটের কাছাকাছি এসে পৌ'ছুতেই সুধন্য দেখল লোকে লোকারণ্য। শুধু কি রোহিনী গ্রাম, আশপাশের গ্রামগুলোও ভেঙে পড়েছে 'রেজাল্ট' শুনতে। প্রত্যেক বছর হাইস্কুলের পরীক্ষার ফলাফল তাদের গর্বের বিষয়বস্তু. কোন গ্রামের কার ছেলে কার ভাইটা কত পারসেণ্ট নাম্বার পেল—তাই নিয়ে ধান ক্ষেতে, অড়হর ক্ষেতেও আলোচনা খুব হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে, ট্রিপল এম. এ., লম্বায় সাড়ে ছ' ফুট, ধুতির কোঁচা লম্বমান, ফুলহাতা শার্টের হাতার বোতাম বরাবর খোলা, পায়ে শুঁড়তোলা চটি, রোহিনী হাই-স্কুলের হেডমাস্টার—তাঁর 'অফিস রুম' থেকেই জোরে জোরে পড়া হচ্ছিল 'রেজাল্ট'। কেউ একটু ভালো ফল করে ফেললে উপস্থিত জনতা হাততালি দিয়ে প্রায় নেচে উঠছিল, কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ার মত বাই-সাইকেলের পিঠে চড়ে গুলির বেগে ছুটে যাচ্ছিল ইস্কুলের গেট পেরিয়ে। সে হঠাৎ হঠাৎ।

সে বোধ করি আর কাউকে খবর দিতে। 'রেজাল্ট' শুনতে হেডমাস্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সে শক্তি সুধন্যর কোথায়? নিরুপায় সে নানাবিধ আগাছা, ঘোড়াবিছুটি ল'গাছ, কচুডাঁটার জঙ্গল ভেদ করে একেবারে অফিস ঘরের পশ্চাতে। সেখানে জানলাটা বেশ বড়, পায়ের বুড়ো আঙুলে টিপনী দিয়ে কোনক্রমে মাথাটা এগিয়ে দিয়েছিল সুধন্য। মুখোশ? আঃ এসময় হাতের কাছে একটা মুখোশ নেই? —এইমাত্র কালরুই গ্রামের অঘামার্কা কালীপদ হাটুইও থার্ড ডিভিসনে পাশ করে গেল। পূর্ণ পৈড়্যাও উত্তীর্ণ। কিন্তু ······· অজস্র ডাঁশ-মশা কামড়ে কামড়ে শরীরের নানা জায়গায় একেবারে ফুলিয়ে ছাড়ল উদ্যোগ নিয়ে যে মশা তাড়াবে সুধন্য ফুরসুৎ কোথায়? ঢেরাছাড়ার সিতাংশু মাইতিও হাই সেকেণ্ড ডিভিসন পেয়ে দেখিয়ে দিল ······ কিন্তু কি হল সুধন্যর? তবে কি 'ইন-কমপ্লিট রেজাল্ট?' পায়ের তলায় সারা পৃথিবীটা দুলে উঠল সুধন্যর, কোথাও বজ্রপাত হল, শেষ হয়ে গেল রেজাল্ট পড়াও! জানলার গরাদ থেকে হাতের মুঠো শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে খসে পড়ল, কার ঘাড়ের উপর ধপাস করে পড়ে তলিয়ে যেতে যেতে সুধন্য দেখল—আরে, এ যে কিয়াঝরিয়া ফুটবল টীমের বরাবর ক্যাপ্টেন চামটু সিং! সে কি সেই থেকে এঁটুলি পোকার মত লেগে আছে? মোহিনীমোহন সাউয়ের দোকানে চারু হাটুইয়ের মুদীখানার মাল গোস্ত করতে যায়নি তাহলে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে সুধন্য বলেছিল, 'আর ত চারা নেই চামটু, আমাকে যেতেই হচ্ছে।' চামটু বলল, 'ধের মাইরি কী যে করিস না!' বলেই সে সুধন্যর হাত ধরে শুরু করেছিল টানাটানি। সুধন্যর সেই এক কথা, 'আমার অসুবিধা আছে।' তবু সে নাছোড়বান্দা। অমন একটা তরতাজা ছেলে যে কিনা তার টীমের নাম করা গোলকীপার ফালতু দেশান্তরী হয়ে যাবে, ছুঃ, সে হয় না। টানাহিঁচড়ান করতে করতে সুধন্যকে একেবারে বড় রাস্তায় এনে ফেলেছিল চামটু। কি কাজে দু'চাকার সাইকেল ছুটিয়ে ফিজিক্সের সার শ্রীযুক্ত বিজয় মহাপাত্র ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছিলেন, ব্রেক কষলেন কাণ্ড দেখে। আর সুধন্যর তখন কী লজ্জা! কী লজ্জা! এক পা সাইকেলের প্যাডেলে আরেক পা মাটিতে সার কিন্তু বললেন, 'ব্রেভো মাই সান য়ু্য হ্যাভ ওয়েল ডান, সাতশ কুড়ি পাওয়া কি মুখের কথা!' —সাতশ কুড়ি? তবে ত 'ফার্স্ট ডিভিসন'? ইস্কুলে পৌঁছুনোর আগেই সুধন্যর রেজাল্ট পড়া হয়ে গেছে কি না, অব্যবহিত পরে পিছনের জানলায় দাঁড়িয়ে নামডাক শুনতে না পাওয়ায় এই ঘোরতর বিপত্তি।

তারপরে যা কাণ্ড হল, চামটু যা কিত্তি দেখাল—সে বলবার নয়। চেঁচিয়ে

মেচিয়ে, নেচে গেয়ে সারা পৃথিবীটা মাথায় করল। গড়কাটা খালধারে সর্বেশ্বর জানা যার ছোট ভাই বিশ্বেশ্বর 'সোনাই দীঘি' পালায় ভাবনা-কাজীর 'রোল' করে, সে পড়ন্ত বেলায় বাঁশের খোল দিয়ে ঢাকা লঙ্কা চারায় পাখির ছানার বিস্ফারিত ঠোঁটে একটু একটু করে জল দেয়ার মত জল দিচ্ছিল। তাকে দেখেও চামটু বলে উঠেছিল, শুনেছ কি জানার পো? সুধন্য ভুকেল বড় ফার্স্ট ডিভিসন!' ভুকেল অর্থাৎ মহা বিশাল। সে উবু থেকে সোজা হয়ে বলেছিল, 'কত?' ঘাড় শক্ত করে সুধন্য বলল, 'সাতশ কুড়ি।' ঝটপট অংক কষে নিয়ে বেঁটেখাটো সর্বেশ্বর বলেছিল, 'সেভেনটি টু পারসেন্ট! এত এই ইস্কুলে এই প্রথম, সবচেয়ে।' লোক নেই জন নেই ফাঁকা খুদুপাড়ের চরে এসেও চামটু সিংয়ের বকবকানি গেল না। প্রশ্ন হতে পারে এখানে সে কাকে শোনায়? তার উত্তর, মনানন্দে চামটু সিং কটা আকন্দ ঝাড় একটা ছাতিম গাছ কতক টোপা-কুলের গাছকেই শুনিয়ে দেয়! খবর জব্বর বটে কিয়াঝরিয়ার সুধন্য মেদিনীপুর 'ডিষ্টিক ফাষ্ট'! গ্রামে ঢুকে এমন কোলাহল আরম্ভ করল চামটু পারলে সে যেন সেই সন্ধ্যেবেলা গোটা গ্রামটাকেই উল্টে ফেলে আবার সোজা করে বসিয়ে দেয়। জনে জনে ডেকে বাস্তায় একে তাকে ধরে ঢেঁড়া পিটিয়ে বলতে লাগল — রেজাল্ট শুনেছ সুধন্যার? সে দেশের মুখ রেখেছে!' আর তাইতেই সুধন্যার ভারি সংকোচ। একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলছে নাকি চামটু? সে তার মুখ চাপা দিয়ে বলতে গিয়েছিল 'বলো না, ওরম করে একদম বলো না, আমার ভারি অসুবিধা আছে।' বলতে পারল না, চামটু তখন মরীয়া একেবারে ফেটে পড়েছে! সুধন্যাদের ঘরের নাচদুয়ারে এসে পারলে সে নিজে সুধন্য হয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায় আর সুধন্যকে চামটু করে দেয় পাঠিয়ে কিয়াঝরিয়ার নামো কুলহিতে। নামো কুলহি অর্থাৎ গ্রামের নিচের দিকের রাস্তায় চামটু সিংয়ের বাড়ি কি না।

চামটুকে কোনমতে পাঠিয়ে দিয়ে সুধন্য যখন ঘরের ভিতর ঢুকল তখন ঘরের আবহাওয়া বড়ো সুশীতল, মা দড়ির খাটিয়ায় পা ছড়িয়ে রুমরুম বসে, বড়দা সুশান্ত উনুনের কাছটায় কাঁচা গাদর ভুট্টা আগুনে পুড়িয়ে নিচ্ছিল। সেদিনকার মত ঐ হবে রাতের খাবার। তারই একটা বোধ করি সুধন্যর মায়ের হাতে— ডান হাতের বুড়ো আঙুলে সে ঠুকরে ঠুকরে দানা ছাড়িয়ে মুখে পুরছিল আর খাটিয়ার পায়ার মাথায় রাখা নুন-লঙ্কার চাটনি থেকে মাঝে মাঝে আঙুলের ডগায় তুলে মৌজ করে খাচ্ছিল। সুধন্য ঘরে ঢুকেই মায়ের পা ছুঁয়ে বলল, 'মা, মাগো! আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছি আমার 'এ্যাগ্রিগেট' হল

সাতশ কুড়ি, যা সব থেকে বেশি।' এ্যাগ্রিগেট? তার মা কি আর অতশত বুঝল? যেমন ভুট্টার দানা ছাড়িয়ে মুখে পুরে খাচ্ছিল তেমি খেতে লাগল, তার বড়দা সুশান্ত যে আরেকটু উদ্যোগী হ'য়ে পুড়ন্ত ভুট্টাটা আগুনে উল্টে দিল। আর কোন কথা নেই, এতটুকু ভাব বৈকল্য নেই—এরা কি মানুষ? বুকের ভিতর এদের হৃদয় বলে কি কোন বস্তু নেই? প্রচণ্ড ক্ষোভে ও দুঃখে তার মা ও বড়দার মাঝখানে রাখা কেরোসিনের কুপীটাকে প্রায় শট মেরে উড়িয়ে দেয়ার মনস্থ করেছিল সুধন্য, তার বড়দা আচমকা উঠে এসে তুলে ধরল আলোটা। আলো হাতে সে অন্ধকার ঘরের এককোনে যেখানে সুধন্যদের মোরগ-মুরগীগুলো ঢাকা থাকে ঝুড়ির ভিতর সে'দিকে থর থর হে'টে যায়। তারপর ঝু'ড়ির ভিতর হাত গ'লিয়ে ডাকুই (ভোররাতে ডাকতে শুরু করেছে যে) মোরগটার গলা মুচড়ে ধরে উল্লাসে বলে উঠেছিল, 'আজ আমাদের হোঁড়ল পাশ করেছে, এই দিয়ে ফিণ্টি হবে।'

তার ঠিক তিনদিন পরের কথা। দুপুর দুপুর চামটু এসে সুধন্যকে হাতে ধরে বলল, 'চ, যাবি? পাড়িয়ার কুসুমগাছে ঢের ঢের কুসুম পেকেছে রাঙা-কুসুম, কুসুমকুচা করে তাহুত করে খাব। এই দেখ সঙ্গে নিয়েছি বাঁশনলি।' কীর্তিমান সুধন্যকে তখন চামটু সিং যাহোক তাহোক করে খুশি কবতে চায়, দিতে চায় সম্বর্ধনা। কুসুমগাছ হল একধরণের ফলেব গাছ, যার ফলগুলো গোল গোল, যজ্ঞিডুমুরের মত। যার ভিতরটা লাল, একেবারে রাঙা কুসুম। ফাঁপা বাঁশের একটা পাফ, যার একদিকে একটা গাঁট আরেকদিবটা খোলাই, সেই হল বাঁশনলি। তার ভিতর খোসা ছাড়িয়ে রাঙাকুসুম কতক দাও ভরে, নুন দাও পোড়া লঙ্কা দাও, সরষের তেল সঙ্গে থাকে যদি ত দাও একটু ঢেলে। তারপর ত পরিষ্কার বাঁশের কঞ্চি দিয়ে অনবরত খোঁচা, খোঁচাখুচি, মন্হন মন্হন। সে মন্হনে অমৃত উ'ঠ আসবে না? চামটুর মুখে অমৃত সমান কুসুমকুচার নাম শুনে জল এসে গিয়েছিল সুধন্যর জিভে, অনেক লালসা নিয়ে সুধন্য বলেছিল, 'হ্যাঁ যাব।' তৎমুহূর্তে কুসুমতলায় যাওয়া। কুসুম গাছটার অবস্থান পাড়িয়ার বিলেব চৌমাথায়। তার একটা রাস্তা গেছে খালের দিকে, যে রাস্তায় কিয়াঝরিয়া গ্রামের বউড়ী-ঝিউড়ীরা কাপড কাচতে গা ধুতে খালধারে যায়, যেতে যেতে হ্যাঙলার মত হাত পেতে কুসুমকুচা চায়। বলে, 'দে পুতুরা, একটুন দে ধন।' আরেকটা রাস্তা গেছে সোজা প্রাইমারী স্কুলের দিকে, ছাতা মাথায় অশ্বিনীমাস্টার স্কুলে যাবার পথে গ্রীষ্মেব দিনে পাক্কা কুড়ি মিনিট কুসুমতলায় বসে রেস্ট নেন। সে সময় কুসুম পাড়া হয় যদি ত ঢোক গিলে

বলবেন, 'এই যে হে। তুমি পৃথ্বীনাথ না? ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিলে? এখন গরু চরাচ্ছ তা বেশ বেশ। একটু পরিষ্কার করে খানিকটা কুসুমকুচা দাও দেখি। বাঃ তোমার হাতটি ত খাসা! আঃ বানিয়েছ ত বেশ!' সেদিন কুড়ি মিনিট 'রেস্ট' নিয়ে অশ্বিনীমাণ্টারও চলে গেছেন ইস্কুলে, দু' একজন ছাড়া গ্রামের বউড়ী-ঝিউড়ীদের কাপড় কাচা গা ধোয়াও সারা —চামটু, সুধন্য ও তাদের দলবল এসে কুসুমতলা জাঁকিয়ে বসল। এক মুহূর্তে গোটা পরিবেশটা হয়ে গেল খাপছাড়া, ডাল ভাঙল কতক, কতক পাকা কুসুম গাছ থেকে পড়ে পায়ের চাপে হুড়োহুড়িতে চেপ্টে গেল, আর কতক খেল ছাগলে। আসর যখন পেকে একেবারে ঝুনো সে সময় সেখানে উপস্থিত হ'ল অনন্ত দণ্ডপাটের বড় ছেলে শ্রীমন্ত। তার একভাই বসন্ত মেদিনীপুর কলেজে ইংরাজী অনার্স নিয়ে পড়ে, সে থাকে অলিগঞ্জের মেসে। একবার বেলিয়াবেড়া রাসটাঁড়ে নামকরা যাত্রাপার্টির একটা সীন দেখে দর্শকরা (বেশির ভাগই অর্ধশিক্ষিত, গেঁয়ো, মূর্খ) চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, 'এনকোর! এনকোর!!' কী তার মানে অতশত বুঝে না, বলতে হয় বলা। কিন্তু ঐ একটা শব্দে যাত্রা দেখা নাকি মাটি হয়ে গিয়েছিল বসন্তর! সে সারা রাস্তা শব্দটার মানে খুঁজে খুঁজে হয়রান, অবশেষে শেষ রাত্রে বাড়ী ফিরে এ. টি. দেবের ডিক্সনারী ঘেঁটে আবিষ্কার করেছিল—এনকোর মানে শাবাশঃ আবার হউক। সেই থেকে কিয়াঝরিয়া গ্রামে চাউর হয়ে গিয়েছিল কথাটা। গ্রামে হেজিপেঁজি যাত্রার দল এমন কি গিরিবালার কীর্তনের দল পালা গাইতে এলেও দর্শকরা যেমন-তেমন দৃশ্য দেখেই উশখুশ করতে থাকে, ঠেলা মেরে পাশের বন্ধুকে হয়ত বলল 'দ্যাক করালী এবার আমি একটা 'ইনকোর দিবই দিব, তুই আমাকে রুখতে পারবি না।' সে যেমন হোক সেই বসন্তর বড়ভাই শ্রীমন্ত কুসুমতলায় এসে সুধন্যাকে পাকড়াও করে বলেছিল, 'কি রে এখন কি করবি, সুধন্য? আমাদের টালি কারখানায় লেগে যা, যা হোক দুটো পয়সা পাবি।' দুটো কেন অজস্র পয়সা আছে শ্রীমন্তদের; তারা এই একটা ব্যবসা ধরে ত আরেকটা ছাড়ে। গ্রামের একে ওঠায় ত তাকে বসায়, গোটা গ্রাম তাদের কথায় ওঠবস করে। বিহারের কোন মুশাবনী না মধুবনী থেকে টালি গড়বার ছাঁচ এনে ফেলেছে অনন্ত দণ্ডপাট, ছাঁচে মাটি ফেললেই কেমন এ. ডি. (অনন্ত দণ্ডপাট) ছাপ মেরে যায়—সেই কাজে সুধন্যও ঢুকে পড়ুক ঐটে শ্রীমন্তদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। সুধন্য ঘাড় শক্ত করে বলেছিল, 'আমার অসুবিধা আছে শ্রীমন্তদা।' অসুবিধা? সুধন্য কিনা অসুবিধার কথা বলল? শ্রীমন্ত তার চোখ দুটো কুঁচকে কদাকার করে হুংকার ছেড়েছিল, 'তবে কি কলেজে পড়বি?

গরীবের ঘোড়া রোগ? আমাদের ত এত, আমরাই বলে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি কলেজে পড়াতে আমাদের বনুকে (বসন্তকে) আর তুই কিনা—ফুঃ বামন হ'য়ে চাঁদে হাত! ফুটানি যত্ত সব! যাঃ।' বলতে বলতে টরটর করে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল শ্রীমন্ত দ'ড়পাট। কি কথার কি জবাব, একেবারে মরমে মরে গেল সুধন্য, কুসুমতলায় গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সে হুরহুর করে কেঁদে ফেলল, বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল, কেঁদে ভাসাল। কিছুক্ষণ ত কাঁদুক সুধন্য, চামটু ও তার দলবল সুধন্যকে মানা করল না, অবশেষে হাত ধরে টানাটানি শুরু করল—'ওঠ, ওঠ সুধন্য, শ্রীমন্ত আবার একটা মানুষ! তার কথায় অত কি যায় আসে?' কিন্তু সুধন্য উঠল না, গোঁট হয়ে বসে থাকল তরুমূলে, নিরুপায় চামটু ও তার দলবল (তাদের অন্য কাজ আছে) একে একে ছেড়ে গেল তাকে, প্রায় নিঃশেষিত সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম যখন ভাঙল বেলা তখন হেলে গেছে, কুসুমতলায় সে একা, বিচ্ছিরি রকমের একা, বিচ্ছিন্ন। সে তার গাল দুটোয় হাত রেখে দেখেছিল, শুকনো জলছাপ মরে হেজে গেছে অনেকটাই। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিল সুধন্য, এমনিতেই বিলম্ব হয়ে গেছে অনেকটা। পাড়িয়ার বিলের কুসুমগাছটাকে সে মনোযোগ সহকারে কিছুক্ষণ দেখল তারপর বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল, 'মা-গাছ কি বাবা-গাছ যেই হও তুমি, এই তোমার শিকড় ছুঁয়ে (সত্যি সত্যি সুধন্য গাছের শিকড়ে আর কপালে বারবার হাত ছোঁয়াল) শপথ নিলাম, একদিন ফুটবই কুসুম যেমন।' বেশ একটু নাটক বৈকি। তবু বলতে হয় এই পোড়া পশ্চিমবাংলায় কি ভারতে প্রতিটা গ্রামে একটা করে কুসুমতলা আছে, অনন্ত দ'ড়পাট শ্রীমন্তরা আছে, যা হোক তা হোক বলে শ্রীমন্তরা টুরটুর হেঁটে এতটুকু হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুধন্যরা চিরকাল পড়ে পড়ে কাঁদে, কেঁদে কেঁদে ঘুমায়। ঘুম ভাঙলে গাছটার গোড়ায় গড় করে বড়জোর শপথ নেয়, বলা বাহুল্য সে শপথ সফল হয় আবার হয়ও না।

ঝুণা ও একটি অসমাপ্ত লিরিক

ঊর্ধ্বেন্দু দাশ

শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত চিঠিখানি এসে পৌঁছলো। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, এন্তার ঘর-বার করতে করতে প্রায় তিনটে নাগাদ এলো সেই চিঠি। রেজিস্টার্ড কভারে দুটো স্বতন্ত্র প্যাকেট আর খাম। আসবেই এমনটা কেন জানেনা সে জানতো। এর আগেও যেমন এসেছে ঠিক এই দিনটিতে নাহলেও তার দু' একদিন আগে-পরে। রুণার জ্ঞাতসারে অন্তত দশবার। তারও আগে এসে থাকলেও মা হয়তো পেয়েছে, কিন্তু তাকে জানতে দেয়াটা প্রয়োজন ভাবেনি।

সাদামাটা খামের মুখটা খুলতেই সুদৃশ্য গ্রীটিংস্-কার্ডের বুকে ঝল্সে ওঠে দূরাগত বর্ণমালার পরিচিত বিন্যাস। শব্দ নয়, যেন কল্জে থেকে উপড়ে আনা পাঁচ-পাঁচটি রক্তাক্ত শায়ক : 'রুণাকে তার সতেরোর জন্মদিনে, বাপী।' —একই খামে একটি সতেরোশো-টাকার গিফ্‌ট্-চেক্। পাঠানো হয়েছে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার চেরাপুঞ্জি ব্রাঞ্চ থেকে। এর আগেও যেমন পানাজি, ভূপাল, জয়পুর, দেরাদুন, পুনে, মাইশোর, কটক, মুঙ্গের, গ্যাংটক আর আগরতলা থেকে পাঠিয়েছেন তার ভবঘুরে বাপী। আচ্ছা, এখান থেকে শিলং তো মাত্র আট-দশ ঘণ্টার বাসরুট। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব তাহলে কতো হতে পারে?

যতোদূর মনে পড়ে, পানাজি থেকে আসা গিফ্‌ট্-চেকটি ছিলো সাতশো টাকার, যা' তার সাতের জন্মদিনে প্রথম হাতে আসে। চিঠি আর চেকটা নিয়ে নাচতে নাচতে মা'র কাছে ছুটে যায় রুণা। মা তখন খাবার টেবিলে তার কলেজের প্রিন্সিপল মিসেস্ রাজখোয়া সহ সাত-আটজন সহকর্মীকে কফি বিলোচ্ছে।

—'মা দ্যাখো, বাপীর চিঠি আর এটা এসেছে। আচ্ছা মা, বাপীটা কে? কোথায় থাকে ও?'

খামটা প্রায় ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে তুলে নিয়ে মা চোখ পাকিয়ে বললে, 'রুণা, তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে এখন গল্প করোগে যাও। বড়োদের কথাবার্তার মাঝে এভাবে এসে ডিস্টার্ব করে না।'

—'কিন্তু ওই গ্রীটিংস্-কার্ডটা আমায় দেবে না?'

—'না। এগুলো যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই ফেরৎ পাঠানো হবে।' মা'র গলায় বিতৃষ্ণা আর বিরক্তির ঝাঁজ, 'কী, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও বলছি এখান থেকে।'

—'কে এগুলো পাঠিয়েছে রুচিরা?' ভারি পায়ে, একবুক অভিমান নিয়ে, ঘর ছেড়ে যেতে যেতে রুণা আচমকা তার মায়ের উদ্দেশে অধ্যাপিকা সর্বাণী সান্যালকে যেন বলতে শুনলো, 'হোপ্ ইট্স্ নট ইয়োর মিস্টার—'

—'ইট্স্ দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল্, মিসেস্ স্যানিয়াল।'

রুণা আর দাঁড়ায় না। বারান্দা ছেড়ে পায়ে পায়ে গেট, তারপর গেট পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে উঠতেই সেই আধবুড়ো ডাকপিয়নটিকে সে দেখতে পেলো। পরণে খাকিরঙের পোশাক, কাঁধে চামড়ার ঝুলনো ব্যাগ. আর একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে লোকটা উল্টোদিক থেকে হন্‌হন্ করে ফুটপাথ ধরে আসছিলো। রুণার কাছাকাছি আসতেই লোকটা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—'কী-গ' খুকিমণি, মুখখান্ অ্যামন ব্যাজার কইর‍্যা খাড়ৈ আছ' ক্যান্? চিঠিত্ কুনো ভাল' খবর আসে নাই বুজি?'

—'জানো পিয়নকাকু', রুণা থম্‌থমে গলায় জানায়, 'বাপী বলে একটা বাজেলোক না ওই চিঠিটা আমায় পাঠিয়েছে আজ। লোকটা খুউব খারাপ মা বলেছে। তুমি না আর কখনো ওর চিঠি আমায় এনে দেবে না।'

—'বাপ-মায়েরে নিয়া অ্যামনতারা কইতে নাই খুকি, ছিহ্।'

—'বাবা নয়, ওতো বাপী।' রুণার কণ্ঠে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ, 'আর জানো. মা ওই লোকটাকে স্কাউণ্ড্রেল্ বলে গালাগাল দিয়েছে।'

এ কথায় ডাকপিয়নটি রুণাকে ভীষণ চমকে দিয়ে রাস্তা ফাটিয়ে হেসে উঠলো। তারপর ওর একমাথা কুঁচনো চুলে আল্‌তোভাবে চাপড় মেরে বললে, 'অইসব সোয়াগের গালি গালাজ গ' মামণি। সিসব তুমি অহনে বুইজবা না। খানিকডা ডাগর-ডোগর হও আরো, তহনে সব ধইরবার পারবা। তয় আইজ্ঞ চলি. ক্যামন?'

রুণা তারপর, এই দশবছরে, যথেষ্ট 'ডাগর-ডোগর' হয়েছে। দু'বছর আগে হাইস্কুল-লীভিং পরীক্ষা পাশ করেছে। এবছর হায়ার-সেকেণ্ডারি দিয়ে এখন

রেজাল্টের আশায় বসে রয়েছে। তার শেষ জন্মদিন অনুষ্ঠিত হয় এমনি এক খরতপ্ত বোশেখের দিনে, যেবার হাইস্কুল-লীভিংয়ের পর এভাবেই সে রেজাল্টের আশায় অলস দিন গুনছিলো। ওই স্মরণীয় অনুষ্ঠানটিব দিন তিনেক পরে রুণার জীবনে ছায়া রাখে আরেক কালবোশেখী, যা' তাকে শুধু শরীর বা অনুভূতির দিক থেকেই তছনছ করেনি, বরং বলা যায় তার গোটা অস্তিত্বের প্যাটার্নকে আমূল বদলে দিয়েছে।

হাইস্কুল-লীভিংয়ে কোনো পজিশন না পেলেও রুণা স্টার-মার্ক্স্ নিয়ে নেশন্যাল স্কলারশিপ পায়। ওর বড়ো ইচ্ছে ছিল সায়েন্স নিয়ে হায়ার-সেকেণ্ডারি পড়ার। রুচিরা নিজেও ছিলো সায়েন্সের ছাত্রী,– এখন কেমিস্ট্রির লেক্চারার। কিন্তু ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর মেয়েকে নিজের কলেজে নিয়ে যাওয়ার সাহস তার ছিলো না। এ শহরে আরো যে দুটি কলেজ রয়েছে, তার একটি মেয়েদের, বিজ্ঞান নেই—অপরটি কমার্স্ কলেজ। রুণার স্কুলটি হায়ায়-সেকেণ্ডারি-স্তরে উন্নীত হতে এখনো অন্তত তিনবছর। বাইরে গিয়ে পড়তে রুণার নিজেরও বিশেষ সায় ছিলো না। মা তাতে একলা হয়ে পড়তো। কাজেই মেয়েদের কলেজ থেকে ম্যাথ্মেটিক্স্ সহ আর্টসেই তাকে হায়ার-সেকেণ্ডারি শেষ করতে হোল। ম্যাথ্সের পড়াশুনোটাও আবার নিজের দায়িত্বে। ওর কলেজে এ সাব্জেক্টে কোচিংয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই।

দ্বিতীয় প্যাকেটের মোড়কটা খুলতেই রুণা রীতিমতো চম্কে ওঠে। তার হাতে কবি অরুণেশ দেব-এর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ একটি অসমাপ্ত লিরিক'। রুণার মনে পড়ে যায়, দিন পনের আগে বিজ্ঞাপন দেখে এ বইয়েরই একটি কপির জন্যে সে অর্ডার পাঠিয়েছে কলকাতার প্রকাশকের কাছে। যেমন, এর আগেও এ লেখকের আরো তিনখানি কাব্যগ্রন্থ, দুটো উপন্যাস ও একটি গল্প-সংকলন সে সংগ্রহ করেছে। কাঁপা কাঁপা হাতে মলাট ওল্টাতেই তার বিস্ময় এবার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছয়। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে মুদ্রিত অবস্থায় আবারো সেই পাঁচটি রক্তাক্ত শায়ক : 'রুণাকে তার সতেরোর জন্মদিনে বাপী।' —বুকের অভ্যন্তর থেকে কণ্ঠা অব্দি উথলে ওঠা আবেগটাকে আর কোনোমতেই রুখতে পারে না রুণা। বইখানি বুকে চেপে, বালিশে মুখ গুঁজে, এবার স্রোতের মুখে নিজেকে ভাসিয়ে দ্যায় সে। কান্নার প্রতিটি দমক ঢেউয়ের মতোন উঠতে এবং নামতে থাকে ওর শরীরের শ্যামল বেলাভূমি ছুঁয়ে।

তার বাবা-মা সম্পর্কে বিগত দশ বছর ধরে লোকমুখে যতোটুকু শুনেছে, অথবা তার নিজের বিচার-বিবেচনা দিয়ে যেটুকু বুঝেছে, তাতে মা'র সেদিনের

গালাগালের প্রচ্ছায়ে বাবার প্রতি কোনো 'সোহাগ' বা অনুরাগের তাৎপর্যই খুঁজে পায়নি রুণা। বাপীকে মা তার নিজের জীবন থেকেই মুছে দিতে চেয়েছে। অরুণেশ দেব নামের সাধারণ-স্তরের গ্র্যাজুয়েট এক মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ্ সম্পর্কে রুচিরা রায়ের মুখ থেকে, মুহূর্তের অনবধান-জনিত কোনো উচ্চারণ, কখনো শুনেছে বলে মনে পড়ে না রুণার। অথচ এই ব্যবহারিক পরিচয়ের বাইরেও তার বাপীর যে লেখক হিশেবে, কবি হিশেবে, দেবার মতোন আরো বড়ো একটা পরিচয় রয়েছে, মা কি সেকথা জানে না? না-কি জেনেও না-জানার ভান করে থাকতে চায়?—

অথচ, আইনের চোখে মা-তো এখনো অরুণেশ দেবেরই স্ত্রী। রুচিরা রায় যতোই চেঁচাক, বা যতোই তার বাপ-ঠাকুর্দার পদবী আঁকড়ে পড়ে থাকুক, অরুণেশ তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে তো কখনো অস্বীকার করেননি। শত আবেদন সত্ত্বেও রুচিরাকে আজো ডিভোর্সও তিনি দেননি। নিজেকে চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখলেও, ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্ট্-যোগে নিয়মিত মাসোহারাটা ঠিকই পাঠিয়ে চলেছেন আজ দেড়-দশক কাল ধরে। কই, রুচিরা রায়ের তো সে-টাকা নিতে আটকাচ্ছে না কোথাও। যতো বাধা শুধু সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোতে,—প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনে।

কিন্তু আসলে যে ওই বাধার দেয়ালটা ঠিক কোথায়, তার এই দশবছরের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তা' ঠিকঠাক ধরতে পারেনি রুণা। দেয়ালটার অবস্থান তার কাছে সঠিক ধরা পড়ে আজ থেকে ঠিক তিনদিন আগে। ডিগ্রী পরীক্ষার ইন্‌ভিজিলেশনের তাড়ায় সেদিন তার চাবির গোছাটা ভুল ক'রে টেবিলের ওপর রেখে চলে যায় রুচিরা, আর রুণার হাতে অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে পড়ে সুযোগটা। একরকম মরীয়া হয়েই ওয়ারড্রোবের গোপন দেরাজ খুলে সে তার মায়ের ডায়েরিটা পেড়ে আনে। কাজটা যে অন্যায় বা অশোভন হচ্ছে, এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলেও, রুণার কোনো উপায় ছিলো না। এটা যে তার জিয়ন-বাঁচনের সওয়াল!—দুপুরের রেমিশনে হন্তদন্ত হয়ে রুচিরার বাড়ী ফেরার আগেই রুণা যা' জানবার তা' জেনে গিয়েছে।

তারপর সমানে এই তিনদিন ধরে সে ভেবেছে, আর ভেবেছে। তখন অশোভন বা অন্যায় ঠেকলেও আজ, এই মুহূর্তে, রুণার মনে হচ্ছে: আরো আগেই একাজটি তার করা উচিত ছিলো, —এ্যাদ্দিন না-করাটাই বরং অন্যায় হয়েছে তার পক্ষে। ওই জরুরি প্রশ্নের উত্তরটির সাথে সাথে আরো একটি উপরি-পাওনাও জুটেছে তার ভাগ্যে। জীবনে প্রথমবারের জন্যে বাপীকে সে দেখতে

পেয়েছে, ফোটোতে। পঁচিশ-তিরিশ বছরের ধারালো চেহারার তরুণ অরুণেশের পাশে তার মাকেও কেমন নিষ্প্রভ মনে হচ্ছিলো রুণার। তার মানে, কবি অরুণেশ দেব রীতিমতো সুপুরুষ। আর, কী উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধ চাউনি ও'র দুটি চোখের!

বিকেল চারটে পঁচিশের প্যাসেঞ্জার-ট্রেনটি তাদের বাড়ীর গা ঘেঁসে চলে যেতেই রুণা ঝটিতি উঠে পড়ে। মা বাড়ী ফিরতে এখনো অন্তত এক ঘণ্টা। গতমাস থেকে কাজে বহাল তাদের নোতুন কাণ্ডীটিকে দোর দিতে বলে রুণা বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়ে। বড়ো রাস্তায় উঠে একটা রিক্সো নেয় ও। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বাড়ীটিতে ঢুকে সামান্য খোঁজ নিতেই সে পেয়ে যায় সেই ভদ্রলোককে। ওর ক্লাসমেট নিরুর বাবা বোধেন শইকীয়া।

—'হের আইজনী (কীগো মা-ঠাকরুণ), কী মনে করে?' ভদ্রলোকের তাম্বুল-রঞ্জিত মুখে সস্নেহ হাসির ঝিলিক, 'তোমাদের রেজাল্ট সম্পর্কে তো আজো কোনো খবর নেই।'

—'নহয় বরদেউতা (না জেঠু), আমি অন্য একটি কাজে আপনার কাছে এসেছিলাম।' এই বলে রুণা যথাসম্ভব রেখে ঢেকে নিরুর বাবার কাছে তার পরিকল্পনাটা তুলে ধরে।

সব শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। শেষে বললেন, 'তোমার মাকক্ মই হঁচাকৈ এজনী বুধিয়ক মানুহ্ বুলিহে ভাবিছিলোঁ (তোমার মাকে আমি রীতিমতো বুদ্ধিমতী মহিলা বলেই ভাবতাম)। সে যাই হোক'—ভদ্রলোক আচমকা কথার মোড় ঘোরালেন, 'তুমি বলছো মিঃ দেব, মানে তোমার বাবা, আপাতত বেশ কিছুদিন চেরাপুঞ্জিতেই থাকবেন, তাই না?'

—'আমার তো সেরকমই ধারণা।'

—'তা' একটা কাজ করলে হয় না? তুমি না হয় আপাতত কিছুক্ষণ নিরুর সাথে আমাদের কোয়ার্টারে বসে গল্পসল্প করলে। আমি ততোক্ষণে মাইক্রো-ওয়েভের অবস্থাটা কেমন দেখি। লাইন ভালো থাকলে শহরের সব ক'টি হোটেল একবার করে ছুঁয়ে আসতে কতোক্ষণই-বা আর লাগবে। তাছাড়া এখানকার এক স্টাফও-তো আমাদের রয়েছেন খোদ চেরাপুঞ্জির এক্সচেঞ্জে। যাও মা, তুমি কোয়ার্টারেই গিয়ে বোস।'

আধঘণ্টার মধ্যেই পিয়নের হাত দিয়ে স্লিপ্ পাঠালেন সুপারভাইজার মিঃ শইকীয়া: 'রুণা, ইয়োর বাপী ক'লিং। কাম শার্প'।'—চিরকুটটা হাতে নিয়ে এই প্রথম নিজেকে বড়ো অসহায় বোধ করে রুণা। অতঃপর নিরুদের

কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এক্সচেঞ্জ অব্দি হেঁটে যাওয়া এবং ট্রাঙ্ক-রিসিভারটি হাতে তুলে নেয়ার মাঝখানে তাকে বয়স, সংস্কার, আর অনুভূতির কতোগুলো সিঁড়ি যে পরপর ভাঙতে হোল, সে-ইতিহাস সম্ভবত রুণার বিধাতাপুরুষেরও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বাড়ী ফিরে রুণা দেখলে মা আলো নিভিয়ে, একটা বেতের চেয়ার পেতে, বারান্দায় বসে রয়েছে। মাকে এতো চুপচাপ আর একলাটি বসে থাকতে এর আগে সে দ্যাখেনি।

—'আজ নিরুদের ওখানে একটু গিয়েছিলুম মা। কথায় কথায় রাত হয়ে গেলো।'

—'তোদের রেজাল্ট্‌সের ব্যাপারে নিরুর বাবা কোনো খোঁজ-খবর পেলেন কিছু?'

—'ন্‌না মা। এখনো পর্যন্ত কোনো খবর নেই বললেন।'

—'যাও। ভেতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে নাও শীগ্‌গির। তোমার সাথে কথা আছে।'

হঠাৎ 'তুই' ছেড়ে 'তুমি' ধরতে, রুণার বুঝতে বাকি থাকে না, রুচিরা কোনো কারণে রেগে আছে। ও তাড়াতাড়ি ভিতরবাগে পা বাড়ায়। সুইচ্‌টা অন্‌ করে দিয়ে, রুচিরাও ভিতরে চলে আসে।

রুচিরা কথাটা পাড়ে আরো অনেক পরে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ওরা যখন শুতে এসেছে। কাঞ্চী চলে গ্যাছে তার কোনার দিকের ছোট্ট ঘরটিতে শুতে।

– 'তোমার কলেজের প্রিন্সিপল মিসেস্‌ বেজবরুয়া আজ আমায় ফোনে ডেকেছিলেন। উনি আজই ভোরে গৌহাটি থেকে ফিরেছেন। বললেন বোর্ডের চূড়ান্ত রেজাল্ট-শীট্‌ পাস্‌ হয়ে গ্যাছে, আজকালের ভেতর অ্যানাউন্স্‌মেন্ট নাকি দেবে। আর—তুমি প্রথম দশজনের ভেতর ফার্স্ট হয়েছো। সেকেণ্ডের সাথে তোমার স্কোরের তফাৎ প্রায় একশো মার্ক্‌সের।'

রুণা ততোক্ষণে লাফিয়ে উঠে রুচিরাকে জড়িয়ে ধরেছে—'ও মামি, হাউ নাইস্‌ অব্‌ ইট। বলো তুমি খুশি হয়েছো। হওনি?'

শরীর থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলার মতোন রুণাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে রুচিরা গম্ভীর স্বরে বললে, 'আদিখ্যেতা রেখে ওই চেয়ারটিতে গিয়ে বোস।' —একথায় রুণা ব্যথিত, ক্ষুব্ধ মুখে উঠে চেয়ার গিয়ে বসলে রুচিরা ফের তার কথার খেই ধরলে, 'তুমি নাকি হায়ার সেকেণ্ডারির ফর্ম্‌ ভর্তি করার সময়

তোমার নাম রুণা রায় না লিখে রুণা দেবরায় লিখেছো। সঙ্গে অ্যাফিডেভিট্‌ও নাকি জুড়ে দিয়েছো একখানা। এতো কাণ্ড করেছো, অথচ আমায় জানতে দেয়া বা আমার পারমিশন নেয়াটা প্রয়োজনও ভাবোনি। কেন?'

রুণা মাথা নিচু করে পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝেতে কাল্পনিক দাগ কাটতে থাকলো, কোনো উত্তর দিলে না।

রুচিরাব এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। খাট থেকে উঠে এসে রুণার লম্বা চুলগুলো মুঠিতে পাকিয়ে ওব আনত মুখটাকে নিজের দিকে উঁচিয়ে ধরলো, 'মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছো কেন? জবাব দাও। আউট্‌ উইথ ইট, য়ু ইন্‌সোলেণ্ট গার্ল্‌।'

রুণা অপলক চোখে রুচিরার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। একটা দুর্বহ মিথ্যের বোঝা বয়ে না বেড়িয়ে, আমি আসলে যা' তাই নিয়ে সকলের সাম্নে দাঁড়াতে চাই।'

কথা শেষ হবার আগেই রুণার মুখের ওপর নেমে আসে রুচিরার হাতের প্রচণ্ড চড়। পর-পর তিনবার।—'য়ু মীন্‌ টু সে ইয়োর ওন্‌ আইডেন্‌টিটি? আমার পরিচয়টা তাহলে তোমার কাছে একটা দুর্বহ মিথ্যের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই না?' —পরমুহূর্তে একটা হ্যাঁচকা ধাক্কায় রুণাকে অদূরে হটিয়ে দিয়ে রুচিরা এবার কেটে কেটে, বিষ-মেশানো গলায় বললে, 'আর তুমি আসলে যা' তাই নিয়ে কোনো চয়েস্‌-লাইনে যে গিয়ে সকলের সাম্নে দাঁড়ানো যায় না, এসব বস্তাপচা আর্ট্‌স্‌-ফার্ট্‌স্‌ নিয়েই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হয়, তা'-তো এরি মাঝে তুমি নিজেই দেখতে পেলে।

ধাক্কার চোটে রুণা গিয়ে পড়ে বাঁদিকের দেয়ালে। কাঠের উঁচু র‍্যাকে ঠোকাঠুকি লেগে ওর বাঁদিকের ভুরু ঘেঁসে কপালে একটা চিড় ধরে। রক্তের ফিন্‌কি নামে চোখের কোল ছাপিয়ে গাল আর চিবুকে। সেই অবস্থায় ও উঠে দাঁড়ায়।—'আমাকে মারো, মেরে ফেলো আমাকে' রুণা চেঁচিয়ে ওঠে, 'কিন্তু দোহাই তোমার, নির্জলা মিথ্যের ওপর এভাবে রঙ চড়িয়ো না মা।'

রুণার রক্তাপ্লুত মুখের দিকে তাকিয়ে রুচিরা খানিকটা হক্‌চাকিয়ে যায়। কী বলবে অথবা করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

—'আমি যে আদতে কী, তা' কি তুমি নিজে কিছু কম জানতে মা?' রুণা ওর মায়ের চোখের ওপর স্থির চোখ রেখে বললে, 'নীরেন রাজখোয়াকে এ বাড়ীর ভেতর কে ডেকে এনেছিলো, বলো! লোকটা যে একটা আস্ত লোফার, তুমি তা' জানতে। বাপী তোমাকে ডিভোর্স না দিলে নীরেন রাজখোয়ার সাথে

যে তোমার বিয়ে হতে পারে না, তাও তুমি জানতে। এতসব জেনেও লোকটাকে আমাদের বেড্‌রুম অব্দি ধাওয়া করার লাইসেন্স কেন দিয়েছিলে তুমি? তোমার ঘরে উঠতি বয়সের মেয়ে রয়েছে, সে-চেতনা ছিলো না তোমার? আর, সেদিন দুপুরে তোমার অ্যাব্‌-সেন্সের সুযোগ নিয়ে ও যখন আমায় রেপ্‌ করলো, তখন পুলিশের কাছে আমায় মুখ খুলতে, স্টেট্‌মেণ্ট দিতে কেন দিলে না তুমি? ওয়াশ্‌-আপের জন্যে আমাকে হাসপাতালে না দিয়ে, একটা প্রাইভেট নার্সিং-হোমেই বা কেন পাঠাতে গেলে? —আর, আমাকে সায়েন্স নিয়ে তোমার নিজের কলেজে পড়তে না-দেয়ার মূলে কোন্‌ ফ্যাক্‌টরটা বেশি দায়ী মা,—আমার দুর্ভাগ্য, না তোমার নিজের নিরাপত্তা? বলো মা, চুপ করে রইলে কেন —বলো!'

—'রুণা—রুণা', রুচিরা স্খলিত, অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'তুই কি শেষতক্‌ পাগল হয়ে গেলি?'

—'পারলে না-তো বলতে? জানতুম তুমি পারবে না'—রুণা অবিচলিত স্বরে জের টানলে, 'কারণ তুমি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাও। নীরেন রাজখোয়ার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই তুমি চাপা দিয়েছিলে, কারণ ও ছিলো প্রিন্সিপল মিসেস্‌ রাজখোয়ার দেওর, আর ভবিষ্যতে তোমার ওপরওয়ালা হবার মতোন এলেমও যে সে রাখতো, এটা তুমি জানতে। আজ যেহেতু সে শাসকদলের একজন পাওয়ারফুল এম-এল্‌-এ, আর ঘটনাক্রমে তোমার কলেজের গভারণিং বডিরও মেম্বার, কাজেই তেতো গিলেও তাকে তোমায় তোয়াজ করে চলতে হয়। নীরেন রাজখোয়ার বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ নেই। যতো অভিযোগ শুধু অরুণেশ দেব নামের একজন নির্দোষ, সৎ আর কর্তব্যপরায়ন মানুষের বিরুদ্ধে, যিনি আজ পনেরো বছর ধরে নিজেকে বঞ্চিত রেখেও আমাদের দুহাতে ভরিয়ে রেখেছেন।'

—'অরুণেশ সম্পর্কে তুই কতোটুকু জানিস রুণা, যে আমার সাম্নে ওর বড়ো সাফাই গাইছিস?'

—'আমি তো সে-কথাটাই বিশেষ করে তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই মা। এমন একজন দরদী শিল্পী, নিষ্ঠাবান স্বামী আর স্নেহপরায়ন বাপকে কেনই বা সংসারের সমস্ত সাহচর্য, সেবা আর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে, ভবঘুরে-বাউণ্ডুলের মতোন পথে-প্রবাসে কাটাতে হয়? অথচ তোমরা তো ভালোবেসেই ঘর বেঁধেছিলে, তাই না?' রুণা তার দুটি হাত প্রার্থনার ভঙ্গীতে বাড়িয়ে ধরে, 'একটি আজন্ম দুঃখী সন্তান তার শিকড়ের আলম্বন ধরে আকাশে

হাত বাড়াতে চেয়েছে। কল্পনায় নিজের নামের পাশে তার বাবা-মাকে সে সমান মর্যাদায়, ভালোবাসায়, মেলাতে চেয়েছে। অথচ সেই মিলনের পথে কেন আর কোথায়ই-বা এতো বাধা, তুমি তাকে একটিবার বলবে না মা ?'

রুচিরা অ-নে-ক ক্ষণ ধরে মুখ নামিয়ে বসে রইলো, তারপর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলো : 'তোর বাবার সাথে আমার প্রথম আলাপ পৌষমেলার এক কবিতা-পাঠের আসরে। আমি তখন বিশ্বভারতীর ফাইন্যাল-ইয়ার এম. এস্-সির ছাত্রী। অরুণেশের প্রথমদিকের কবিতার মতোন ওর জীবনটাও ছিলো আগাগোড়া বাঁধন-ছেঁড়া, বেপরোয়া আর বোহেমিয়ান্। আমি আসাম থেকে গিয়েছিলুম পড়তে। কোনো কিছু ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই, বলতে পারিস, আমি ভেসে গেলুম। যেভাবে উদ্দাম স্রোতের মুখে কুটোটি ভেসে যায়। আমার ফাইন্যাল শেষ হতেই কলকাতায় গিয়ে আমরা ঘর বাঁধি। বাড়ীতেও প্রথমদিকে জানতে দিইনি,—মা'র হার্টের অসুখ ছিলো। ভেবেছিলুম, শান্ত, সংযত জীবনের ছকে একটিবার বাঁধা পড়লে তোর বাবার ভেতরকার সম্ভাবনাগুলো শতেক দল মেলে ফুটে উঠবে। কিন্তু বছর ন-ঘুরতেই যে-কে-সেই। প্রায়ই একদল ওরই মতোন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের সাথে আড্ডা দিয়ে, হৈ-হুল্লোড় করে, অনেক রাত্তিরে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরতো। এর মাঝে তুইও এসে পড়েছিস, অথচ রোজকারের বাঁধা কোনো পথই নেই। বছর তিনেকের ভেতর তোর বাবা গোটা তিনেক চাকরী ধরেছে আর ছেড়েছে। বাধ্য হয়ে আমি তখন গানের টুইশানি শুরু করি। সমস্তই মুখ বুজে মেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহ্যের বাঁধও ভেঙে পড়লো, যেদিন'—

এবার সেই চূড়ান্ত প্রশ্ন, যার সমাধান খুঁজতে মা'র গোপন দেরাজে হাত সেঁধোতে হয়েছিল রুণাকে। সামান্য বিরতির পর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় রুচিরা বললে, 'যেদিন থেকে দলে পড়ে তোর বাবা ব্রথেলে যাওয়া শুরু করলো। আমি দু'বছরের তোকে নিয়ে আসামে ফিরে এলাম। বাবা তখনো বেঁচে, তাই কলেজের এই কাজটি পেতে আমার তেমন অসুবিধে হয়নি।'

—'এবার দুটো প্রশ্নের উত্তর দেবে মা ?' রুণা এগিয়ে এসে রুচিরার কাছ ঘেঁসে খাটের ওপর বসে পড়লো, 'আচ্ছা, বাপী কি ওই একদিনই শুধু গিয়েছিলো, না-কি এটা ওর বরাবরকার অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিলো ? আর—হ্যাঁ, বাবা কি ও'র এই পদস্খলনের জন্যে কখনো অনুতপ্ত হননি ?'

—'ও-তো চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কবুল করে, ওইদিনই নাকি ওর প্রথম। আর, আমার হাতে-পায়ে ধরে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলো ভবিষ্যতে এভুল

আর হবেনা বলে। বলেছিলো, যা' কিছু করেছে, সমস্তই নাকি ওর লেখালেখির একটি আবশ্যিক শর্তপূরণ অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ্ এক্সপেরিমেণ্ট,—এর সাথে ওর ব্যক্তিগত জীবন অথবা ধ্যানধারণাকে গুলিয়ে ফেললে ভুল করা হবে। কিন্তু'—

—'কিন্তু তুমি বাবাকে ক্ষমা করতে পারোনি, তাই না মা? অথচ বাপীকে তুমি আজো ভালোবাসো।'

—'ভা লো-বাসি?' রুচিরা এবার থতমত খায়, 'এর ভেতর ভালবাসার আবার কী দেখলি তুই?'

—'কেন নয় মা?' রুণা আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলে, 'একটা লোক, যে তোমার মেয়ের চরম সর্বনাশ করেও বাইরে সব অস্বীকার করলো, তার সাথে তোমার মানিয়ে চলা—আর, একজন মানুষ, যে চোখের জলে তোমার পা ধুইয়ে তার সাময়িক আত্মবিস্মৃতির কথা কবুল করলো, তাকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে আসা : এ দুটি আচরণের প্রথমটিকে যদি বলি তোমার ঘেন্না, শেষেরটিকে তবে কী বলবো মা?'

রুচিরা এই প্রথম পূর্ণদৃষ্টিতে দেখলো তার মেয়েকে। কিছু বলবে ভেবেও, কম্পিত অধরে ওষ্ঠ চেপে, রুণার মুখখানি দুটি হাতের আঁজলে তুলে ধরলো। তারপর আঁচল দিয়ে রক্তের ছোপগুলো মুছে দিতে দিতে ধরাগলায় বললে, 'তোর খুব বেশি লাগেনি তো মা? আয়, একটু আয়োডিন লাগিয়ে দিই।'

রুণা দুহাত দিয়ে রুচিরাকে জড়িয়ে ধরে আবেগের গলায় বললে, 'তবে কেন তুমি অমন লুকিয়ে লুকিয়ে বাপীর বইগুলো পড়ো? কেনই বা রাত জেগে ডায়েরী লেখার ফাঁকে বাপীর ফোটোর দিকে ওভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকো? মাগো, আমি যা' দেখেছি, আমি যা' বুঝেছি, সে' কি তবে ভুল?'

রুচিরা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না। রুণার বুকে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মতোন ডুকরে কেঁদে উঠলো। আর রুণা সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো তার বুকের উপকূল দিয়ে রুচিরার আবেগের বিশাল তরঙ্গগুলিকে গড়িয়ে যেতে দিলো।

পরের দিনটি ছিলো শনিবার। সকাল ন'টা নাগাদ রুণা বেরিয়ে গেলো বাসের অ্যাড্ভান্স টিকেট বুক করতে। রুচিরা গেলো তার কলেজ থেকে ছুটির ব্যবস্থা করতে। সন্ধ্যেয় রেডিও থেকে, ঘরে বসেই শুনতে পেলো, তার নাম প্রথম দশজন স্থানাধিকারীর ভেতর প্রথমেই উচ্চারিত হতে। এরপর ঘণ্টাখানেকের ভেতর আসেন তার কলেজের প্রিন্সিপল মিসেস্ রাম্না বেজবরুয়া, —সংগে তিনজন অধ্যাপিকা। সবশেষে আসেন নিরু ও তার বাবা। নিরু

সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে।

রোববার ভোর ছ'টা পনেরোর সুপার এক্সপ্রেসে উঠেই রুণা বললে, 'এই যাহ্! বাপীর লাস্ট্ কবিতার বইটাই কিট্-ব্যাগে ঢোকাতে ভুলে গিয়েছি।'

—'আমারো', রুচিরা বিব্রত মুখে বললে, 'সেই ডায়েরিটা'।

দুজনেই পরমুহূর্তে কুল্-কুল্ করে হেসে ওঠে।

ভোর থেকে বিকেল অব্দি মেঘে মেঘে আসাম ভ্যালির সারাটা পথ পেরিয়ে এলো বাসটি। বৃষ্টির প্রথম ছোঁয়া লাগলো মেঘালয়ে ঢুকে। শিলঙে আধঘণ্টার বিরতি। এখানে বাস বদ্‌লে চেরাপুঞ্জি এক্সপ্রেসে উঠতে হবে।

ওয়েটিং-রুমে রুচিরার চুল আঁচড়ে বেঁধে দিয়ে, রুণা প্রথমে তার ব্যাগ থেকে দুগাছি শাঁখা বের করে' খুব সন্তর্পণে ওর দুটি হাতে পরিয়ে দিলো। তারপর রুচিরার অবাক চোখের ওপর এককৌটো সিঁদুর তুলে ধরে বললে, 'অনেক দিনের অনভ্যেস। ফোঁটা আঁকতে গিয়ে তিলক এঁকে ফেলতে পারো। এসো, আমিই পরিয়ে দিই।' এরপর রুচিরার চিন্তাক্লিষ্ট, ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শকুন্তলা পতিগৃহে রওনা হবার আগে কণ্বমুনি কী কী উপদেশ দিয়েছিলেন, মনে আছে তো মা?'

রুচিরা এবার না হেসে আর পারে না। বললে, 'তা' হ্যাঁ-রে পাকাবুড়ি, আমার দশাটা আবার শকুন্তলারই মতোন হবে না তো? তোর বাবা তো জানে তুই একাই যাচ্ছিস্। আমার কথা তো ওকে কিছু জানাস্‌ওনি ফোনে।'

–'আহ্-হা মা, শকুন্তলার এস্‌কোর্ট হিশেবে দুষ্যন্তের দরবারে কারা গিয়েছিলো জানো তো? কি যেন বিদ্‌ঘুটে নামের দুটো বন্দার ছাতা। আমি গেলে পিক্‌চারটাই অন্য রকমের হোত। যাই হোক—তুমি কিছু ভেবো না, আমি ম্যানেজ করে দোব'খন সব।'

রুচিরা খিল-খিলিয়ে হেসে ও'ঠ।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ, অঝোর বৃষ্টির ভেতর দিয়ে বাস এসে চেরাপুঞ্জি স্টেশনে প্রবেশ করে। ফ্ল্যাশ-লাইটের আলোয় তখন সারা স্টেশন চত্বরই ঝলমল করছিলো।

শেষ যাত্রীটি নেমে না যাওয়া ইস্তক ওরা সীট থেকে নড়লো না। শেষ পর্যন্ত কন্ডাকটার আর ড্রাইভারও যখন নেমে গেলো, তখন রুণাও তার কিড্-ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়লো। যাবার আগে মাকে বললে, 'আমি না-আসা পর্য্যন্ত একদম নড়বে না। মনে থাকে যেন।'

চত্বরের একান্তে টিনশেডের নীচে ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তর-চল্লিশ

ভদ্রলোকটিকে নিচু হয়ে প্রণাম করতেই রুণাকে তিনি দুটি ব্যগ্র হাতের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'তুমিই রুণা? কতো বড়োটি হয়ে গিয়েছো। রাস্তায় একা আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

'না বাবা। আমি রীতিমতো এনজয় করতে করতে এসেছি। কিন্তু'—রুণা মুখখানি কাঁচুমাচু করে বলে, 'মুশকিল হয়েছে একজন কো-প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে। ভদ্রমহিলা শিলং থেকে উঠেছেন। খুবই অসুস্থ। ওঁকে বাস থেকে নামিয়ে আনতে আমায় একটু সাহায্য করবে বাবা? পুরুষ মানুষের সাহায্য ছাড়া তো এটা সম্ভব হবে না।'

অরুণেশ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ছাতাটা খুলতে খুলতে বললেন, 'সে-কি, এতোক্ষণ বলিস নি কেন?' তারপর বাসের দিকে যেতে যেতে বললেন, আয়তো দেখি।'

'তুমি এগোও বাবা,' পিছন থেকে রুণা স্বর উঁচিয়ে বললে, 'আমি খুঁজে দেখছি ওর কোনো আত্মীয়-স্বজন এসেছেন কি-না।'

অরুণেশ যেই মুহূর্তে বাসেব ভিতর পা রাখলেন, অমি মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। এভাবে, বাসটা আর রুণার মাঝখানে গড়ে উঠলো এক অলৌকিক চিক্। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রুণার মনে পড়ে গেলো সেই হারিয়ে যাওয়া কবিতার অপরূপ পংক্তিগুলি:

'ওগো রূপ, ভুবন-বিছানো রূপ! কেন
এভাবে মুঠোয় করে অহর্নিশ আমাকে ছড়াও?
বরং ফেরানো-মুখ নারীটির মুখোমুখি, প্রিয় শিশুটির কাছাকাছি
বৃষ্টির চিক্ হয়ে একটিবার আমাকে জড়াও:
আমাকে আমারই ছায়ে ক্ষণিক বিশ্রাম নিতে দাও।'

তার এবারের জন্মদিনে বাপীর উৎসর্গীকৃত কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতার শেষ ক'টি লাইন। যে বইটি সঙ্গে আনতে রুণার শেষ মুহূর্তে ভুল হয়ে গ্যাছে। মানুষ অনিচ্ছেয় কতো ভুলই তো আকছার করে থাকে।

আঁকশি

সৈকত রক্ষিত

জয়ালকাঠি গ্রামের চালাঘরগুলো দূরে থেকে চোখেই পড়ে না। গাছে গাছে আড়াল হয়ে থাকে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে জঙ্গল। অদ্ভুত সব গাছ। বিচিত্র তাদের নাম। জয়ালকাঠির লোকেরা সে-সব গাছ সঠিকভাবে চেনেও না। তারা খেয়ালখুশি মতো গাঁওয়ালি নাম দিয়েছে তাদের। আগাই, কুড়োন, হট্টু ইত্যাদি।

প্রায় মাঝ জঙ্গলে সাঁওতালদের বাস। মাঝে মধ্যেই শোনা যায় আড়বাঁশির সুর। সাঁওতালরা নাচে, গায়। ধামসা আর নাকাড়া বাজিয়ে জঙ্গল তোলপাড় করে। দল বেঁধে শুয়োরের পাল তাড়িয়ে নিয়ে গেলে তার বর্বর উল্লাসও পৌঁছে যায় জয়ালকাঠির ঘরে ঘরে।

সাঁওতালদের সঙ্গে জয়ালকাঠির লোকদের বড় একটা সম্পর্ক নেই। জঙ্গলের বাইরে তাদের দেখাও যায় কদাচিৎ। তারা কখনো কখনো ঝুড়িভর্তি ক্যান্দ পাকা নিয়ে আসে গ্রামবাসীদের কাছে। বিক্রির জন্য। সাঁওতাল মেয়েরা শাল দাঁতন, পাতা কিংবা রাইবাঁশের বোঝা মাথায় নিয়ে জয়ালকাঠির পাশ দিয়ে সিধা চলে যায় বাজারের দিকে।

বাজার বলতে মানবাজার। আশপাশের যত গাঁ গেরাম আছে, তাদের একমাত্র সংযোগস্থল এই মানবাজার। এখানে ব্যবসা জমজমাট। প্রায় আধা-শহুরে এখানকার ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করে নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের সঙ্গে। সদর শহর থেকে তারা আমদানি করে কাপড়-চোপড় আর সৌখিন মনিহারী জিনিশ। এখানে আছে সরকারী অফিস। কোর্ট-কাছারি। আছে বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে বাসে চড়েই গ্রামবাসীরা জেলা শহরের দিকে যায়। যায় অপরাপর দূরবর্তী গ্রামে, তাদের আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি।

মাগার ম মুচি শহর দেখেনি। তার কোন আত্মীয়-কুটুম্বও নেই। বুড়ি মা

ছাড়াও আছে বউ, বেদনী আর দুটো ছেলে। ছোট ছেলেটি এখনো মায়ের কোলে কোলে থাকে। ভালো করে হাঁটতে শেখেনি বলে হয়ত, নামও ঠিক হয়নি তার। ডাকে 'নুনু' বলে। আর বড়টির বয়স বছর আট তো হবেই। মাগারাম তার নাম দিয়েছে লীলকমল।

এই পাঁচজন নিয়ে মাগারামের পরিবার। জুয়ালকাঠি জঙ্গলের প্রান্তে তার বসবাস অনেকটা গ্রাম্য ও আদিমতাপূর্ণ। মাটির যে ঘরটিতে, প্রকৃত অর্থে, মাথা গুঁজে সে থাকে, তার মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র নেই। নেই কোনো কারিগরি স্পর্শ। সরল হাতে চৌকো করে তোলা মাটির পাতলা দেয়াল। তার মাঝে মাঝে খোঁটা পুঁতে ঢালু করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে চালার ঠাট। জঙ্গলের মহুল গাছ কেটে বানানো এই চালা খড় দিয়ে ছাইতে পারেনি মাগারাম। ধান হয় তার সামান্য। খড়ের বদলে তাই সাউঁড় ঘাস কেটে, চালায় সে গুচ্ছ গুচ্ছ ফেলে দিয়েছে। সেগুলো চিহড় লতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

ঘরের চারপাশ একটা এবড়ো-খেবড়ো পাঁচিলে ঘেরা। তার কতকটা কেটেই যেন আনাগোনার জন্য 'সদর' করা হয়েছে। সেখানে মুখোমুখি পোঁতা দুটো মোটা কাঠ। এই দুটো কাঠের গায়ে, খোপের মধ্যে, আড়াআড়ি কয়েকটা গাছের ডাল ঢুকিয়ে দিলে সেটা দরজার মতো হয়। গরু-ছাগল আটকানোর জন্য।

কপাট বসানোর আর্থিক সামর্থ্য মাগারামের নেই। প্রয়োজনই বা কি? মানুষ-সমান দেয়াল তুলে, দরজা দিয়ে কড়া নিরাপত্তা অর্থহীন তার কাছে। তেমন কোনো সম্পত্তিও সে সঞ্চয় করতে পারেনি। নিচু চালার ছোট ছোট দুটো মাটির ঘর। এক চিলতে বারান্দা। একটা দড়ির খাট। মেঝের ওপরে কোথাও কোথাও ঝুলছে গাঁট বাঁধা ভুট্টা। ঘরের সামনে কাঁকুরে ফালি জমিতে, এই ভুট্টার বীজ ছড়িয়ে সে এক প্রস্থ চাষ করে নেবে। বীজ বুনবে জ্যৈষ্ঠিতে. ফসল হবে ভাদ্রে। সে ফসল কেবল দুর্দিনের কথা ভেবেই সে এমনি করে ঝুলিয়ে রাখবে আসমানে। আর মাগারাম মুচির জীবনে দুর্দিনের কামাই নেই। এখন এই চৈত্রের দিনগুলোতে, এমনো হয়, যে পেটে পানিও সে জোটাতে পারে না। তখন ভুট্টা সেদ্ধ করে, ল্যাটো করে খেয়েও কটা দিন সে হায় হায় করে বাঁচে! যদিও তার বাঁচা-মরাতে সভ্যতার কিছু যায় আসে না।

কিন্তু তবু, মাগারাম বেঁচে থাকতেই চায়। নিজেকে ভেঙে চুরে চৌচির করে বাঁচার মধ্যেও কেমন যেন একটা মাদকতা আছে। সেই মাদকতার বশে সে দিন মজুরের ঘাম ফেলে। মাটি কাটে। পাথর ভাঙে। কোনো অন্তর্নিহিত

প্রতিবাদ ছাড়াই, লাঙল ঠেলে ঠেলে, অন্যের জমিতে আবাদ ফলিয়ে দেয়। আবার কখনো নিতান্ত নিরুপায় হলে, জীবিকার তাড়নায় সে কেবল ঘুরেই বেড়ায়। গ্রাম-গ্রামান্তরে। জঙ্গলে। তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে তার পরিবারও। বেদনী, নুনু, লীলকমল।

লীলকমল বড় ভাল ছেলে। বাপের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সে এখন থেকেই জংলী হয়ে উঠেছে। শিমুল গাছ সে সহজেই চিনতে পারে। ফলন্ত শিমুলের গাছ বাপকে দেখিয়ে দিতে পারলে, লীলকমল জানে, বাপ তার বড় খুশি হয়। কাঁধের লম্বা আঁকশিটা ধীরে ধীরে আসমানের দিকে তুলে ধরে।

প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে নদী-পুকুর-ইঁদারা শুকিয়ে যায়। এসময় এখানে-সেখানে ঘুরেও তারা মুনিষের কাজ পায় না। এমন দুর্দিনে শিমুলই তাদের বাঁচিয়ে রাখে। তারা শিমুলের ফল ফাটায়। তুলো বের করে। সেই তুলো বেচে আসে মানবাজারের আড়ৎখানায়।

চৈত্র পেরিয়ে গেলে শিমুলের ফল আর গাছে থাকে না। শুকিয়ে ফেটে যায়। বৈশাখের ঝড়ে, এমন-কি মৃদু হাওয়াতেও, ভেতরকার সমস্ত তুলো তখন বাতাসে উড়ে যায়। সেভাবে উড়ে যাওয়ার আগেই শুকনো ফল গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া দরকার। এই ক-দিনে আশপাশের গাছগুলো খালি করে নেওয়ায়, এখন তারা শিমুলের খোঁজে যেদিক-সেদিক বেরিয়ে যায়। তিন চারজনের একেকটি দল। সঙ্গে আঁকশি আর ঝুড়ি-বস্তা। তারা চলে যায় দূর-দূরান্তের কোনো গ্রামে। পেলে ভাল, না হলে সন্ধ্যের আগে ফিরে আসে নিজের কুড়ে-ঘরে। পরদিন ফের। অন্য পথে। অন্য কোনো অজ গ্রামের ভেতরে। যেখানে আর কোনো শিমুলয়ালা পৌঁছয়নি।

সেই তাগিদ নিয়ে সকাল থেকে ছটপট করে মাগারাম। বেদনীকে বলে, 'চাঁড়ে চ না গো। বেলাটা যে চড়চড়ায় বাড়ছে।'

'বাড়লেই কি করব? ঘরের কাজ-পাটগুলা করতে হবেক না?' বলতে বলতে, কোলের ছেলের মুখ থেকে মাই টেনে সে তাকে দড়ির খাটে আছড়ে ফেলে দেয়। নুনু কাঁদে।

'চুপ দে, চুপ।' লীলকমল খাটের উপর দাঁড়িয়ে লাফ ঝাঁপ করে। ভাইকে দোল খাওয়ায়। নুনুর কান্না তবু থামে না।

শেষমেশ শাশুড়ি তাকে কোলে তুলে নেয়। উঠোনময় দুলিয়ে বেড়ায়। তারপর খাটের তলায় নাদি-নাদাড়ি নিয়ে বসে থাকা ছাগলছানাগুলোর দিকে সে নিজেই নুনুর হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

নরম তুলতুলে ছাগলছানা হাতের নাগালে পেলে নুনু খলবলিয়ে ওঠে। খুশিতে সে কান টেনে মুচড়ে দিতে গেলে, শাশুড়ি বাধা দিয়ে বলে, 'আই দেখ, আই আই ....।'

বারান্দায় বাঁধা ছাগলের নাদি-পেচ্ছাপ ঝেঁটিয়ে বের করে বেদনী।

মাগারাম ছাগলগুলোকে বারান্দা থেকে খেদিয়ে নামায়। গোবর-মাকুলি দেওয়া নিকানো উঠোনের কোণে মাদী ছাগলটা বেঁধে, মুখের সামনে সে ফেলে দেয় গুচ্ছেক পাতপালা। ছানাগুলো খেলে বেড়ায়।

বেদনীর তখনো হাত খালি হয় না। সে শুকনো ঘুঁটে ছড়িয়ে রাখে। ঘুঁটে দেয় ও। শাশুড়ি বলে, 'থাক ক্যানে, আমি ত ঘরেই আছি।'

'হুঁ—', খানিকটা অসন্তোষ চেপে রাখে বেদনী। কাজের ব্যাপারে শাশুড়ি তার বড় ঢিলে-ঢালা। ফলে যত দায়িত্ব বেদনীর। বেরুনোর আগে আগে সে যতটা সম্ভব সংসার বাগিয়ে রেখে যায়। বেলা মেরে ঘরে ফিরে এসে মুখে দেবার কিছু থাকবে না জানলে, একেক দিন, ঘুম থেকে উঠে দু-এক পাই ভুট্টা ভেঙে নেয় ঢেঁকিতে। শাশুড়ি সেটা সিদ্ধ করে রাখে। নুন দিয়ে গুড় দিয়ে খেলেও শান্তি। কোনো দিন গুন্দলু ঘাঁটাও খায়। কোদো খায়। এত মেহনত করে পেটের আগুন নেভাতে না পারলে তার অনিবার্য তাড়নায় তারা হু হু করে। তখন ছেলে কাঁদলে মাগারাম, অবোধের মতো দাঁত খিঁচিয়ে মারে তার কান-চাপাটিতে। বলে, 'হরবকত্ টঁহা-টঁহা লাগাই আছে। —সুগুমু থাক।'

আজ তেমন কোনো মজুত খাবার নেই। তবে মুড়ি ভাজার জন্য চাল উলিয়ে রেখেছে বেদনি। ঘর-রাখা করতে শাশুড়ি যখন থাকছেই, কোনো এক সময় সে ভেজে নিতে পারবে।

খোলাতে বালি দেওয়াই ছিল। বেদনী কঞ্চির গোছাটা এনে দেয়। জ্বালানীর জন্য উনুনশালে রেখে দেয় গুচ্ছেক তুলো বের করে নেওয়া শিমুলের শুকনো খোলা।

বারান্দা থেকে ওরা সদরের দিকে যায়। দু-পা যেতে যেতে, মাগারাম, তার জন্য অপেক্ষমান আলো-হাওয়া-মুক্ত প্রকৃতিকে ঘরের চৌহদ্দি থেকেই এক পলক দেখে নেয়। রোদের ঈষৎ স্পর্শে ভোরের পরিমণ্ডল পাল্টে গিয়ে এখন ঝলমলে হয়ে উঠেছে।

লীলকমল ছুটে বেরিয়ে যায়। চালার গায়ে ফেলে রাখা আসমানমুখী বিশাল আঁকশি হাতে নিয়ে, মাগারাম শুধু বলে, 'দে, হুড়কা দে। হুড়কা দে।'

পথে যেতে যেতে, রোদটা সরাসরি মুখের ওপর পড়ে বেদনীর। সেই রোদে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার ময়লা-বসা রুপোর নাকছাবিখানা। তবু, রোদ থেকে বাঁচার জন্য, মাথায়, ঝুড়ির তলায় চেপে রাখা ঘোমটাটা সে আরেকটু টেনে সামনে ঝুলিয়ে নেয়। বাঁ দিকের কাঁখে নুনু তেমনিই থাকে। সে দুলকি চালে হাঁটে। মাঝে মাঝে হাত-দুহাত পিছিয়ে গেলে, দুপা ছুটেও নেয়।

আর লীলকমল? সারা রাস্তা সে দৌড় ঝাঁপ করতে করতে যায়। কোমরের ঘুনসিতে বাঁধা ঘুঙুরে ঝুমঝুম আওয়াজ ওঠে। বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারে না লীলকমল। কোনো টিলা কিংবা পুকুর পাড়ে লুকিয়ে যায়। কাৎ হয়ে থাকা খেজুর গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে, বলে, 'হামি নাই যাব। যা ক্যানে তরা। নাই যাব।'

মাগারাম অনেকটা কালো এবং লম্বাটে, রুগ্ন চেহারায় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে বড় সুরেলা গলায় ডাকে তাব ব্যাটাকে। বলে, 'লীলকমল! আয় ব্যাটা—'

ইতিমধ্যে গোটা চারেক গ্রাম তারা পেরিয়ে এসেছে। বৈষ্ণবপুর, তড়াডি, মালডি ইত্যাদি। এদিকে বড় একটা তাদের আসা হয় না। গ্রামের নামের সঙ্গে এখানকার প্রকৃতিও তাদের অজানা। তবু এই অজানা অচেনা গ্রামে ঢুকেও আনাড়ির মতো তারা এদিক সেদিক ঘুরেছে। কখনো ক্ষেত-ডুংরির ভেতর দিয়ে, কখনো বা টিলার ওপরে উঠেও একচক্কর দেখে নিয়েছে অঞ্চলটা। কিন্তু শিমুল? চোখেই পড়েনি। মালডিতে কোনো এক গ্রামবাসীর ঘরের উঠোনে মস্ত মস্ত দুটো গাছ দেখেছিল বটে, কিন্তু সে দেখাতেও লাভ হয়নি মাগারামের। ফল তাদের ঝেড়ে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে কবেই। সে কারণেও খানিকটা হতাশা তাদের পায়ের গতিকে এখন ঢিমিয়ে দিয়েছে।

মাগারামের হতাশার কোনো প্রকাশ নেই। প্রখর অনুসন্ধানী-দৃষ্টি নিয়ে, টাই-টাই করে, কাঁধের আঁকশি নাচিয়ে সে হেঁটেই চলেছে। মালডি ছেড়ে আসার আগে লোকজনের ভিড় আর ডুগডুগির আওয়াজ পেয়ে তারাও ঢুকে গেছিল সাঁওতালদের বস্তিতে। সেখানে আচম্বিতে ভালুকের নাচ দেখতে পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিল তারা। ভিড়ের ভেতরে ঢুকে, সব ভুলে গিয়ে, সে নাচ শিশুর মতোই উপভোগ করেছিল। হেসে ছিল। তালিও দিয়েছিল। এখনো তার রেশ কাটেনি।

লীলকমল পিছনে পড়ে থাকে। হাঁটার ক্লান্তিতে তার চনচনে ভাব অনেকটা কেটে গেছে। তাকে হাসি খুশি দেখার জন্য মাগারাম ডাক দেয়। পিতৃত্বসুলভ সে-ডাকে স্নেহ ও প্রশ্রয়ের কোনো অভাব নেই। বলে, 'হ্যাঁ ব্যাটা, ভালুকটা

কেমন নাচতে ছিল রে? দেখা না?'

বেদনীও তাকে ডাকে। বলে, 'আয়। কই দেখাছিস?'

নীলকমল হাসে। হাত উল্টে নাকটা মুছে নেয়। তারপর কোনো ভূমিকা ছাড়াই হুবহু ভালুকের মতো সে নাচতে থাকে।

আর মাগারাম, সেই ভালুকয়ালার মতো, নাচের তালে তালে গান ধরে:

গ্যান ঘ্যাটাগ্যান
গ্যান ঘ্যাটাগ্যান…
জংগলকে ভালু—জংগলকে এ এ এ…
জংগলকে ভালু জংগলকে।

মাগারাম পিছন ফিরে বেদনীকে ডাকে। গাছপালায় আড়াল হয়ে থাকা গ্রামটার দিকে থুতনি বাড়িয়ে বলে, 'জঙ্গল ত দেখাছে। চল দেখি রাগে রাগে। চল।'

আর কত রাগে হাঁটবে বেদনী? খেজুরের বিচিগুলো শেষবারের মতো চুষে ফেলে দিয়ে বলে, 'কন্ গাঁ বঠে? হ্যাঁ গো, নাম কি গাঁটার?'

'কে জানে।'

রাস্তার ধারে ছাগলের গায়ে জল ঢেলে স্নান করাচ্ছিল এক বুড়ো। তাদের সে গ্রামের নাম জানিয়ে দেয়। বলে, 'উ গাঁ-টা? রঞ্জনডি। তরা গাছ কিনিস নাকি? শিমৈল্?'

বেদনী বলে, 'হঁ', গাছ হামরা কিনি। ত, হ্যাঁ গো, রঞ্জনডির ভিৎরে আছে, শিমৈল্ গাছ? ন, ফালতাই যাওয়া হবেক?'

'হঁ', আছে আছে। ওই য্যা গরাই-এর ঘর দেখাছে—'

বুড়োর কথায় ভরসা পেয়ে মাগারাম আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে। জানতে পারে, এই রঞ্জনডিতে একমাত্র ভকু গরাইয়েরই তিন-তিনটে গাছ আছে। প্রায় প্রতিবছরই পিয়ারশোলের মাঝিরা এসে চুক্তি নিয়ে যায়। এবারে এখনো পর্যন্ত তাদের দেখা নেই।

'মাঝিরা কিনে? তবে কি হামদেরকে বিবেক?' মাগারামের সন্দেহ হয়।

'নাই দিবেক? টাকা তরাও দিবি ন? থোড়াই মাঙনা লিবি?'

'দেখি যাইয়ে তবে। কি নাম বললে, ভদু গরাই?'

'ভদু লয়। ভকু ভকু।'

'অ। ভকু গরাই —।'

ভকু গরাইয়ের ঘরে ঢুকতেই, রাস্তা ছায়া করে আছে এক বিরাট কচড়া

গাছ। ছাগল চরছে। রোদ্দুরের মধ্যে এতটা হেঁটে আসাতে, বেদনীর মনে হল, এই জমাট ছায়াতে বসে দু-দণ্ড আগে জিরিয়ে নিই। কিন্তু সেভাবে জিরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ মাগারাম তাকে দিল না। এতক্ষণ যে মানুষটি হতাশা ও ক্লান্তি গোপন করে প্রায় ঝিমোতে ঝিমোতে আসছিল, এখন এই গরাইয়ের ঘরে শিমুল গাছ দেখতে পেয়েই সে চনমনিয়ে উঠল। সদরের পাল্লাবিহীন চৌকাঠে লম্বা করে পা বাড়িয়ে, সে একরকম প্রাচীন আত্মীয়তার সূত্র ধরেই যেন ডাক দিল। বলল, 'ভকু দাদা কুথা গেলে। হেই গরাই দাদা—'

'কে বঠিস হে ?'

'হামরা। এই জুয়ালকাঠির মুচিরা বঠি। গাছ চুক্তা করতে আইসাছি।'

'গাছ চুক্তা ?' গায়ে-পিঠে চঠাস চঠাস তেল মাখতে মাখতে গরাই বেরিয়ে আসে। কানের লতি আর নাভির ফুটো দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে তেল। সেই তেলের একটা ঝাঁঝালো গন্ধ পায় মাগারাম। বেদনীও।

তেল মাখার এই প্রাচুর্যপূর্ণ সেকেলে ভঙ্গী তার আভিজাত্যেরই প্রকাশ। বোঝা যায়, চৈত্র মাসে তার গাছগুলো কিনতে কেউ না এলেও মোটেই উদ্বেগ থাকত না গরাইয়ের। ধন তার কে খায়! গোবর নিকানো বিরাট উঠোনের এক প্রান্তে বড়-চালার গোয়াল ঘর। সেখানে বাঁধা রয়েছে অনেক কটা গাইগরু। করুগেটেড ছাউনি দেওয়া এই গোয়ালের পাশের ঘরটিতে বস্তার লাট লাগানো। ধান-চাল কিছু হবে। এক কথায় চাষাভুষো রহিস আদমি এই ভকু গরাই।

উঠোনে ছেড়ে রাখা বকনা বাছুরটা ডাক ছেড়ে লাফাচ্ছে। মাগারাম দেখে পেঁপে গাছ। দেয়ালের গা ঘেঁষে ওঠা সে গাছগুলোতে গাদাগাদি হয়ে ফল ধরেছে। আহা! গরাইয়ের খাবার গরজ নেই। মাগারামের মনে হল, কত সহজেই সে আঁকশির একটা হ্যাঁচকা টানে এগুলো সে নামিয়ে নিতে পারে।

জিভে জল এসে গেল মাগারামের। চোখ ভরে এলো অশ্রুতে। একজন অবস্থাপন্ন স্বচ্ছল মানুষের পাশাপাশি এক অভুক্ত ক্ষুধার্ত মানুষের চিত্র বড়ই করুণ। বড় হৃদয় বিদীর্ণ করা। বেমানান। নিজের অশ্রু গোপন করতে গিয়েও তা পেরে উঠল না মাগারাম। সেই কাতরতা বেরিয়ে পড়ল তার মুখের ভাষায়। রীতিমত সম্ভ্রমের সঙ্গে সে বলল, 'দেন আইজ্ঞা, সুবিস্তা হিসাবে দিয়ে দেন। আজ দিনভর ঘুরেছি। কিন্তুক একটা গাছ জুটাতে পারি নাই।'

'কি করে পারবি ?' গরাই বলে, 'ফরেস্ট করছে গরমেণ্ট। আর গরমেণ্টের লোকরাই হচ্ছে চোর। লিজেরাই লোক লাগায় কাটা করাছে। নাইলে—এই মানবাজার থানার পারা জঙ্গল—পুরুইলা জ্যালার ভিৎরে ছিল ?'

'নাই ছিল।'

'আর আজ? আজ একটা শালপাত খুঁজলে পাবি নাই।' বলতে বলতে, সে হাতের চেটোয় অবশিষ্ট তেলটুকু আঙুল ডুবিয়ে সোজা নাকের ফুটোয় ভরে দেয়। লম্বা টান দিয়ে বলে, 'গাছ কিনবি? ও গাছ পেছু কি দাম দিবি বাবু তরা? হামার তিনটা গাছ আছে। বল।'

'তিনটা গাছ? তিনটা ত এক মেলের নাই। উনিশ বিশ আছে।'

স্যা ত আছেই। আমি কি বলছি, তিনটা গাছেই তিন মণ করে ফল হবেক? একটা গড়পড়তা দাম বল ন ভাই?'

মাগারাম চিন্তা করে। কি দাম বললে সে খুশী করতে পারবে গবাইয়ের মতো লোককে? চিন্তা করেও সে থলকুল পায় না। প্রত্যেকটা গাছ লক্ষ্য করে সে আলাদা আলাদা হিসেব কষারও চেষ্টা করে।

একেবারে পিছনের দিকে যে গাছটি, সেটা তেমন বড় না। কিন্তু আর যে দুটো রয়েছে, প্রত্যেকটিতে তিন মণ করে না হলেও সওয়া দুই থেকে আড়াই মণ ফল হবে। মুড়ি বস্তা ভরে গিয়েও উপচে পড়বে ফলে। তবু মাগারামের ইচ্ছে হল, নিজের দারিদ্র, অক্ষমতা ও অদৃষ্টকে সমর্পণ করে হাত জোড় করে তাকে বলেই ফেলে, 'বাবু! হামরা ভখার জাত। মুচি। হামদের দশটা টাকায় কি কাম দিবেক আপনার?'

কিন্তু ভালোভাবেই, এমন কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারল না। দারিদ্র পীড়িত উপবাসী এবং সামাজিকভাবে ঘৃণ্য চর্মকার হলেও, একটা আত্মমর্যাদা-বোধ তাকে লাগামের মতো টেনে ধরল। আঁকশিটা দেয়ালে নিঃশব্দে ঠেসিয়ে, সে, একবার বেদনী আর একবার সেই দৈত্যকায় গাছগুলোর দিকে হাবার মতো তাকিয়ে থাকে।

'কি? নাই বলতে পারলি?' ভকু গা চুলকে হাসে।

'এক দাম বলব আইজ্ঞা? লিবার দাম? মাগারাম ভরাট গলায় গোটা গোটা করে বলে, 'তিন গাছে চল্লিশ টাকা দিব? হবেক?'

'চল্লিশ টাকা?'

'তার বেশি কি করে দিয়া সম্ভব? জিনিষটার পিছনে মেহনত আছে ন? বহুত মেহনত। এই ধরুন—'

মাগারাম তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। ফলটা দু মণ হোক কি তিন মণ হোক, সেটা নিয়ে গিয়েই তো সে বাজারে বেচে আসতে পারে না।

এখন এর প্রত্যেকটা ফল ভেঙে তুলোর দলটা বের করতে হবে। তাকে ফের দুটো একটা দিন উঠোনে ফেলে রোদ খাইয়ে তবে সে বাজারে নিয়ে যেতে পারে। নচেৎ বেশী ভেজা থাকলে আড়াই টাকার জায়গায় সে কেজিতে দেড় টাকা পাবে।

গরাইয়ের মন একটু নরম হয়ে যায়। বলে, 'তাইলে চাল্লিশের বেশী লারবি? কিন্তুক হামি তদেরকে মিছা বলব নাই, গেল বসসরেও ওই অপারের গাঁটা—কি নাম—'

'ধাদকি ডি।'

'হঁ, ধাদকি ডি। সেই ধাদকি ডি-পিয়ারশোলের মাঝিরা পঞ্চাশ টাকায় চুক্তা নিয়েছিল। কিন্তুক তাথে হামার দুঃখু নাই। তরা অন্দুর লে আইসেছিস। চল্লিশ ত চল্লিশই!—লেহ্, ঝুড়ে লে! ঝুড়ে লে!'

ফল সব পেড়ে নেওয়ার হুকুম দিয়ে গরাই চলে যায়। ইদারায়।

তিন গাছে চল্লিশ টাকায় চুক্তি হলেও, আপাতত, কুড়ি টাকার বেশি দিতে পারে না মাগারাম। এক কুড়ি টাকা বানকি দিয়ে, আজ একটা গাছ সে ঝুড়ে নিয়ে যাবে। বাকি দুটো গাছও খালি করে নিয়ে যাবে দু-চারদিনের ভেতরে-ভেতরে।

আঁকশি লাগিয়ে, কাছাকাছির মধ্যে দু-একটা ফল আগে পেড়ে নেয় সে। সেগুলো হাতে নিয়ে দেখে - ততটা কাঁচা নয়। ঝুনো হয়ে এসেছে অনেকটাই। ভেতরে চাপ বেঁধে থাকা তুলো—ঝিনুকের খোলে মুক্তোর মতো। পরিমাণেও বেশি। মাগারাম আশ্বস্ত হয়। হাতের ভাঙা ফলটা বেদনীকে বাড়িয়ে নিজের মনেই বলে ওঠে, 'গাছ বটে বাবু! গাছ বটে!'

বেদনী সেটা ঝুড়িতে রেখে নেয়।

আঁকশির টানে পড়ে যাওয়া ফল, কুড়োতে কুড়োতে, লীলকমল যেন খেলার নেশায় পড়ে যায়। মুহূর্ত আগেও, পাকা পেঁপেটি হাতে পাওয়ার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসেছিল, এখন তা অন্তর্হিত। এখন বাপ মায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে পেরেই সে খুশী। আত্মহারা! মাঝে মাঝে, মাগারামের মতো সে-ও, ঘাড় ওপরে করে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ বাবা, আজেই সোব পাড়া হ'য়ে যাবেক? আজেই?'

'হঁ। ই গাছটার সোব আজেই পাইড়ে লিব।'

'অ বাপ!'

আঁকশি ফেলে দিয়ে মাগারাম এবার, খাজে-কোটরে পা রেখে গাছে উঠে যায়। খানিকটা উঠে, বেদনীকে বলে, 'কই শুনলি, আঁকশিটা ধরা ন।'

বেদনী সেটা ধরিয়ে দিতে গেলে, লীলকমল বাধা দেয়। বলে, 'হামি দিব। দে হামকে।'

কিন্তু দিতে গিয়েও, কোনোভাবেই সে অত লম্বা আঁকশি ধরে দাঁড়াতে পারে না। উল্টোদিকে হেলে পড়ে তার টানে। ব্যাটার এই ভঙ্গী দেখে, বেদনী যত হাসে তত হাসে গাছের ডালে মাগারাম। হাসতে হাসতে তার মুখের হাঁ কোটরের মতো দেখায়।

গরাই আসে। লীলকমলের হাত থেকে আঁকশি নিয়ে সটান ধরিয়ে দেয় মাগারামকে। একরত্তি শিশুর এই অসাধ্য-সাধনকে মনে মনে, 'টিকটিকিয়ে ডুমুর গিলছে' উপমায় সে ঠাট্টাও করে। আর চোখ পিটপিট করে, মাগারামকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর নামটা ত বলিস নাই বাবু?'

'হামার? নাম? মাগারাম।'

'মাগারাম?'

'হঁ। মাগারাম মুচি।'

'তার মানে তুঁই মাইগে মাইগে বুলিস?'

মাগারামের মুখে রা নেই। গাছে ওঠার পরিশ্রমে সে হাঁপাতে থাকে। শুকনো বাকলের ঘষটা নিতে হাত দুটো তার জ্বালা করে। ডালের ওপরে বুকটা নামিয়ে সে একটু জিরিয়ে নেয়।

'ফাগুনের বারিশ। ফল ত ঝড়বেকেই।' গরাই নিজের মনেই বলে যায়, 'কথায় আছে—আম আমড়া শিমুল / ফাগুনের জলে নিমূল। বঠে কি নাই? হ্যাঁ মাগারাম?'

'হঁ, আপনি যা বলেছেন উচিত কথা।'

বেদনী বলে, 'আর সেই জন্যেই হামরা ফাগুন মাসের জলটা ডরাই। হামরা পেটে মরে যায়।'

'বঠে বঠে।' গরাই গাছের তলে একটু পায়চারি করে, বলে, 'এখন শিমৈল্ তুলাটা কত করে বিকাছে?'

'কত আর?' মাগারাম বলে, 'এই ধরে লেন ক্যানে—এখন ত চৈৎ মাসের কুড়ি দিন হঁয়ে গেল? এখন মানবাজারের দকানীরা আমাদের এই কাঁচা তুলাটা কিনবেক আধুলি কম তিন টাকায়। আর শুকাশুকি করে সেটা বিকবেক তের টাকায়। তার কারণ—'

কারণ বোঝাতে গেলে, শুরু থেকে অনেক কথাই বলতে হয় মাগারামকে। চৈত্রের বার - তের তারিখ থেকে শিমুলয়ালাদের কাঁচা তুলোটা বাজারে আসতে

শুরু করে। তখন তুলোটা থাকে খুব বেশি রকম কাঁচা। ফলে তার দামটাও কম পাওয়া যায়। বড়জোর দু টাকা কেজি। দোকানীরা এই মাল কিনে কামিন-ঝুমিনদের দিয়ে ঝাড়াই করে। ঝাড়াই বলতে, তুলোর ভেতরকার ভুঁতি আগে বের করে নেওয়া। ভুঁতিটা অনেকটা অজুর্ন ফলের মতো দেখতে। একটু লম্বাটে। তুলো থাকে এর খাঁজে খাঁজে বসে। তাকে ছাড়িয়ে নিলে ভুঁতিটা আর কোনো কাজে আসে না। সেটা এমনিতেই পচে থাকে। বরঞ্চ শিমুলের খোলাটা জ্বালানী করা যায়। কিন্তু দোকানীরা ত খোলাসুদ্ধু কেনে না। খোলা শিমুলয়ালারাই ছাড়িয়ে রাখে।

কামিনদের দিয়ে ছাড়ানোর পর, সেই তুলো নাগাড়ে দশ-বারো দিন রোদ খাওয়াতে হয়। তখন তার ভেতরকার অতিরিক্ত জল বেরিয়ে তুলোটা ওজনে কমে যায়। মোটামুটিভাবে তখন চার কেজি মাল এক কেজিতে দাঁড়ায়। হাতে দু টাকা লাভ, সেই সঙ্গে ঝাড়াই বাবদ দু টাকা খরচ ধরে, এই তুলোটা বার টাকা কেজিতে বিক্রি হয়ে যায়।

তবে কাঁচা তুলোটার আমদানি থাকে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত। তখন সেটা গাছে থাকা অবস্থাতেই অনেকটা শুকিয়ে থাকে বলে, তার দামও একটু বেশি পায় শিমুলয়ালারা। ফলে তখন ঝাড়াই শুকনো তুলোর বাজার দরও বার টাকার জায়গায় তেরতে উঠে যায়।

সব শুনে, গরাই মন্তব্য করে, 'তাইলে দকানীদের লাভটাই বেশি লয়?'

'বেশি বলে বেশি! হামরা এত খাটা-খাটালি করে যে টাকাটা পাঁছি দকানীরা সেটা বিন-খাটালিয়ে পাছে।'

এমন কথা বললেও, প্রকৃতপক্ষে, দোকানীদের প্রতি কোনো আক্রোশ থাকে না মাগারামের। দোকানীরা তার মহাজন। তুলো দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বিপদে-আপদে বিশ-পঁচিশ টাকা সে তাদের থেকে হাওলাতও পায়। আর সেখানেই সে অপারগ। বঞ্চনার চিরন্তন রীতি টের পেয়েও ক্ষুধার্ত মানুষের সর্বশেষ আক্রোশ নিয়ে হামলে ওঠার পথ সে অনুধাবন করতে পারে না। বরঞ্চ, এটাকেই আস্তে আস্তে সে ভেবে নিয়েছে প্রথা। একদল যোগান দিয়ে যাবে, আরেক দল তার মুনাফা লুটবে।

মাগারাম হাসে। তার সেই হাসির দমকে, ডালে চাপ খেয়ে থাকা পেটটা পাঁজরা সুদ্ধু একেকবার ফুলে ফের চুপসে যায়।

বেদনী বলে, 'মাহাজন ত রোজেই বলে—যত পারবি তুলা দিঁয়ে যা।'

'বলবেক নাই? এক সময়, বুঝলেন আইজ্ঞা, এই মাহাজনরা—এই মানবাজারের

নারাণ কর, ভবতারণ মাহিন্দার, টুটুল দত্ত—তাদের বাপ-ঠাকুর্দাদাও শুধু তুলোরই কারবার করত। তারা বলত, তুলার পয়সা / কুলা কুলা! —তবে হ্যাঁ, তখনকার সময় ছিল এক আলাদা।' বলতে বলতে, মাগারাম থেমে যায়। তুলা সম্পর্কিত প্রবাদ থেকেই অতীতটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে গরাইয়ের চোখে।

কিন্তু এখন সে-রমরমা কারবার আর নেই। আমদানি কম। আগের মতো চড় মেরে ঠকিয়েও নেওয়া যায় না। সেজন্য তুলোর ব্যবসায় নতুন করে কেউ আর নামতে আগ্রহী নয়। বাজারের মাঝে ভক্তচরণ দাসের ছিল পুরনো ব্যবসা। সুবিধে করতে না পেরে সে তুলোর পাট তুলে মুদিখানা খুলেছে। তা সত্ত্বেও অনেকে চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও, সারা চৈত্রমাস ধরে টুটুল বা ভবতারণ মাহিন্দারদের দোকানের উঁচু বারান্দায় এমুড়ো-ওমুড়ো ছড়ানো থাকে শিমুল তুলো। রোদ খায়। কামিনে ভুতি ছাড়ায়। মাগারামের মতো, গাঁ-গঞ্জের আরো সব এসে ভিড় করে তাদের আড়তখানায়।

গরাই শুনতে শুনতে কেবল থুতনি নেড়ে যায়। মাটিতে গেঁথে থাকা টিনের ভাঙা কৌটোটা সে পায়ের আঁচড়ে তুলে এক পাশে ঠেলে দেয়। একটু পরে লীলকমল সেটাই চুপিচুপি কুড়িয়ে আনে।

গরাই তা টেরও পায় না। আসলে, মাগারামের এই অদ্ভুত জীবিকা, তার শিমুল গাছে উত্তরণ ও অবতরণের মধ্যবর্তী বেঁচে থাকার বিষয়টি, মুহূর্তের জন্য হলেও তাকে ভাবিয়ে তোলে। সেই ভাবনার সূত্র ধরেই, খানিকটা সহানুভূতির দৃষ্টিতে সে দেখে যায় এই পরিবারবর্গকে। দেখে বেদনীকে। লীলকমলকে। আর দেখে—আসমানে সরীসৃপের মতো লেপ্টে, মাগারাম, সারা শরীর নিয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে উঠে যাচ্ছে। মগডালের দিকে। আর সেখান থেকে আঁকশি বাড়িয়ে দেবার আগের মুহূর্তে, মাগারামের ইচ্ছে হয় মাটির দিকে একবার চোখ ফেলতে। কিন্তু রোদে ও ক্ষুধায় মাথা তার ঝিমঝিম করে। মাটি দেখতে গিয়েও সে থই পায় না। পিঁচুটি-বসা চোখের ঘোলাটে দৃষ্টিতে সে দেখতে পায় নুনুকে। হামাগুড়ি দিতে দিতে গরাইয়ের পায়ের কাছে সে মাটি খুঁটে খাচ্ছে।

আর তৎক্ষণাৎ গাছ থেকে নেমে আসার জন্য মনটা আটুপাটু করে মাগারামের। কিন্তু অবতরণের কোনো সুযোগ তার নেই। শেষতক, তক্ষকের মতো, দীর্ঘকায় হাড়গিলে মাগারাম গাছের ডালে আপ্রাণ লেপ্টেই থাকে।

নুনু কাঁদে। ঠায় একবেলা উপবাসে এখনো সে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। মাথার পাশুটে এলো চুলে আলগা খোঁপা করে, বেদনী তাকে কোলে নেয়। উরুতে দোলা দিয়ে দিয়ে দুধও খাওয়ায়। তবু, খালি পেটের সাঁই সাঁই

কান্না তার থামে না।

গরাইয়ের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বেদনী বলেই ফেলে, 'বাবু, টুকু মাড়জল আছে ত দাও ন। এই নুনুটা হামদের সারাদিন লে ভখেই আছে।'

'মাড় কি এখনো আছে। থাম দেখছি।' গরাই ঘরের বাগালকে ডেকে ফেন দেওয়ার কথা বলে।

দিনের ফেনটা অবশ্য এখনো গরুর জাবনার পাত্রে ফেলা হয়নি। জামবাটি সুদ্ধু সেটাই বাগালে এনে দেয় তাদের জন্য। বলে, 'কিসে লিবি? লে।'

কানির মধ্যে পুটলি করে রাখা একটা টিনের বড় বাটি বের করে আনে বেদনী। সেটা বাড়িয়ে দিলে, তার মধ্যেই ছড়-ছড় করে ফেন ঢেলে দেওয়া হয়। সঙ্গে এক চাটু ভাতও। গরাই নিজের মহানুভবতায় খুশি হয়ে বলে, 'খাক। খাইয়ে বাঁচুক।'

ঠাণ্ডা, জল হয়ে যাওয়া মাড়ের গন্ধও কেমন করে যেন পৌঁছে যায় মগডালে। তার অমোঘ আকর্ষণে, মাগারামও, তড়াক তড়াক করে নামতে থাকে। ডালে ডালে লাট খেতে খেতে, সে আপনা-আপনিই ধপাস করে পড়ে মাটিতে। সামলেও নেয়।

গাছে তখন আর প্রায় একটিও ফল অবশিষ্ট নেই। ঝুড়িতে বস্তায় সেগুলো পুরেও ফেলা হয়েছে। বস্তার মুখে দড়ি টান টান করে বাঁধতে গিয়ে মাগারামের মাড় খাওয়া পেটের পাঁজরাগুলো যেন চড়চড় শব্দ করে ওঠে। ঝুড়ি-বস্তা মাথায় নিয়ে, ওরা, সন্ধের আগেই বেরিয়ে পড়ে।

পথেই নেমে আসে অন্ধকার। কিন্তু এখন ক্ষুধা ঈষৎ নিবৃত্ত হওয়ায় ঘরে ফেরার তেমন তাড়া নেই। সবার আগে আগে মাগারাম। মাথায় বিশাল বস্তার বোঝাটা নিয়ে, ডান হাতে আঁকশি দোলাতে দোলাতে এগিয়ে চলে। আর সমস্তটা পথ, গোঙানির মতো, আউড়াতে থাকে কোনো লৌকিক গীত।

পিছনে বেদনী। লীলকমল। সেই সুরে সুর মিলিয়ে হেঁটে চলে।

আকাশকোঠা

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

লোহাচড়াদ্বীপ

দ্বীপটা গামলার মতো ভেসে আছে। চারদিকে অথৈ নোনা জল, সমুদ্দুরের মোহনা মুখ আর বা কত দূরে। জোয়ার উঠলে জলের তোড় হু হু করে ছুটে আসে। নোনা দাঁতে মানুষের তৈরি বাঁধ ঘেরি চিবোতে। ভর কোটালে কনট্রাকটরদের পোঁতা বাঁশ শাল খুঁটির পাইলিং গোড়া উল্টে বিপর্যস্ত। দ্বীপটা ভাঙছে, বিশাল ধস নিয়ে ডেলি ভাঙছে।

এক ঘর দু-ঘর করে দ্বীপের সম্পন্ন মানুষ সব ছেড়ে ছুঁড়ে ভিন দেশে খুঁটি গাড়ছে।

ভবতারণ কুইতি সব মাল পত্তর বয়ে ছয়ে গোটা সংসার বড় বোটে তুলে দিয়ে ঈশ্বর ডিঙালের দু-পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বাবু গো তুমি সব ফেলায়ে চলি যাচ্ছো। যেখানে যাচ্ছো ভালো থাকো। আমানকে গাঙে খাউকে আর ভাসায়ে লে যাউক, শুধু একটুকু লিখন দাও, এ দ্বীপে তোমার সম্পত্তি ভবতারণ দেখা শোনা করবে।

ডিঙালের বউ দাঁড়িয়ে শুনেছিল সব। খসা ঘোমটায় কালো মুখে চোখের জলের শুখনো দাগ, কদ্দিন আর ভোগজাতি করবি—

—যদ্দিন মা গঙ্গা বাঁচতে দিবে, মোটা গেঁয়ো গাছের গোড়ায় টাঙির কোপ বসিয়েই মনে পড়ল কথাগুলো ভবতারণের। সে ভাবলো, আর ক' ঘা। টেনে হেঁচড়ে রোদে শোখাতে পারলে বিশ দিনের জ্বালানি। রেখে দে তোর ঝড় ঝাপ্টা আটকের পরামর্শ। এখন তো ভাত ফোটানোর যোগাড় হউক তারপর চোত বোশেখের ঝড়ি বাদল।

তিনটে লঞ্চ অনেকক্ষণ ও পাশের বড় গাঙে জল তছনছ করে দিচ্ছে। গায়ে নম্বর মারা কাছি সড় সড় করে ছেড়ে দেয় জলের মধ্যে। ডগায় ভারি

পাথর লোহার গহীন গাঙের বুকের খোল ছোঁয়। কাছির গায়ে নম্বর মিলিয়ে হিসেব লেখে পাশের বাবু লোকজন। আজ কদিন ধরে একাণ্ড।
ঠক্ ঠক্ শব্দে টাঙির কোপ চালিয়ে যায় ভবতারণ।
একটা সাদা ধপ ধপে লঞ্চ, লঞ্চের মাথায় লাল আলোয় ঘেরা কাঁচ। রোদে জ্বলছে। কানের আওতায় আসতেই ভট্ ভট্ শব্দ। নোনাজল ছিঁড়ে কুটে ফেনা কাটছে পাথায়। কেবিন ঘরে সাদা সাদা জামা কোট প্যাণ্টে সাহেব সুবো অনেকগুলো। লঞ্চটা কাছে আসতেই অবাক! লাল মুখো সাহেব। ভবতারণ ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে আসে,··আরে এতো দিশি লয়। বিলিতি···। অবিকল তরমুজের মতো মুখ। মুখের মাংসে যেন কাটা তরমুজের লালি ফাঁস। নোনা দেশের রোদে পুড়েছে বেশ।
সাহেব চার জন মন দিয়ে জল দেখছে। একটু পরে দ্বীপটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মেসিনের আওয়াজ কমে গেছে, ধীরে ধীরে দ্বীপের গা ঘেঁষে চক্কর দেয় লঞ্চটা। চোখে দূরবীন লাগিয়ে সাহেব চারজন পাশে পিছনে তাকায়···· জল··ধূ··ধূ· গাঙ।
সাহেবদের পাশে দিশি অফিসার বাবুদের ভিড়। উৎকণ্ঠায় বিনীত। খোদ হল্যাণ্ড থেকে এসেছে নদীর নাড়ি বুঝতে, দ্বীপটার বিধাতা হয়ে। সাহেবরা বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে। শেষে বললে এ্যাবন্ডান্
সঙ্গের বি ডি. ও সাহেব হতাশ গলায় বলে ফেলে, পরিত্যক্ত। এবার বাজেটে যে বিরাট অঙ্কের টাকা স্যাংশনের কথা ছিল···। কত কাজ করা যেত!
পাশে ভূমি রাজস্ব অফিসার গম্ভীর গলায় বলে, রেভিনুয়্যু—
দ্বীপের শেষ পঞ্চাশ ষাট জন প্রাণী জায়গাটায় জমা হয়। সামনে ভবতারণ, পিছন পিছন বাচ্চা কোলে বউ বুড়ি বেকুব জোয়ান ছোকরারা এক সঙ্গে চেঁচায়, বাবুরা দ্যাখতে আসছেন গো—
দায়ে পড়েন বি. ডি. ও, তাঁর এলাকা,-না। জোরে চেঁচায়, আপনারা এদ্বীপ ছেড়ে চলে যান। বিপদ হতে পারে—
লোকগুলো আরও এগিয়ে যায়। একদম জল কিনারে। রেভিনুায় অফিসার ধরিয়ে দেন, বলুন, খাজনা ছাড়—
বি. ডি ও. দায়িত্বটা বুঝে ফেলেন, গরমেণ্ট আর খাজনা নেবে না। বিপদে পড়লে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।
—দূর বাপু। নতুন কী আর শোনালে····! উপহাসে আশংকা চাপা দেয় মানুষগুলো। ভবতারণ আবার বলে, হুঁ। উনপঞ্চাশের বানে বাপ্ ঠাকুদ্দারা

ভাসছে, না হয় এবার আমান কো পালা—

ফোকলা দাঁতে কোমর বাঁকা জেলে বুড়ি দুষোয়, এতো বড় দ্বীপটা গাঙের পেটে দিয়ে গেলি গুয়োর বেটারা—।

ভবতারণের পাশাপাশি হাঁটছে কালীতারা। সাদা থান কাপড়ে ডাঁটো মেয়ে মানুষ। শক্ত কবজি, একটানা বিশ হাত কোদাল কুপিয়ে একবারও হাঁপায় না। বরং ফিক ফিক হেসে পাশের লোককে উসকোয়, তোমরা মদ্দ মানুষ নাকি? ধোঁয়া দাও আর এক ঝুলুক লাগবো।

—বাবা

হাঁটার গতি কমিয়ে দেয়। ঠিক গায়ের কাছে এলে, কী কইছিলি?

—মানুষ থাকবে····

—যাবে কাই? যেখানে যাউক ঘর পিছু এত জমিন, ধান, কোন শালা দিবে? কাউরে ভাগ নাই মনিবের ধাতানি নাই

—না থাউক। গাঙ' যে ধাতায়

—সে কি ফিসনু?

কালীতারা চুপ করে যায়। হাঁটে পাশাপাশি। অন্ধকারে সাদা থান শাড়ি। হাওয়ায় এলো চুলের ওড়াওড়ি। পুরোনো ফুল ছাপা ব্লাউজ। ছুট পাট পা ফেলে।

—থাম।

থমকে দাঁড়ায় কালীতারা। ছাব্বিশ সাতাশের যৌবন চলকে ওঠে ফুল কাটা জামায়। ঘাড়ের কাছে ঘাম। আঁচলে মুছে বলে, আমি যাবো তোমার সঙ্গে?

—না। তুই থাক—

—তবে দেখো। না হয় সকালা আসবে। টাঙি খুঁজতে গিয়ে আবার একটা না তাল ঘটে—এই রাত বেলায়

—ধুত্। যদি কাউর নজরে পড়ে জিনিসটা আর পাবো—

এখানে দাঁড়িয়ে কালীতারা ভাবে, এই দ্বীপে···এভাবে কতকাল আর····

কড়া রোদ। রিলিফ ইন্সপেকটরের বিরল-কেশ মাথায় চিক চিক করে সকালের তেল। দামী গন্ধওলা তেল। শুধু অবাক হয়ে কালীতারাকে দেখে ইন্সপেকটর! ভাবে, এমন উদোম নোনায় এতটা ফরসা ফরসা শাঁসালো মেয়েছেলে হয় কেমন করে! কালীতারার সামনে রোদের চিড়বিড়ানি উপশমের জন্যে একবারও হাত বোলায় নি মাথায় রিলিফ বাবু।

মানুষগুলো ছাপা ফরমে সই টিপ ছাপ মেরে ইন্সপেকটরের হাতে গুজে দেয়-হ্যাঁ সার

—বলুন

—আমানকে কোথায় ব্যবস্থা করবেন?

শ্রীমতী নগর বঙ্কাপুর—

ভবতারণ এগিয়ে আসে, সেটাও তো গাঙের ধার। ফিরে দরখাস্ত সই করে নতুন জায়গা খুঁজতে হবে নি—

ইন্সপেকটর টনকে ওঠে। তক্ষুনি জবাব দেয়, সে গাও · সে গাঙের বারোটা বেজে গেছে।

এখন মজে সেটা মাঠ।

কালীতারা এগিয়ে যায়। কথার ঘোরে বে-খেয়াল,—কতটুকু জমিন পাওনা?

ইন্সপেক্টর ফুলছাপা ব্লাউজ থেকে নজর সরিয়ে মুখটা দেখে। তেল সাবানের চটক নেই মেয়েটার চামড়ায়। —ফ্যামিলি পিছু পাঁচ ছ' কাঠার বাস্তু আর চাষের জন্যে এক বিঘে জমি—

সবাই চুপসে যায়।

—তাতে হবেটা কি? বাঁচতে গে মরণকূপে নাম লিখানো।

—আরে আগে চলুন সেখানে। আরও ব্যবস্থা হবে—ইস্কুল ঘর হবে, টিউকল বসবে।

লঞ্চের সারেঙ হাঁক দিলো, সার জল কমতিছে। অখন না হলে রাত আটটায় লঞ্চ ছাড়তে হবে কিন্তু···

জল কাঁপিয়ে লঞ্চটা স্টার্ট নেয়। ডেকের উপ দাঁড়িয়ে চিৎকার দেয়, যদি কেউ বাদ পড়ে দরখাস্ত নিয়ে অফিসে যাবেন—

শেষরাতের উঠোনে বসে বক বক করে যাচ্ছিল রাসবিহারী, শুধু পয়সা উড়তিছে। মিস্ত্রি ডেলি কত কামায় জানিস···· ফিস ফিস করে কানে ঢালে কথাটা।

—আমি গেলে তোর কী লাভ বিহারী? রঙিন শাড়ি জড়ানো কালীতারা কৌতূহলে চুপচাপ।

—ভিন কাজে টাইম দিতে পারি। খাটা খাটুনি করে আর রান্নাবাড়ি করতে ভালো লাগছে নি।

শেষরাতের নক্ষত্রের ফুরোনো আলোয় মুখটার আদল বোঝা যায়। ওপাশে জোড়া উনুনে কিছু পাতা নাতা গোঁজা। কুকুর বাচ্চাটা আড়মোড় দেয়। ঘড় ঘড় শব্দ।

পাশাপাশি দু-জন। কালীতারা বড় হলেও সমবয়সীর সম্পর্ক। বুকের ভেতরটা ছম্‌ছম্‌ করে রাসবিহারীর। গোল মনিবন্ধে দু-গাছা করে চুড়ি, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের চুড়ি সরু রুপোর বালা ঘোরায় কালীতারা। কোন উত্তর দেয় না। চারপাশে নিশব্দতা।

--চল কালী দি। ভালো থাকবি। দিলদিয়া বন্দরে শুধু কাজ আর পুইস্যা, পুইস্যা আর কাজ।

কালীতারা রাসবিহারীর হাতটা ধরে—হ্যাঁরা। খুব সুখে থাকা যাবে····

রাসবিহারী চমকে ওঠে! কালীতারার ঠাণ্ডা হাতে কী ঘন বিশ্বাস!

গুছিয়ে বলে বিহারী, জানিস আমাদের পাশের ঝুপড়ির মেয়েরা ফিণফিণে শাড়ি পরে সিনিমায় যায়, মুখ ভরে পান চিবায় আর হপ্তা নাইতো মাস গেলে ব্যাংকে টাকা রাখে—

—তুই?

খিট্‌খিট্‌ হাসে রাসবিহারী।—গত হপ্তায় সীতাচকের ব্যাংকে একটা পাস বই খুলবো বলে ফরম আনছি। জামার পকেটে হাত বুলিয়ে বলে, সিটা আমার ব্যাগে। দেখবি—

—থাক··। কথাগুলো অবাক হয়ে গিলতে থাকে কালীতারা। এত দিন শুধু জমি, মাটি কোপানো জ্বালুন-কাঠ যোগাড়, বাঁধ ভাঙছে শুনে শুনে দু-কানে কাদা জমে গেছে। রাসবিহারী কত নতুন কথা শোনায়। সুখের পথ বাতলে দিচ্ছে। বাপের ধরম বোনের ছেলে চেনা রাসবিহারীকে কত নতুন লাগে! সেই সাগরে মকর সংক্রান্তিতে চান করতে গিয়ে জামা গায়ে বাপের হাত ধরেছিল কালীতারা। রাসবিহারীটা একেবারে উদোম হয়ে তার মাকে জ্বালাচ্ছিল খুব। সামনে জোয়ারে টই-টই সুমুদ্দুর। লক্ষ লক্ষ মানুষের গিজ-গিজ মাথা। রাসবিহারীর মা, বাপকে বলেছিল—একটু ধরবেন ভাই ছেলেটাকে। চানটা সারি লিই—

মকর সংক্রান্তির দিনে সাগর বেলায় দাঁড়িয়ে ভাই ডাক, ওপাশে কপিল মুনির মন্দিরে শিলাসনে মহাতাপস নিমীলিত চক্ষু····

ভিজে কাপড়ে সম্ভ্রম সামলে, দাও দাদা ছেলেটাকে। এবার ওকে ডোবাই—।

—একেবারে চান করে দাদা ডাক দিলে মেয়ে, বলেছিল বাপটা।

যেন ধাক্‌কা খেল রাসবিহারীর মা। এলো মাথায় জলের ধারানি, দেহ অন্তর ধুয়ে পুরুষ মানুষটার মুখোমুখি, আজ থিকে না হয় দাদা হলেন গো বাবু তুমি—

—দাঁড়াও, মেয়েটাকে ধরো, বলে কালীতারাকে জমা রাখে রাসবিহারীর মায়ের কাছে। জামা কাপড়ের পোটলাটা তখন কালীতারার বুকে। সমুদ্রের পুণ্যস্নানে নির্মল নানুষটা এসে দাঁড়ায়। আঁজলা ভরতি পুণ্য বারি, বললো, কই বোন হাত পাতো—

হাত পেতেছিল রাসবিহারীর মা, পাতালুম ভাই বোন।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমুদ্রের জলো ছোঁয়াচ। হঠাৎ মনে হ'ল, চারজনে কতগুলো করে যে গরম জিলাপি খাওছিলুম! চোখের সামনে বড় হল রাসবিহারী। তার নিঃশ্বাসে ছেলেবেলার গন্ধ।

—পিসি কে লে যাবি....

—মাকে? থাম....মিস্তির কাছে কাজটা শিখি লিই...তারপর।

রাসবিহারী চড়বড়ে হয়ে গেছে। পট্ পট্ জবাব দেয়। হাঁ করে দেখে জোয়ান ছেলেটাকে কালীতারা।

—মামা মামীকে বলি?

মাথা নাড়িয়ে সায় দেয় কালীতারা।

ভাড়া করা ডিঙিটা নোঙর ফেলে দোল খাচ্ছে। বার গাঙের জলে এতটুকু কুটি মাটি নেই। সকালের আকাশ অথৈ দর্পণে একটু একটু করে সেজে নিচ্ছে নীল শাদা মেঘের রঙ মেখে।

সামনে রাসবিহারী, পিছনে কালীতারা। কালীতারার মা কানের কাছে মন্ত্র দেয়, ভয় কি লো মেয়েমানুষ। চার বচ্ছরেও যখন পেটে সাপ ব্যাঙ জন্মালনি, তুই তো ছাড়া হাত পা। শুধু দাঁ বুঝে—

কালীতারা হুট করে দাঁড়িয়ে পড়ে। অমন কু-কথা! সৎ-মা হলেও তো বাপের বউ—! বাপ্টা তো নিজের—

সৎ-মার বুকটা ধড়ফড়ায়। হাতটা ধরে বোঝায়, কটা ছানা পোনা লিয়ে তোর বাপটা তো হাঁকুড় পাকুড়। তবু নিজেরটা তো পারবি—

কথাটায় বুক ফালা ফালা হয়ে যায়। কালীতারা উত্তর খুঁজে পায় না। আবার হাঁটতে শুরু করে। বাঁ হাতে জং ধরা সুটকেশ। বাড়তি দু-এক খানা শাড়ি শায়া ব্লাউজ।

বোটঘাটার কাছে এলে বাপ ভবতারণ বলে, কালী যা। দিলদিয়া বন্দরে নতুন কাজের ফাঁক-ফন্দি হলেই খপর দিবি। আমরাও যাবো—

দ্বীপের আরও দু-চারজন ছুটতে ছুটতে আসে।

ঢেউয়ে ডিঙি নাচ। নোঙর তুলে মাঝি লগি মারে। লোকগুলো বোটঘাটায়

জল কিনারে নেমে হাঁটু ডুবিয়ে হাঁক মারে, ও বেহারি কাজের খপর আছে? রাসবিহারী বিস্ময়ে পিছন ফিরে মানুষগুলোকে চিনতে চেষ্টা করে। জলের টানে ডিঙি দূরত্ব বাড়ায়। চেঁচিয়ে বললো—পরে খপর করবো।

পোর্ট ট্রাস্টের পুলিস

সামনে পুলিসের গাড়িটা, পিছনে রিকুইজিসান করা লরি। গলিতে ঢুকতে না-পেরে পাকা রাস্তায় গাড়ি দুটো দাঁড়িয়ে। খাকি পোশাকে লাঠি হাতে রাইফেল কাঁধে ন'জন হেভিসোলের কাপড়ের জুতো। কাঁকর রাবিশে ভারি পায়ের ছাপ।
পাঁচ ছ'জন ডেলি ওয়া'ক'র লেবার। দু-জন লাঠি দিয়ে গোঁত্তা মারে ঝুপড়িটার খুঁটিতে। বাকি তিন চার জন কাটারি শাবলে চাড় দেয় বাঁখারি বাটাম, কাঠ কুটোয়। ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দ হয়। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে হাউমাউ কাঁদছে বউটা, একটু সময় দাও পুলুস বাবুরা। জিনিসপত্‌তর গুছাই—
মড়মড় করে থুবড়ে পড়ে ঝোপড়ি চালা। আঁকুড় পাঁকুল চেঁচায়.—হেই বাপ সকলরা পুরুষ মানুষটা কাজে গেছে তেলের জেটিতে—ফিরলেই আমরা সব ভেঙে লুবো—লেবারটার হাতের শাবল থেমে গেছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল বউটার দিকে। হাবিলদার হাঁক মারে, এই বুরবাক চটিরাম। জলদি কাম সারো বাবা, লরিমে লোড্‌ করো—
পলিথিনের ছাউনি শিট ছিঁড়ে খাবলা খাবলা। হাওয়ায় ওড়ে ফর ফর। তখন কারবোন কোম্পানির শেডের মাথা ডিঙিয়ে ধাতব চিমনির মুখ উগরে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গলগল করে। কারখানার মাথায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী নাক সেঁটে ধরা বিশ্রি গন্ধ।
দুপুরের ফাঁকা রাস্তাঘাট পেরিয়ে প্যাসেঞ্জারি বাসটা চিলড্রেন পার্কে'র স্থির জিরাতের মাথায় রুটি ঠোঁটে কাকটাকে উড়িয়ে তাড়িয়ে চলে যায় বিদ্যাসাগর মোড়।
চটিরাম বাঁশ খুঁটির বাণ্ডিল বেঁধে আর একজন লেবারকে ডাকে, এই ধর।
কোলের বাচ্চা ফেলে রেখে মড়া কান্নায় আছড়ে পড়ে বউটা, হে-ই বাবুরা। ও গুলান লিচ্ছিস....ঘর বাঁধবো কিসে?
পুষ্পার মা বাসন-কোসন গোছায় বস্তার মধ্যে। পুষ্পা কানের কাছে রেডিওটা ধরে ঠাওর করে, ঠিক আছে তো....
তিরঞ্জীবপুরে টানা গাঁথনির কাজ ফেলে ছুটে এসেছে মিস্ত্রি। ফিরতি বাসে

যা সময় লাগে। একটুও দেরি করেনি। ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একবার চারদিকটা দেখে নেয়।

পুষ্পার মা চেঁচায়, মিস্ত্রিদা গো—

লেবার দু-জন শাবল নিয়ে মটকার বাঁশে এক ঘা দেয়। গোটা ঝুপড়িটা নেচে ওঠে। মিস্ত্রি জোরে হাঁক দেয়—খবরদার। আমিও পোর্ট ট্রাস্টের মিস্ত্রি। তা নাহলে ড্যামারেজ চাইবো—

হাবিলদার ছুটে আসে। সিমেণ্টের বস্তার মতো কোমর থেকে ভুঁড়ি ঝুলে পড়েছে। কাঁচা পাকা গোঁফ দু-আঙুলে একবার চুমরে নেয়, আরে বাবা দিল্লাগী রাখো। কাম করতে দাও—

মিস্ত্রি কিছু না-বলে দড়ির গিরো খুলতে থাকে। পলিথিনের তেরপলিনটা বাঁচাতে চায়। বিড়বিড় করে, শালা....আকাশের তলে থাকতে গেলে আগে আকাশকে সামলাতে হয় যে...

ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাসবিহারী অবাক! পুলিস... লোকজন... ভাঙাচোরা....!
—মিস্ত্রিদা....

রাসবিহারী আসছিস? লে হাত লাগা—, তাকিয়ে দেখে, মিস্ত্রি। রাসবিহারীর আড়াল কাটিয়ে কালো পাড়ের কাচানো সাদা কাপড়। ফুলকাটা ব্লাউজ ফরসা ফরসা মুখে রোদ পড়লেও মুখময় শেষ বেলার আঁধার। গিরো খুলতে গিয়ে গিট দিয়ে ফেলে।

একজন পুলিস বেতের মোটা লাঠিতে ঠোকা দেয়, এই ভাইয়া বহুত লেট হোতা। আরে বাবা সাহাবকে ডিমোলিশ রিপোর্ট দিতে হোবে—

লোকগুলো শাবল চালায়।

মিস্ত্রি পলিথিন শিট্‌টা টেনে পাশে রাখে।

রাসবিহারীর সঙ্গে কালীতারা হাত লাগায়। বাসন বিছানা সরায় রাসবিহারী। নতুন তৈরী উনুনটা বুকে ধরে বয়ে আনে কালী।

বাঁশ বাঁখারি টেনে টেনে নিয়ে যায় পুলিশের লোকেরা। লরি ভরতি করবে। পিছন পিছন যায় ন'জন পুলিস। পাড়ের কিনারায় ঝুপড়িগুলোর ছায়া মুহূর্তে মুছে যায়।

মিস্ত্রি বললো, রাসবিহারী জিনিসপত্তর আগলা। ভ্যান্-ট্যান্ ধরে আনি—মিস্ত্রির পিঠে গেঞ্জিতে গঙ্গবাড়িটা তখনও ভাঁজ করে ঝোলানো। গলির বাঁকে হারিয়ে যায় মিস্ত্রি। কজকমে ঘেমে ওঠে কালীতারা, রাসবিহারী।

অবাক রাসবিহারী! তলিয়ে যায় যে কোথায়....এই তো সেদিন আর একটু

বাঁধাবাঁধি করে আমার শোওয়ার জায়গাটা বাড়ালুম... !
জংধরা পুরোনো সুটকেশটা ডিঙিয়ে রাসবিহারীর কাছে এসে দাঁড়ায় কালীতারা গভীর গলায় বলে ..এ...তুই কোথায় আনলি...
রাসবিহারী আর ততো চড়বড়ে নেই। কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

সিকিউরিটি অফিস

ঝকঝকে পিচের রাস্তাটা গাঙের বাঁধানো পাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। প্লাস্টিক পেন্টে বাড়িগুলোর গা তেল চুকচুকে। জল পড়লেই হড়কে যায় নিচে। বাহারি রঙে চোখ জুড়িয়ে আরাম। ছাদে ছাদে এ্যান্টেনা, সাতখানা এনামেল রঙে বেলাশেষের রোদ চিক্কর দেয়। বড় বড় গেট, সেগুন কাঠের পাল্লায় শাদা শাদা অক্ষরে গৃহস্বামীর নাম। হাওয়ায় দোল খায় পান্হপাদপের চওড়া চওড়া পাতা। বাড়িটার মাথায় গোল লাইফ বেল্টে সাজিয়ে লেখা "পোর্ট সাভে' ইউনিট নম্বর ওয়ান"।
বাঁধানো পাড়ে বিড়ি টানতে টানতে মিস্ত্রি ছুঁড়ে দিলে দু-খানা রাসবিহারীর কোলে। কালীতারা রাসবিহারীর গা ঘেঁষে চারদিকটা চঙমঙিয়ে দেখতে দেখতে মিস্ত্রিকে একটানা দেখে, অনেকক্ষণ।
ভালই হ'ল বল, রাসবিহারী। গাঙ ধারে গরমে তবু হাওয়া পাবো—। সকাল বিকেল যাই হোক ফাঁকের কাজ সারতে আর অত লাজ লজ্জা নেই—।
—দু-খানা যে ?
—কালীকে দে না একটা
বিপর্যয়ে তারা অনেক কাছাকাছি। সুখে টান দেয় তিনটে বিড়ি, তিনজনে। লাইনে পাশের ঝুপড়ির মাঝবয়সী লোক. খালি গা, গামছাটা কাছা দিয়ে পরা, ওদের কাছে দাঁড়িয়ে শুখনো হাসি হাসলো। পরে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কোথিনুকে খেদালে ?
মানুষটাকে দেখে সময় নিয়ে বললো মিস্ত্রি, সীতাচক্
—যাক্। এক বছর ফেরত আর ভয় নাই। মাসখানেক আগে এউখানে পুলিস ভাঙি দিছে।
আর একটা বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দেয় মিস্ত্রি, মুরুব্বি ধরোগো—
খুশি হয়ে হলদে ছোপ দাঁতে হাসে। বসে পড়ে মাটিতে। গায়ের কাছে মেয়ে ছেলে, খেয়াল হতে গামছা সামলে সুমলে নেয়।
কালীতারা কথার মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, তাহলে অগন বছরভর

নিশ্চিন্ত …।

দু-একবার টানলে মিস্ত্রি জিজ্ঞেস করে,—মুরুব্বি আর কিছু— ?

—ও মেয়েছেলে …, জানতে চায় মুরুব্বি।

—আমাদের। মিস্ত্রির গলার স্বরে দখলি সাব্যস্তের ঝাঁঝ।

আচমকা সূঁচ বিঁধিয়ে ফোঁড়া ফাটানোর মতো সুখ শিহরণ কালীতারার সারা দেহে। আগলাবার মতো মানুষ তবু পেল !

কালীতারা গাঙ পাড়ে অনেকটা হাঁটে। রেলিং ঘিরে বাচ্চাদের পার্ক। দোলনা। গাঙের জল, জলে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে হাওয়া। চোখে পড়ে শুধু ঝাউগাছ। গায়ে গায়ে জড়িয়ে ঘন পাতা। মাঝে মাঝে লোহা লক্কড়ের বরফি কাটা হিজিবিজি মই, মইয়ের ডগায় প্রকাণ্ড বঁড়শি, বেয়ে বেয়ে কেউ যেন উপরে উঠবে। চোখ ফিরে আসে ঝাউবনে। আরাম পায় কালীতারা। চারপাশে একটু ঝাপসা হতেই ফুটফাট আলো জ্বলে। জ্বলে যায় নিজের পাশেও। সিমেন্টের পোস্টের দু-ডানায় আলো। রাত এখানে ঝুপ করে নামে না। বরং আলোর ওপারে গাঙের মাঝে ঝুলতে থাকে আঁধার।

—বিহারী

—উঁ

—ডাক ওকে। হাতে হাতে রাতটার মতো ছাউনি বাঁধি।

—বাঁশ খুঁটি বড্ড কম যে, রাসবিহারী ঠিক করতে পারে না কেমনভাবে ঝুলোনো যায়।

—আজ রাতটা কাটাই। কাল ব্যবস্থা হবে—

মুরুব্বি আসে। মিস্ত্রি মনে মনে রেগে যায় শালা আবার বিড়ির লোভে— মিস্ত্রির কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে, বাবু শুনো—

—কী

—চলুনা আমার সঙ্গে গাঙের পাতায়। তোমার উপকার হবে—

কী আবার নতুন বিপদ আপদ হাজির হয় …মিস্ত্রি ঠিক বুঝতে পারে না। বুকের মধ্যে আতংক…সংশয়ে প্রথম ধাক্কায় চোখ চলে যায় কালীতারার মুখের দিকে। জামাটা গলাতে গলাতে বললে, বিহারী ঘুরে আসি—

বাঁধানো পাড়ে লাইন ধরে পাঁচ ছ'বছর বয়সী নারকেল গাছ। লম্বা লম্বা ডাগলায় চেরা ছায়া।

গাঙের চড়ায় নেমে মিস্ত্রি অবাক ! এক তাড়া ডালপালা ছাঁটাই লম্বা লম্বা ঝাউগাছ।

মুরুব্বি বললে, ধরে আনছি।

ওপাশের ব্যাপারি নড়েচড়ে কাছে আসে। বলে, দেখেছেন, বাঁশের মতন লম্বা, কত পোক্ত জিনিস

মিস্ত্রি ধাতে আসে না। ব্যাপারিকে শুধু দেখে।

—দেরি করার সময় নাই। ক' খানা লিবেন, তিন খানা? পাঁচ খানা—

মুরুব্বি পরামর্শ দেয়, চার পাঁচ খানা কিনে ঘরটা খাড়া করান গো বাবু। মোক্ষম কাজ হবে—

পরামর্শটা মন্দ নয়।—দাম কত?

ব্যাপারি কানের কাছে এসে বলে, গাছ পিছু দশ টাকা দিন। অমন সাইজের বাঁশ তো বিশ পঁচিশের কম নয়?

ব্যাপারির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কারখানার তেল কালি ধোঁয়া শুষবার জন্যে ঝাউ বাগান। চোরাই মাল। তার আবার অতো দাম! মিস্ত্রির চুপচাপে তেমন গন্ধ টের পায় না ব্যাপারি। হঠাৎ বলে, লিবেন? নাকি মাল তুলে নতুন রাস্তায় চলে যাবো। সেখানে আট দশ ঘর খুঁটি গাড়তিছে—

—ধুর বাবু পুলিস টুলিসের ঝামেলা আছে

ব্যাপারি চুপসে যায়। পরক্ষণে খুব চাপা গলায় বলে, ওসব থোড়াই কেয়ার। সব ঠিক হ্যায়—

মিস্ত্রি ভাবে পুলিসে জখম করার কাজ নয়। পট করে বলে, চার পিস্। পাঁচ টাকা করে হলে—কথা কেড়ে নিয়ে হুমড়ি খায় ব্যাপারি,—তাই দিন। বড্ড কাজ—

আপশোসে গম্ভীর মিস্ত্রি। খুব তাড়াহুড়ো করে ফেললুম। তিন টাকা বললে হতো....

রাসবিহারী একটা ব্যাপার বুঝলে, সীতাচকের থেকে এখানে ভোর হয় আগে আগে। সূর্যটার প্রথম শরীর অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায়। এক ঘড়ি রাত থাকতেই বাহারি বাড়িগুলোয় মানুষের গলার শব্দ, দাঁত মুখ ধুতে ধুতে ভারি কাশির আওয়াজ।

দোর গোড়ায় গাড়ি থেমে থেমে বাবু লোকদের তুলে নিয়ে গেল কারখানার দিকে। জানলা থেকে ছুটে আসছে গান বাজনা। বাসি চুলে সুন্দরী সুন্দরী মুখ। সকালে গাঙের হাওয়ায় এলেমেলো আঁচল। টসটসে আঙুল তুলে রাসবিহারীদের ঝুপড়ি দেখিয়ে বলে, সে কিরে! ওরা আবার এদিকটায় নোংরা করতে এলো—

রাসবিহারী আর ওদের দিকে তাকায় না। মনে হ'ল, ওরা সুন্দরী নেই। তখন কালীতারার সামনে এসে দাঁড়ায়। মিঠে রোদে আস্তেলা বাসি চুলে কালীতারার ফরসা মুখটা এক ঝলক দেখলে। রাতের এ'টো বাসন মাজা থামিয়ে বলে, কি রে? আমাকে দিয়ে তোদের চলবে—

তখন রাসবিহারী শুনতে পায় দুড়ুম্ ধাড়াম্ শব্দ। মোটা দেওয়ালে হাতুড়ির ঘা। চা ভরতি গেলাসটা দু-হাতে ধরে মিস্ত্রি হন্তদন্ত পা ফেলছে। কাছে এসে বলে, আর দেরি নয। একদম ঘরের কাছে কাজ।

উবু থুবু বসে চা খায় তিনজনে।

কালীতারা শুষি মারে জোরে জোরে। এমন সকালে হাপুস হুপুস এক পেট পানতা খাওযা অভ্যেস। চাযে বার কয়েক চুমুক দিয়ে মিস্ত্রি বলল, লে। তাড়াতাড়ি জয়েন দিতে হবে। দুড়ুম্ ধাড়াম্ হাতুড়ি মারার শব্দটা চিরে দিচ্ছে এদিক।

—কোথায়? জানতে চায় রাসবিহারী।

—যেখানটায় হাতুড়ি পিটাচ্ছে। সিকিউরিটির পুরানো অফিস ভেঙে নতুন হচ্ছে। চল দেখতে পাবি

বেরিয়ে পড়ে দু-জন। সাইড ব্যাগে কাঁধে মিস্ত্রি, পিছনে রাসবিহারী। মিস্ত্রি আবার বললে, কালী, টিনে ঝাড়ায় যা মিলে রান্না করো। দুপুরে খাবো। দু-জনই ফিরে ফিরে চায়। তাদের ঘরে ফিরে দেখার লোক আছে। দুপুরে দু-জন খেতে পাবে।

জয়েন্ট পিটিশন

লুম্ফার আলোয় হাতের আঙুল চেটো দেখে এক মনে। জল সিমেণ্টে থরথরে হয়ে চামড়া সাদা। আঙুলের ডগায় কর্নি' বাইসের দাগ।

কালী পিছন ফিরে রান্না করছে।

মিস্ত্রি বলল, কালী দেখি সরষের তেলের শিশিটা—

ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হবে?

—আঙুলের গালাসিতে লাগাবো

কড়া নামিয়ে তেলের শিশিটা নিয়ে এসে কালী বলে, দ্যাখি হাতটা। ইস্ ঘা ধরিছে...শিশির তেল ঢেলে নিজেই যত্ন করে লাগিয়ে দেয় কালীতারা। মিস্ত্রির হাতের ঘায়ে টান নেই, টান বুকের মধ্যে। রক্তে ব্যথা। ভীষণ কামড়। ইচ্ছে করেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় রাসবিহারী উল্টোদিকে। চটপাতা বিছানায়

খস্‌মস্‌ শব্দ। কালীতারা মেয়েমানুষের চোখে নজর করে।
এক সঙ্গে পাঁচ ছ'জন ছোকরার হাঁক ডাক—কই কে কে আছো ঝুপড়িতে?
বুকের মধ্যে চিংড়ি ছটকায়। হাত কেঁপে যায় মিস্ত্রির।
—আরে বাহারে আসো
মিস্ত্রি বেরিয়ে আসে। পিছনে কালীতারা।
—কী ব্যাপার গো বাবুরা?
—নাও দরখাস্তে সই করো
—দরখাস্ত! কিসের··
একজন ছোকরা এগিয়ে আসে,—তোমরা কোথায় ছিলে আগে?
—সীতাচক্‌
মিস্ত্রির কাছে কেমন ঝাপসা। —একটু খুলে বলো না বাবুরা
ছোকরাটা বলতে থাকে, তোমরা সীতাচকের, কাল সাধনবাবুর বাজারের ঝুপড়ি ভাঙলো পুলিস, ক দিন আগে রেল ইস্টেশনের গুলো লোপাট করেছে—
মিস্ত্রির মন পায় ছেলেগুলো। রাসবিহারী বেরিয়ে আসে।
—তোমরা তো দিলদিয়া বন্দরে কাজের জন্যে এসেছ, নাকি?
—তাই তো, সায় দেয় মিস্ত্রি।
—সেই লেবারদের এত হয়রানি কেন? কাজ পড়লে ডেকে খুঁজে কাজ করানো আবার তাদের ঝুপড়ি ভাঙছো। তাই পোর্ট ট্রাস্টের বড় একেবারে বড় সাহেবের কাছে দরখাস্ত, সাহেব তুমি জায়গা ঠিক করে দাও নয়তো ঝুপড়ি ভেঙে ক্ষতি করতে পারবে না।
—বাহ্‌। কাজের কাজ। মিস্ত্রির অন্তর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসে। টিপ ছাপ নিয়ে বড় দরখাস্তটা পাকিয়ে বগলে রাখে ছেলেটা। ছোকরা চেহারা বড় বড় চুল। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি। একেবারে তর্জনী উঁচিয়ে বললো, কিন্তু মনে রেখো—, থমকে দাঁড়ায় মিস্ত্রি। —এরপর দরকার হলে আরও কঠিন কাজে ঝাঁপাতে হবে—
—ঝাঁপ দিতে আর বাকি আছে বাবুরা?
—পাশের ছেলেটা বোঝাতে চেষ্টা করে, দু-চার টাকা চাঁদা পত্‌তরও লাগতে পারে। লড়াই কি শুধু কাগজ কলমে?
মিস্ত্রি সবিনয়ে সম্মতি জানায়। —আমাদের দ্যাখবেন আমরাও দ্যাখবোনি—, বলতে বলতে মিস্ত্রি লম্ফোর আগুনে বিড়ি ধরায়। হাতের আঙুল মেলে মেলে দেখে, নখের ডগায় বালি, জমানো সিমেণ্ট।

ওয়েল জেটির ওদিকটায় শুধু আলোর ঝলকানি। লাইন ধরে জোরালো আলোর বান যেন অজস্র চাঁদের জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। বড় কালো ধাতব চিমনিটার মগ ডগা মেঘ ছুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিমনির মুখে ছলাক্ ছলাক্ আগুন। কালীতারা ক'দিন দেখেছে কিন্তু স্বস্তি পায়নি। সন্তুষ্ট করতে পারেনি নিজেকে। খপ্ করে রাসবিহারীর হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলো—ওই যে আগুনের ডেলা

—বরাবর পুড়ে?

—হুঁ। কারখানাওলারা পুড়ায়।

—ভয় করে···

—কিসেব

—যদি উড়ে আসে ঝুপড়ি পুড়ায

—ধুস্। ওটা পুড়ে তাই বক্ষে। তা নাহলে বাবখানা ফেটে যেত—

চাপা প্রক্রিয়ায় বুকের ভিতরটা ফেটে যায় কালীতারার। ঘাড়ে হাত দিয়ে রাসবিহারীর মাথাটা কাছে আনে, কানের কাছে খুব ধীরে অপরাধ কম্পিত গলায় বলে...এই...তুই রাগ করিস...

মিস্ত্রি হাঁক দেয়, কইবে আয় সব। খা দা — রাত যে বাড়ে।

লম্বা দো-চালা ঝুপড়ি অন্দরের মাঝখানে টাঙানো দড়িতে আজও মেয়েলি কাপড়টার পরদা পড়ল। এপারে রাসবিহারী, ওপারে মিস্ত্রি কালীতারা।

কাপড়ের ওপার থেকে মিস্ত্রি ডাকে, বিহারী ঘুমালি?

রাসবিহারী সাড়া দেয না। উশপাশেব শব্দ ধরে ফেলে মিস্ত্রি।

—জানলি তো কনটাকটার বাবু বলে দিছে, কাল থিকে তোর আমার, নতুন সতের তালায় কাজ। মিস্ত্রির গলায় খুশির ঘড় ঘড় আওয়াজ। —টানা আট ন'মাস চলবে রে।

রাসবিহারী শোনে তেমন চমক পায় না।

আট ন' মাসের নিরাপত্তায় মিস্ত্রি যেন রড খোয়া সিমেণ্ট নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কালীতারা দু-বাহুতে মিস্ত্রিকে জড়িয়ে ধরেও আচমকা দ্বীপ ভাঙার ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ শোনে। তখন আরও শক্ত করে আঁকড়ায়। কাঁচের চুড়ি রুপোর বালার ঠুন্‌ঠান্ তরঙ্গ রাসবিহারীর কানে। রাসবিহারী উপুড় হয়। তার মনে হল, তেল কোম্পানীর চিমনীর গায়ে তারা তিনজন শুয়ে। জ্বলছে কালীতারারা, পুড়ছে রাসবিহারী। ছট্‌পট্ করে বিছানায়। একসময় ভাবে, ফেরিঘাটার দিকে একটা নতুন ঝুপড়ি করলে নিজের মতো··· কত খরচ····

পোর্ট ট্রাস্টের বড় বিল্ডিং

নদীর পাড় বাধাই করে বিল্ডিং। ঘন ঘন বাঁশ জুড়ে চৌ-খুপি। কত যে দড়ি আর বাঁশের কান্ড! রাসবিহারী ঘাড় বাঁকিয়ে একবার গুনেছিল, এক··· দুই যোগফল দাঁড়ায় আঠার। দুস্ শুনি তো সতের তালা····।

আবার গুনেছিল জানালার ফাঁক দেখে দেখে ষোলয় গিয়ে গুলিয়ে ফেলে। বালি সিমেণ্টের পলেস্তরার কাজ। রাসবিহারীও যোগাড়েদের সঙ্গে বড়া বোঝাই বালি সিমেণ্টের তাগাড় বয়ে দেয়. পাটা কর্ণিতে ইটের দাঁত দড়া বুজিয়ে মিস্ত্রিরা ঝকঝকে করে তোলে। মিস্ত্রি যোগাড়েদের কথাবার্তা চেঁচামেচিতে যেন দু-খানা গ্রামের হাট বসেছে। উঁচুতে বাঁশের গায়ে তক্তা বিছিয়ে মাচান। মাচানে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রিরা। এত দূর থেকে সব মানুষ সমান। অস্পষ্ট আর খাটো। খুব কষ্ট করে তফাৎ করে কালীতারা মিস্ত্রিকে। মাচানের বাঁশে সাইড ব্যাগটা এইটুকু হয়ে ঝুলছে।

কদিন তো দুপুরে খেতে আসেনি ওরা। অত উঁচু থেকে নামাও কষ্ট····। দিনের আলো থাকতে থাকতে কাজ তুলতে হয়। তাই একটাইমে সেরে সন্ধ্যে মুখে ঘরে ফেরে।

এক সঙ্গে মেয়ে পুরুষের কচকচালি। পাশে তাকিয়ে অবাক। এক ডিঙি ঠাসা মানুষ।

মাঝি চেঁচায়, ওই—ওই তো বড় বিল্ডিং।

এক বউ বিস্ময়ে বলে, আকাশ ছেঁদা করে উঠ্ছে কোঠাবাড়ীটা··

পাশের লোকটা চাপান দেয়, ধুর বাবু। রাবণের সিঁড়ি

কালীতারা তড়বড় করে নেমে দেখতে যায়। গাঙের পাতায় ডিঙি বাঁধে। পুরুষরা আগাম নেমে মেয়েদের হাত ধরে ডাঙায় দাঁড় করায়। বাচ্চা বুকে টকটকে লাল শাড়ি বউটার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কালী জিজ্ঞেস করে—তোমরা কোথায় যাবে গো?

—দিলদিয়ায় কাজের খপর করছে দেশের ঠিকাদার।

—কোথ্থিকে আসতিছ····

—সাগরদ্বীপ বেগুয়াখালি

বুকের ভিতর টন্‌টন্ করে। হাঁপিয়ে বলে, লোহাচড়ার লোকজন...! কষ্ট হয় বাপটার জন্যে! বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে, যদি খপর করা যেত...। কত কাজ এইখানে...

বিশাল বড় জাহাজটা বারকয়েক সিটি দেয়। চারদিক কেঁপে ওঠে। খুব আস্তে আস্তে জল কেটে কেটে এগিয়ে আসে জাহাজটা। রঙচঙে মাস্তুল, মাস্তুলের

ডগায় মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য তার। রেলিং ধরে খালাসিরা দিলদিয়ার অফিস ইমারত মাটি দেখছে। গাঙের পাখিগুলো আকাশে ভাসতে ভাসতে পথ দেখিয়ে যেন ডেকে আনছে। আর একটু গেলেই তো অয়েল জেটি। লক গেট, ট্যাংকার। তেল খালাস কর।

ষোল তলার মেঝেয় তৈরী বালি সিমেণ্টের তাগাড় মাথায় বয়ে এনে রাসবিহারী অবাক গলায় বলে, মিস্ত্রিদা কত বড় জাহাজ গো—

—কত বড়…, বলেই পিছু ফিরে দেখতে যায় মিস্ত্রি। খেয়াল হল মাচানের বাইরে পা চলে গেছে। বাঁ-হাত বাড়িয়েও কিছু ধরতে পারে না। একেবারে শূন্যে থেকে মাটির টান। টুকরো ইঁটের মতো সাঁই সাঁই মানুষটার পতন। রাসবিহারী দিশেহারা হয়ে গোঙায়…এ…ই…ই…ই…

ঝুপড়ি পর্ব

খবরটা পাওয়ার পর কালীতারার মনে হয়েছে দ্বীপটা গাঙের জলে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন। আর কিছু নেই। ডাহা নোনা গাঙের জল বুক ভেঙে কালীতারার দু-চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে, সামনে রাসবিহারী থাকলে সে জল জমে বরফ চাই। বুকের মধ্যে ভীষণ ঠোকাঠুকি। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে আপশোস, সব শেষ করল…মিস্ত্রিটা…রাসবিহারীর কাছে মুখ রাখার কিছু নেই…

ঝুপড়ির ভিতরে ঝাপসা। এ ধারে বসে রাসবিহারী ওধারে হাঁটুতে গাল ঠেকিয়ে চুপচাপ কালীতারা। ভীষণ রটে গেছে, বিল্ডিংটা বড্ড অপয়া অমঙ্গুলে। গোড়া পত্তনে একটা মানুষ খেয়েছিল…আবার আর একটা এই খেল…। পাঁচ ছ' দিন কেউ আর কাজে যায়নি। যেতেও চায়নি বিল্ডিংয়ে। কালীতারার মধ্যে একটা সান্ত্বনা বাসা বাঁধে! মানুষটার তরে এতগুলো মানুষ…

—এই তো। কে কে আছো তোমরা?

রাসবিহারীর পিছনে কালীতারা, বেরিয়ে আসে দু-জন। মুখ দেখে চিনতে পারে সেই দরখাস্ত সই করানো ছেলেগুলো। সঙ্গে ভিন ঝুপ'ড়র বিশ পঁচিশ জন। ফরসা ছেলেটাই মুখ খুললো। একদম নয়। কেউ কাজে যাবে না। ঝুঁকির কাজে জীবনের দায় কোম্পানি নয় কনট্রাকটারকে নিতেই হবে—

ছেলেটার ধারালো কথায় যেন অন্য আলো ফুটছে। সবাই সবাইয়ের মুখ দেখতে পায়। —তাই বলছিলুম আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। কেউ যাবে না। যত ঠিকেদার কনট্রাকটার লোভ দেখাক—আমরা লিখিত চাই—

কালীতারা রাসবিহারীর হাতটা শক্ত করে ধরে দাঁড়ায়। আঁচলের কাপড় মুখে

গলায় গোঙানি আটকায়। দু-চোখ ভিজে ছলছল করে।
খোয়া বিছানো দরজার আকাশে আলো। আলো এদিকটায়। শুধু ঝুপড়ির ভিতরে আদিম গুহা। রাত ফুরোবার আগেই কে যে অগ্রিম নিঃসাড়ে জেগে উঠে বসে আছে! ভিতরের পর্দা কাপড়টা এ' কদিন একই রকম গোটানো। শ্বাস প্রশ্বাসে দু-জন দু জনকে বুঝে ফেলে। ভোরের শিফটের বাবুদের নিয়ে গাড়ি ছুটে চলে যায়। কালীতারা চাপা গলায় প্রায় নিজেকে শোনানোর মত স্বরে বলে, রাসবিহারী এমনটি ক'দিন চলবে—
—কী
—ঘর যে ফাঁকা
—কী করবো বল
—তুই তো পুরুষ ছেলে সঙ্গে আমিও আছি—
সবে ভোর ফুটতে শুরু করেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বেরিয়ে পড়েছে শিফট ডিউটির মানুষগুলোর সঙ্গে। হেভি রোলারটা সারা রাত হিমে গা ভিজিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। বেলা বাড়লে খোয়া পিষবে। এবড়ো খেবড়ো পথ। পায়ের পাতায় খোয়ার ছুঁচ ফুটে যায়। কালীতারা বলে—তবু কোথায় রে....
রাসবিহারী বাড়িটার দিকে তাকায়, আমিও কি জানি ছাই—, বলে চোখটা চলে যায় সতের তলার দিকে। নির্জন পরিত্যক্ত। মিস্ত্রির সাইড ব্যাগটা বাঁশের গায়ে মুণ্ডু ঝুলিয়ে বাতাসে দুলছে। চমকে ওঠে রাসবিহারী। ছুটে পালায় ঢালু বেয়ে ঝাউবনের দিকে।
ধারালো খোয়ার কোনায় আঙুল ছিঁড়ে যায়। কালীতারা অসহায় আর্তিতে শেষ চিৎকার দেয়, ফেলায়ে পালাচ্ছিস বিহারী...
হাঁপিয়ে দম নেয় রাসবিহারী। রঙ চটা চেরা গেঞ্জির ভিতর বুকটা বার করেক ওঠে নামে।
কালীতারা ধরে দাঁড়ায়, দৌড়ালি যে....
—ভয়! আঙুল দেখায়, ওই যে মিস্ত্রির ঝোলাটা অখনও—,
রাসবিহারীর হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে কালীতারা দাবড়ি মারে, থাম তো। ঘুরে ফিরে সেই মিস্ত্রি।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আই ঢাই রাসবিহারীর ভেতরটা। কালীতারার ফরসা মুখে কালো ছায়া ভোরের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে। বলে—চল্ না নতুন কোথাও কাজ খুঁজি। কাজ, বিড়বিড় করে রাসবিহারী। এমন জায়গায় তো যেতে হবে যেখানে দরখাস্ত সই করানো ছেলেগুলোর কড়া কথায় ঢেউ পৌঁছায়নি।

ভাবতে ভাবতে দু-জনে অনেক পথ হাঁটে। অয়েল কোম্পানির বাউণ্ডারি পেরিয়ে সার কারখানার বড় গেটের কাছে থমকে দাঁড়ায়।

চারদিকে পাতা ঝলসানো রোদ। বিকেল হতে এখনও অনেক দেরি। রাসবিহারীর কপালে ফোটা ফোটা ঘাম। চেরা গেঞ্জির ভিতর দর দর করে ঘাম নামে চওড়া বুকে। হাতের চেটোয় কপালের ঘাম মুছে একটু বসে রাসবিহারী। পাশে রুপোর বালায় নিবিষ্ট কালীতারা।

কালীতারাকে দেখতে দেখতে রাসবিহারী বললে, কালী দি চল্

—কোথায়···, মুখ তুলে তাকায় কালীতারা।

—দেশে। তোকে ফেরত রেখে আসি

—তারপর...! বিস্ময়ে রুপোর বালায় হাতের আঙুল আটকে যায়।

—গরমেণ্টের কাছে তো তোদের দরখাস্ত মারা আছে। শ্রীমতীনগরে বিঘা পরিমাণ জমি বাস্তু ভিটারও জায়গা পাবি

—পেলে...

—সেখানে খুঁটি গাড়বি ঘর বাঁধবি

—না।

—তবে এউখানে মাটি কামড়ে বাঁচবি, কথার ঝাঁঝে রাগ আর দায়িত্ব ঝরে ঝরে পড়ে। কালীতারা চুপচাপ রাসবিহারীকে দেখে। আঁচল হাতে নিয়ে নিজের মুখ মুছে হঠাৎ চোখে পড়ে রাসবিহারীর চওড়া বুকটা শক্ত নয়, ঘামে ভিজে নরম কাদা। ঝুঁকে পড়ে আঁচলে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, দেশে তো এক জমিনে বাপে ঝিয়ে কামড়া কামড়ি।

—তাহলে...

চড়া রোদ। শুখনো হাওয়া। খুব যত্নে মোছা বিহারীর বুকটায় নরম করে চাপ দেয়, ...এইখানে...এই টুকুতে...খুঁটি গাড়তে দিবি... ?

ঝুগনি পাথর

অনিল ঘড়াই

তপকা (তামাক) ধোঁয়ার কুণ্ডুলী পাকান মেঘ হাড়িসাই এর মাথায়। সকাল থেকে একটুও রোদের দেখা নেই। চারপাশ থম মেরে গেলে ব্যাঙ মোতার মত চিরিক চিরিক এক ফোঁটা দু' ফোঁটা বৃষ্টি। পচা ভাদরে রোয়ার কাজ সব শেষ। এখন ধানচারাদার গোড়ায় বুড়কুড়ি কাটে ফুঁসি কাঁকড়া আর কালিয়া কাঁকড়ার ছা। ক' দিন থেকে কোথাও বেরুবার জো নেই। বেরুলেই তেড়ে ফুঁড়ে বর্ষা আসে। পথ ঘাট সব পেছল। কাদা-মাটি চ্যাটচেটে।

কাঙ্গাল গাড়িয়া (পুকুর) ঘাটে পা ধুয়ে চালাটার দিকে চেয়েছিল। ছাল ছাড়ান কুকড়ার দশা হয়েছে ঘরটার। বাঁশ কাঠ গজাল সব কেমন দাঁত বের করান। পচা খড়গুলো ভেজা বনকুয়ার (বন কাক) পালক। জল মানে না, রোদ মানে না।

কতদিন ভেবেছে কাঙ্গাল ঘরটা ছাইয়ে নেবে। পারেনি।

ঠকরী, তার বউ রেগেমেগে বলেছে মুই আর বাঁধি পারিনি গঅ। খরাকালে খরা, টুকে বর্ষা ঝরলে ছরছর বর্ষা—মুই কোথায় দাঁড়াই কও তো?

একযুগ আগেও বাপ বেঁচে ছিল তখন, বিঘে তিনেক জমির মালিক ছিল তারা। ঘরে দু' দুটা লাঙ্গল, হালিয়া বলদ। খোলের কারবার রমরমা। গ্রাহক এসে বসে থাকে দোরগোড়ায়। সে সময়টা ছাই মুঠালে সোনা করার সময়। নিজের হাতে পাছিয়া পাছিয়া (ঝুড়ি ঝুড়ি) মাটি কেটে ঘর তুলেছে বাপ-বেটায়। দেওয়ালের পর দেওয়াল। ছঁচ, গোবর মাটি, খড়কুচা সব কিছুতেই গতর নিংড়ান ঘাম। বাপ মারা গেল বড়বানে। সাপের কামড়ে। মা তো তার অনেক আগেই গিয়েছে। সেই সময় ঠকরী আসল বৌ হয়ে। ভাবল দুঃখ ঘুচবে। ঠকরীটার গতর ভারী হল, সন্তান হ'ল না! মনের দুঃখ মনে রইল। খড়খড়ে ঘাসগুলোর চেয়েও শুকনো হয়ে গেল সংসার!

বাপ যখন চোখের পাতা বুজল—তখন জমিজমার সাথে আর যা যা রেখে গেল তার মধ্যে সবচেয়ে দামী হলো মুগনি পাথর। সফেদ, বট আঠার চেয়েও ঝকমকে সাদা - নিটোল—চৌকোনা সেরখানিক ওজনের একটা পাথর — সর্বদা চকচক করে নক্ষত্র সমান। সেই পাথরে নিজের মুখটা দেখতে পেত কাঙ্গাল। ঠিক যেন সার্সি!

বিয়ের রাতেই ঠকরীকে অনুগ্রহভরে পাথরটা দেখিয়েছিল সে। কড়িঘরের ভেতর লাল কাপড়ে যত্নে জড়ান থাকত পাথরটা। বাপ বলেছিল, দেখে-শুনে রাখবি, এ হিলা মায়াবী পাথর। কুনদুসময় হড়কি যাবে টের পাবুনি।

ড্যামা ড্যামা চোখ তুলে ঠকরীর বিস্ময়ের আর ঘোর কাটে না। চোখের দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল দুধ-সাদা পাথরে। স্ফূর্তিতে টগবগ বরবেশী কাঙ্গাল বলেছিল, অমন হা ক'রকি কি দেখোটো। এর কীর্তি শুনলে মাথা খারাপ হি যাবে। —বলেই অতীত পুকুরে ডুব দিয়েছিল সে।

ভাল লেঠেল ছিল তার বাপ। তল্লাট জুড়ে নাম। তখন হাঁড়িসাই-এর বসবাস এখানে ছিল না, এখানে ছিল কেয়া-পান'স্ বন। দিনমানে ঝাড়া (বাহ্যি) ফিরতে ভয় পেত মানুষে। পকা'সমা গাছ আর হাড়মটমটির ঝোপ তার সাথে পাল্লা দিয়ে মাঠবাবলা আর লালকচার ঝাকড়া ঝাকড়া মাথা। কাশ গাছ আর মণলা বন। সার সার। একেবারে ধার বরাবর কাঁটা বাঁশের ঝাড়, খানা-ডোবা আর বয়িরকুল গাছের গোমরাভারী মুখ। সাঝ হবার আগে শেয়াল ডাকত, বনবেড়াল চাষীপাড়া থেকে কুকড়া ধরে এনে ঝপাঝপ লুকিয়ে যেত আড়ালে। কোকর (কুকুর) গুলো হা-পিত্তেশ চোখে তাকিয়ে থাকত শ' গজ দূর থেকে। বনে ঢুকতে তাদেরও ভয়।

সেই বন কেটে বসত বানাল জাতিভাইরা হাড়িপাড়া কথনোই চাষীপাড়া বামুনপাড়ার পাশাপাশি থাকবে না—ওরা তো যমজ ভাই নয়—ওরা অচ্ছুত, ছোট লোক, হাড় হিংলা মানুষ। জমিদার চৌধুরীবাবুর নির্দেশে লেঠেলরা ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়ে গেল পুরনো হাঁড়সাই। ওখানে জমিদারবাবুর বাগান বাড়ি তৈরী হবে। পুষ্করিণী খনন হবে। পুকুরের দু' ধারে লাগান হবে নামী-দামী ফুলের চারা। রাস্তার ধারে এমন সন বাঁধান জায়গা আর কোথায়! বাস্তুছাড়া হল বাপ। বোচকা-বুচকি, কাচ্চা বাচ্চা, হাঁস-মুরগী, গোরু-ছাগল সব নিয়ে উঠে আসতে হল এক ঘনঘোর অমাবস্যায় এই বন-বাদাড়ে।

আসার সময় প্রতিবাদে রুখে উঠেছিল বাপ। ছড়ান বুকের পেশী ফুলিয়ে সিংহ-বিক্রমে বলেছিল, কাজটা ভাল্লা হিলানি জমিদারবাবু। এ ভিটা মোর মেনকার।

আপনার বাপো দানপত্র লিখি দিচে দু' যুগ আগে। সে কাগজ এখনও মোর কাড়িঘরে গুঁজা।

—হারামজাদা, মুখে মুখে তর্ক করিস, তোর এতদূর আস্পর্ধা? চোখ উপড়ে নেবো—

চোখ উপড়ে নেওয়ার সুযোগ পায়নি জমিদারবাবু। তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাপ। প্রায় কাবু করে ফেলেছিল জমিদারকে, সেই সময় লেঠেলরা পেছন থেকে ডাং মারল মাথায়। মায়ার সাথে সাথেই তুলসীমঞ্চের পাশে গড়িয়ে পড়ল অবশ গতর। কাঁকরগুঁড়ি, ন্যাংটা মাটি রক্তকষে ছয়লাপ হলো।

বিলাসী জমিদার সেই বাস্তুভিটায় পুকুর খনন করল। ছ' মাস ধরে চলল পুকুর কাটার কাজ। একদিন খরাবেলায় মাটি কাটার সময় হুস করে বেরিয়ে এল এক পাথর। জমিদার দেখল, সবাই দেখল, সাদা ধবধবিয়া একটা পাথর। মহা উল্লাসে পাথরটাকে ঘর নিয়ে গেল জমিদার। কর্তামাকে দেখাবে—।
কিন্তু সবার কপালে সব সয় না। পরের দিন সকালে বাপকে পাথরটা ফেরৎ দিয়ে গেল চৌধুরী জমিদার। বলল, নে রাখ। এটা তোর পাথর। এ পাথর আমার কোন কাজে আসবে না।
—মোর পাথর। কথা শুনে বাপের গলার ভড়কে যাবার সুর।
জমিদার বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তোর পাথর। কালরাতে স্বপ্নে দেবী আমাকে বলল, আমাকে তুই রেখে আয়। নাহলে তোর সর্বনাশ হবে—। আমি মংগলা হাড়িব ঘরের মুগনি পাথর। আমাকে তুই রেখে আয়।
—এ পাথবের কি গুণ বাবু?
—তা জানিনে।
—তাহিলে এ নিগুর্ণা পাথর লিইকি কি করবা বাবু। বরং মোকে দশটা টাকা দেন খেয়ে বাঁচি—।
সে রাতে আর একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল বাপ। ঘরের কোণ থেকে ছিটকে এল অদ্ভুত আলোর ধারা। সেই আলোর মধ্যে থেকে ভেসে উঠল আশ্চর্য এক দেবী মূর্তি। মোহনী গলায় সেই দেবী মূর্তি বলল, ভয় পাসনে, আমি তোর সাথে আছি। আমাকে ঘরে রাখ, তোর মঙ্গল হবে। ন্যায়ের পথে চলবি, সত্যকথা বলবি, পরের উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়বি—তাহলে দেখবি আমি তোর সাথে আছি। পাপ করলে আমাকে আর পাবিনে।
রাতভোর আর ঘুমোতে পারেনি বাপ। জলে ভরে উঠেছিল তার দু' চোখ। টিনের বাক্সটার উপর অযত্নে রাখা পাথরটা তুলে নিয়েছিল কোলে। মুহূর্তে

রোমাঞ্চিত হয়েছিল তার শরীর। বুঝতে পেরেছিল এটা যে সে পাথর নয়। এটা এমন পাথর যার স্পর্শে বিনাশ হয় পাপ। পাপী পায় দণ্ড। অনাথ পায় নাথের দর্শন।

চাঁচারি আর আউড় (খড়) চুঁইয়ে টপটপিয়ে জল ঝরছিল। গতরাতে বৃষ্টিটা জব্বর হয়েছে। [illegible] (ভিটেয়) [illegible] (শ্যাওলা) পড়ে জমে রয়েছে সেই জল। ঘাড় গুটিয়ে থাকা ডাহুকের মত চালাঘরটাকে নিষ্প্রাণ মনে হল কাঙ্গালের। পায়ের কাদো (কাদা) মুছে ঘাড় দাবিয়ে ভেতরে ঢুকে এল সে।

আগে থেকেই [illegible] তানভাত বেড়ে রেখেছিল ঠকরী। দাঁত মেজে এসে কাঙ্গাল প্রতিদিন তানভাত খায় সকালে। বাড়িত (বাড়িতে) বাসি শিলমাছের টক। পুরানা তেঁতুল দিয়ে বেঁধেছে।

পিঁড়িটা পেতে দিয়ে ঠকরী বলল, খাও। খাড়িই রইলি কেনে? মাছি বসবে—।

—ঘরটা ছাইতে হিবে বউ। নাহিলে ভাঙ্গি যাবে। কোনদিন চাপা পড়বা মোর মেনে--।

—আগে খাও তো। তারপর যা হয় হিবে—।

পিঁড়িতে পা মুড়ে বসে জামবাটিটা নিজের কাছে টেনে নিল কাঙ্গাল। কিছুক্ষণ আগে ছড় (ন্যাতা) দিয়েছে বউটা। গোবর মাটির গন্ধ আসছিল।

—আর কিছু নাই?

খেতে খেতে হাত থামায় কাঙ্গাল, গাটে (ফেটা) ঝাল হিবে—।

—ঝাল তো নেই!

—পেঁয়জ?

খুঁজে পেতে একটা পচা পেঁয়াজ বাড়িয়ে দিল ঠকরী। তোলায় পাওয়া আনাজ বেশীর ভাগই দয়া দাক্ষিণ্যের দান। কানা, পোকা, শুটকো, খেগরো।

—আজকাল হাট ঝাঁটইকি লাভ নেই। কেউ আর আগের মতুন তোলা দেয়নি—। পেয়াজের অর্দ্ধেকটা কামড়ে পাতের গোড়ায় থুঃ করে ফেলে দিল কাঙ্গাল, হা, অতড় গটে হাট। পুরাটা ফেরে ঝাটিইতে গেলে মাজা কনকন করে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ঠকরী। ঘরের ভেতর এই দিনের বেলাতেও ঘুলঘুলি আঁধার। চোখটা রগড়ে নিয়ে বলল, কমিটবাবুকে কওনা, টাকাটা যেন বাড়িই দেয়।

—২৫ টাকাই সময় মত দেয়নি! টাকা বাড়িই তো কইলে কাজই ছাড়িই দিবে—

—দেয় দিক।

—তাহিলে খাবু কি? বাবু কয়, ভাত ছিটিইলে কুওয়ার (কাক) অভাব! না পুশিইলে ছাড়ি দে। রামধন কাজটার লাগি ফ্যা ফ্যা করি ঘুরেটে।
এবার আর কথা বলার ক্ষমতা থাকে না ঠকরীর। ঘাড় নীচু করে তামুভাত গিলচে কাঙ্গাল। ওর রোগা পেটটা জলোঘাস খাওয়া গরুর মত ফুলে উঠছে ধীরে ধীরে।
—আর টুকে টক দিই?
—তোর আছে তো?
—আছে গও আছে। তুমি খাওনা পেট পুরিইকি—।
নোলার বশে খেতে গিয়ে বিপদ বাধায় কাঙ্গাল। শিলমাছের মাথায় পাথর থাকে। সেই মাথা বেখেয়ালে চিবোতে গিয়ে কড়াং করে শব্দ হল। যন্ত্রণায় গঙ্গিয়ে উঠল সে। দোক্তা-পান খাওয়া ক্ষয় দাঁতটা ছিটকে পড়ল ভেতরে। আলগা মাড়ি উপচে দিল রক্ত। চাক চাক কাঁচা রক্ত। রি রি করল মাড়ির চারপাশ, জ্বালা জ্বালা করে উঠল ভেতরটা। মুখ চেপে বাইরে বেরয়ে এল সে। এসেই ওয়াক থু করে ফেনা সমেত ছেপ ফেলে দিল খলা বাহিরে।

রক্তের ভেতর থেকে মিছিরিদানার মত স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা সাদা পাথর। তার পাশে হেলিয়ে পড়ে আছে হলদেটে দাঁত।
পেছনে কখন ঠকরী এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি কাঙ্গাল। দেখে-শুনে মিয়ান স্বরে বলল, হ্যাঁগা, শিলমাছে পাথর থাকে জানোনি বুঝি?
—তু চুপ যা।
কথাটা শেষ করে দম ধরে থাকল কাঙ্গাল। বরাত মন্দ হলে এমনই হয়। নাহলে ঘুসুর (শুয়োর) পেটে দিচ্ছে কোনদিন কিছু হয়নি, আজ হঠাৎ শিলমাছে শুলোনী! তার যা বয়স এই বয়সে গাঁ ঘরে অনেকেরই সন্তান হয়। অথচ, তার কপালটা ফোঁপরা! বিয়ের কুঁড়ি বছর পরেও ঠকরীর কোল শুন্য। দিনকে দিন জালি না আসা কুমড়ো গাছের মত মুটিয়ে যাচ্ছে বউটা। ডাক্তার জবাব দিয়েছে, ঠকরীর আর কাচ্চা-বাচ্চা হবে না।

সকালবেলায় ভাঙ্গা দাঁত আর শিলমাছের পাথর দেখতে দেখতে চোখে জল চলে আসে কাঙ্গালের। তার এখন কোন সম্বল নেই। বাপ মারা যাবার দু'বছরের মধ্যে জমিগুলো গেল। হালের বলদ মরল ডুবা ঘাস খেয়ে। মা গেল ক্ষয়রোগে। আজ এই ঝিমান ন্যুব্জ শরীর নিয়ে সে বেঁচে আছে বংশে বাতি দিতে।

ক্রমশঃ ঝাপসা হয় আসছিল তার সাদাটে দুই চোখ। সে বুঝতে পারল,

শরীরের যাবতীয় শিরা-উপশিরা আজ যেন ঝিমিয়ে বইছে। রক্তের গতি আছে, কিন্তু তা যেন আগের মত নয়। বজবজানি দুঃখে জিভ আর টাগরা শুকিয়ে একসার। পুরো শরীর নিংড়ে ফের একবার ছেপ ফেলল কাঙ্গাল। মুখের লালাগুলোর লালচে ভাব এখনও যায়নি। অভ্যাসবশতঃ লিক্‌লিকে জিভ ছুঁয়ে আসছে ফাঁকা মাড়ির অংশ।

ঠকরী বলল, উঠো, বসিকি কি হবে? ডাক্তার দুয়ারকে যাও।

—মোর কাছে পয়সা-কড়ি কিছু নেই। শুধু হাত পা লিইকি গেলে তো অষুধ দিবেনি ডাক্তার।

—টুকে দেখি শুনি খাইলে তো এমন বিপদ হিতানি?

ঠকরী প্রশ্নে দম ধরে থাকল কাঙ্গাল। উত্তর করল না। বাসি টক ভিজে ভাত দিয়ে মেখে খেতে তার বড় ভাল লাগে। মা বেঁচে থাকতে কত খেয়েছে। তখন দিনকাল এত খারাপ ছিল না! মুরালা মাছ, রুটি মাছ, তেলাতাপড়ি মাছ আর লহরা মাছেব টক চালতা কিংবা পুরনো তেঁতুল দিয়ে কতবার যে খেয়েছে! ভাবতে গেলে জল চলে আসে জিভে।

মুগনি পাথর লোকের দুয়ারে নিয়ে গেলে তার খাতির যত্ন খারাপ হোত না। যেন জামাই আদর। গ্রামে চুরি-চামারী হলে ডাক পড়ত কাঙ্গালের। লোক এসে তোয়াজ করে, খাতির যত্নে তপকা-(তামাক) বিড়িতে আপ্যায়ণ করে নিয়ে যেত তাকে। বিচাব বসত দোষীকে সাজা দেবার জন্য। দশ গাঁয়ের মুরুব্বি আসত। শুয়োর মারা হোত। লাল শালু মোড়ান পাথরটা জনসমক্ষে বের করে তার উপর ঢেলে দেওয়া হোত তিন ভাঁড় পাঁচুয়া। চেটে পুটে খেত নেশায় কাতব মানুষ। তারপর চলত সারাদিন ধরে বিচার। রাত হলে কার্বাইড গ্যাস লাইট জ্বলত, হ্যাজাক জ্বলত। সেই আলোয় সমবেত মানুষ জন দেখত সাদা মেঘেব চেয়েও সাদা একটা পাথরের ভেল্‌কি। একে একে এগিয়ে আসত সন্দেহজনক মানুষ। মা শীতলার নাম স্মরণ করে ভয় ধুকধুক বুকে পাথরে রাখত হাত। নির্দোষ হলে কিছু নেই, দোষী হলেই আটকে যেত হাত। যাঁতিকলের ইঁদুরের মত ছটফট করত বেচারা।

বাপের মুখেই গল্প শুনেছিল এমনই এক ছটফটানী দোষী ইঁদুরের, শেষে দোষ কবুল করতে বেচারার নিস্তার। সেদিনটা ছিল হাঁড়িসাই-এর সবচাইতে আনন্দের দিন। মুগনি পাথর ভয়ের ঠেলায় ফেরৎ দিয়ে গেছে জমিদার চৌধুরী। পাঁকে পুঁতে গিয়েছে তার কালো ঘোড়ার পা। সাতজন লেঠেল এসে কোনমতে তুলল সেই ঘোড়া। দেখল ঘোড়া পা হড়কে ঠ্যাং ভেঙ্গেছে।

হতাশ লারাণ বলল, এ কেমুন পাথর গো খুড়া, এ যে নিগুণ মাকাল ফল। কেবল রূপে বলহারী, কাজে ফোপরা! এযে দেখছি, ঝাল-নুন বাটতেও লাগবেনি!
—তুই চুপ যা লারাণ, দুটো পরস্পর মুখ দেখিকি কাকে কি কউটু? পাপে যে মরি যাবু—। চোখ দিকি রক্ত বেরিইবে—।
—আরে ছাড় তো তুমার কথা। পাথরকে আবার ভয় কি?
—ভয় নেই! হ্যাঁরে, তোর বুকে ছাতি অত্তো বড়! আর, আগিই আয়। মায়ের দুধ খাইলে লাথ মারিকি চলি যা এ পাথরকে।
—শালগ্রাম শিলা দেখচো, খুড়া? কুচকুচিয়া কালা কিন্তু গুণে শীতলা।
—দেখচিরে বাপো, সব দেখচি। বয়স তো মোর কম হিলানি। তিন কুড়ি দশ। দেখি দেখি মোর চুল পাকি গেলা।
—চকমকি পাথর দেখছ?
—তাও দেখচি। হা, লক্ষণপুরের সাউ দুয়ারে। ঝামা-ইঁটার মতুন দেখতে। ঠোকাঠুকি করলেই আগুনের ফুলকি। সেই আগুনে বিড়ি ধরিয়ে খেয়েচি।
চুমকি পাথরের কথা পাড়ল বৈদ্যনাথ। বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলল, সাপে কাটলে ভয় ডরের কিছু নেই। চুমকি পাথর বসিই দাও ক্ষতে। হড়হড়িয়ে বিষ টানবে। আর কষ্টিপাথর? তার কথা তো সবাই জানে। সোনা চিনতে কষ্টিপাথরের জোড়া পাওয়া ভার—!
লারাণ যেন অল্প জলের চুনামাছ। ছড়বড়ানী তার বেশী। এমনিতে সে সিঁদেল চোর। সিঁদ কাটতে গিয়ে প্রায়ই ধরা পড়ে মার খায়। মুগনি পাথরটা তুলে নিয়ে তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বলল, এটার কি দাম? কি হবে শুধুমুধু রেখে!
—তাহলি পেঁকই দে।
পাথরটা নিয়ে সভার মাঝে ছুঁড়ে ফেলতে চায় লারাণ কিন্তু পারে না। তার হাতের সাথে লোহা চুম্বুকের মত আটকে গেছে পাথর। নড়ে না, চড়ে না। বেগতিক দেখে চেঁচিয়ে ওঠে সে, পাড়া কেঁপে ওঠে তার আর্তনাদে। কালপেঁচা উড়ে যায় এক গাছ থেকে আরেক গাছে।
লারাণ বলে, মোরে বাঁচাও খুড়া। পাথর যে আর ছাড়েনি—!
—আগুন খাইচু এবার অঙ্গার হাগ। দাড়িতে হাত বুলিয়ে শান্ত তাকায় মুরুব্বি। তালপাখা জলের ঘটি হাতে ভিড় করে দাঁড়াল কাঁদুনী বউ-ঝিউড়িরা। লারাণের বউ কপাল চাপড়ে মুরুব্বির পায়ের তলায় পড়ল, ও খুড়া, খুড়া গো। এযে আক্কুসী পাথর। মোর মানুষটারে বাঁচাও গস্ন।
—লারাণ তো বটে চোর। তারে বাঁচিই কি কী লাভ?

—তুমার দ্'টা গোড়ত ধরি। কচি বউটা হাউহাউ করে কাঁদল। কাঁখের ছেলেটা ধূলোয় গড়াগড়ি খেল অনাদরে।

শেষে দেমন্ন করল করতেই পাথর খসল গতর থেকে। যেন বাসি ফুল ঝরে পড়ল মাটিতে। উপস্থিত সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল ভয়ে ও ভক্তিতে। মাঝখান থেকে কদর বেড়ে গেল মংগলার। সে বিড়িতে টান দিয়ে হুংকার দিয়ে বলল, এবার থিকে বাপো মেনে সাবধান হও তুমরা। চুরি-চামারি ছাড়। সৎ হও। খাটি-খুটিকি খাও। নাহিলে এ মংগনি পাথর কাউকে ছাড়িক কথা কইবেনি।

সেদিন থেকে আদর যত্ন বেড়ে গেল পাথরের। পাথর যেন মংগলার ঘরের সন্তান। সেই সন্তান এখন ঘরছাড়া। টিলির সাথে ধানক্ষেত থেকে ফিরে আসার পরই পাথরটা কাড়ঘর থেকে উধাও। পাগলের মত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ম গ ন পাথরের হদিস পায়নি কাঙ্গাল।

টিলি বলেছিল, দেখবা গো, ও পাথর একদিন হারাবেই। ও থাকবেনি। ও অলক্ষুণে পাথর তুমার সব খাবে—।

—থাক্, তুর কি? তুর এত গা জ্বলে কেনে রে?
—পাথর আমার সন্তান?
—ছ্যাঁ ছ্যাঁ, মুখে তুর বুড়া হালিয়ার (বলদ) নাদ পড়ু। জানু, পাথরটা মোর ছুয়া (ছেলে)। ওকে ছাড়া মুই রই পারিনি—

—কুঁজার আবার চিৎ হবার সখ। বাঁজা গাছে ফুল আসেনি গো, তুমি কি এটা জানোনি?

মোর গাছে ফুল আসবে, ফল আসবে। সবুর কর। সময় হিলে দেখবু।

লাউডগার মত শরীর হিলিয়ে হিসহিসিয়ে হেসে উঠেছে টিলি, গুন্ডি দোক্তা দেওয়া প্যানটা কুলদাঁতে চেপে বলেছে, গাছরো কাঠাল মুরো তেল। হা, ঠকরীদি যা মুটিইকে ওর আর সন্তান হিবেনি। কুনদিন দেখব শ্বাসনালী চৰ্বিতে বন্ধ হিইকি একেবারে ডাঙ্গা পড়িয়ার-ঘাটে!

কথাটা খারাপ লাগলেও মনে মনে মেনে নেয় কাঙ্গাল। সদরের বড় ডাক্তার বলেছে, বউটা বাঁজা। রাত জেগেও কোন লাভ নেই।

মনটা বসে গিয়েছে সেই কথায়। চল্লিশ পেরলো এখনও ভোঁ-কাটা সংসার। কেউ আর গলা জড়িয়ে 'বাপ' বলে ডাকল না। বংশে বাতি দেওয়ারও কেউ নেই। এ কি কম পরিতাপের কথা।

ঠকরী প্রায় বলে, তুমি আর গটে বিয়ে কর। মুই তার দাসী হইকি রইবা। কথাটা অন্তর থেকে বলে না ঠকরী, বললে কাঙ্গাল আর একবার ফুঁস করে জ্বলে

উঠত। এই বয়সেও বাবা হওয়ার ক্ষুধাটা তাকে ঠায় বসিয়ে রাখে রাতভোর। তখন ঢিলির কথা মনে পড়ে।

ঢিলিটা বনটিয়ে। খাঁচায় পুরলে কেবল ছটপটানী। শিকল কেটে পালিয়ে যাবার ধান্দা।

হাটখোলায় তোলা তুলতে গিয়ে ঢিলির সঙ্গে আলাপ। ছাচুন (ঝাঁটা) বেচতে হাটে এসেছিল সে। খেজুর পাতার ছাচুন। টাকায় দু'টা।

কাঙ্গাল গিয়ে বলল, তোলা দাও। হাট ঝেঁটুনোর তোলা।

হা করে তাকিয়ে ছিল ঢিলি। অস্পষ্ট গলায় বলেছিল, গটে টাকা মোটে বিচবি। এর থিকে কি দিবা তুমায়? মোর দুয়ারে দুটা পেট, গটে টাকায় কি হয়?

—যা হয় দাও। —কথা শেষ করে ঘুলঘুলি চোখে কাঙ্গাল গিলছিল ঢিলিকে। এত দিন, এত বছর ধরে হাট ঝাটাচ্ছে ঢিলির মতন আর একটা মেয়ে সে যেন আর দেখেনি! কাঙ্গালের ছুঁক ছুঁকানী হাঁড়ি খাওয়া কুকুর চোখে ঢিলির আস্ত শরীর। ভেতরটা তার গুড়গুড় করছিল ভয়ে।

চাষীঘরের কাঁচা বিধবা অভাবের তাড়নায় ঝাঁটা নিয়ে এসেছে বাজারে। যেন নিজেকেই সে বেচতে এসেছে এখানে। তার দীঘল টানা চোখে অবিশ্বাসের ছায়া। হাটে-বাজাবে খারাপ লোকের অভাব নেই। তাছাড়া, তার শরীরটাও আশ্বিন মাসের নদী-নালার মত ভরাট। হাসলে, কথা বললে টোবা লেবুর মত ফুলে ওঠে দু' গাল। গজ দাঁতটা বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ। টানা ভুরুর নীচে দীঘল দু' চোখে যেন কত দিনের অতৃপ্তি।

মা তার খুনখুনে বুড়ি, মোটে চোখে দেখে না, শ্রবণশক্তি পাতলা। জমি-জমা কিছু নেই। যা ছিল জ্ঞাতি-গুষ্টি মেরে খেল সব। মা-বিটিতে দু'জনে মিলে রইবে কোথায়? মাথা গোঁজার একটা জায়গা ছিল, তাও মা মরার পরে সেটাও হাত ছাড়া হল। কুকুরগুলো একা ঘরে তাকে কেবল খাবলাতে আসে, খাবলে-খুবলে একসার। শেষে যা ছিল সব গুছিয়ে-গাছিয়ে চলে এল হাটখোলায়। বড় ইস্কুলের পিছনে তালপাতা দিয়ে কুঁড়েঘর বানিয়ে দিয়েছে কাঙ্গাল। দিনভর খেজুর পাতা কাটে, চেরে, শুকায়। শেষটায় ছাচুন বেঁধে হাটবারে হাটবারে বসে যায় মাছহাটের পাশে।

এই হাটখোলায় তাকে ঘিরে বাজার এখন গমগম। চ্যাংড়া, ছুঁক ছুঁকানী মরদগুলো পয়সা ছুঁড়ে দেয় তার দিকে। ঢিলি সে পয়সা নেয় না. থু করে ফেলে দেয়। বানে ভাসা এঁটো পাতা সে নয়, সে হলো বাঁধা পুকুরের স্যাপলা

ফুল। ঢেউ দিলেও আপন জায়গায় ধীর স্থির।

একদম প্রথম দিন থেকেই মেয়েটার উপর কাঙ্গালের চাপা একটা টান। বড় আপন মনে হয় ওকে। এই অল্প বয়সে কপাল পুড়ল মেয়েটার, যার জন্য মাঝেমাঝেই ক'কিয়ে ওঠে তার ভেতর। ছোটবেলা থেকেই এগাঁয়ে সে মানুষ, অথচ একজনও বলল না, আয়রে ঢিলি, তুই আমার দুয়ারে থাক। খাটবি খাবি, আপন বুনের মত থাকবি।

বরং উল্টোটাই ঘটেছে ঢিলির কপালে। তার মা মারা যাওয়ার পরে তার পোকাড়ে কপালটা একেবারেই পুড়ল। এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় তাকে নিয়ে গেল সান্ত্বনা দিয়ে। সেই ঘনঘোর বর্ষারাতে ঘুম ভাঙ্গতেই ঢিলি দেখে মানুষটা উদোম শরীরে তাকে নিয়ে টানা হিঁচড়া শুরু করেছে। বাধা দিতে গিয়ে কোন ফল হ'ল না। ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেল সেবার কেননা সব বীজে তো অংকুর হয় না।

বিকেলের মলিন আলোয় থান ধুতি পরা ঢিলিকে দেখে অবাক হয়েছিল কাঙ্গাল, অথচ বছর তিনেক আগে এই হাটখোলা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রঙ্গিলা শাড়ি পরে সে শ্বশুর ঘর গিয়েছে। কাঙ্গালের হিসেব ভুল হচ্ছিল, কোনমতে মেলাতে পারছিল না হিসেব। করকর করছিল চোখের ভেতর।

—তুমার এদশা কে করলা ?

—মোর কপাল দাদা। মানুষটা পেটে ঘা নিয়ে বড় হাসপাতালে গেলা। আর আইলানি !

—তোমার শ্বশু-শাশু ?

—তার মেনকার কথা কওনি। সব লিইঁকি খেদিই দিলা। মোকে কইলা, সর্বনাশী, রাক্ষুসী। তু মোর ছেলেকে খাইচু। এ দুয়ারে তোর কুনো স্থান নেই।

অঁটা থেকে শালপাতা মোড়ান পানটা বের করে এগিয়ে দিল কাঙ্গাল, বলল, মন খারাপ করবুনি–সবই কপাল। নিয়তি! ভাগ্য বলিকি গটে জিনিস আছে —তাকে তো মানতে হিবে।

—হঅ। তা যা কইচো।

—পানটা খা।

—মোর কুনো লিশা নেই।

—বাঁচবু কি লিইকি তাইলি ?

চমকে তাকাল ঢিলি। সজল চোখ। সুড়ুৎ করে নাক টেনে নিয়ে বলল, পেটে

ভাত-ই জুটেনি ; তার উপরে পান।
—লে, খা না কেনে। আমি তুর দাদার মতুন। দিচ্চি. খা।
কাঙ্গাল জোর করে হাতে গুঁজে দিল পানটা। বলল, ছাচি পানে ঝাল বেশী। চিবিয়ে পিক ফেলি দে। নাহিলে মজা পাবুনি।
পিক ফেলেনি ঢিলি। চারমাস পরে কাঙ্গালের সন্তান গর্ভে নিয়ে ধানক্ষেতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেছে. এ তুমি কি কুরলা গো দাদা, এখুন আমি কুন্‌ঠি যাই।
—যাবু আর কুনঠি. হাটতলায় থাক! মুই তো আচি।
—তুমি আমার ধর্ম লিচো. সব লিচো—অখন মোকে ঘর লিই চলো। হাটতলায় একা রইতে মোর ভয় করে।
—দূর পাগলি, একা রইবু কেনে মুই তো আসবা।
—চোরের মত আসবা—তাই তো? শুইকি, স্ফূর্তি করিকি কাটু পড়বো ভোররাতে—কেউ জানবেনি তাই তো?
—কেনে কইটু এসব কথা! মুই কি চোর?
—চোর হিলে তো ভালা হিতা, তুমি গটে সাপ। শয়তান, ডাকু। মোকে ভুলিই ভুলিই একি করলা তুমি?
কান্নার তোড়ে কাঙ্গালের দু' হাতের বেড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ঢিলি। তার দু' চোখে তখন রাগ। চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না ঘেন্নায়। ধান খেতের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সাপের মুখ থেকে ছাড়া পাওয়া মাদী ব্যাঙের মত হাঁপাচ্ছিল।
—এ ঢিলি যাবুনি। তোর রান (দিব্যি)—মা শীতলার রান। এ ঢিলি! রোদের মধ্যে কেঁপে যাচ্ছিল কাঙ্গালের ভয়ার্ত গলা। ফাঁকা মাঠে ছড়িয়ে পড়ছিল তার আকুতি। থমকে দাঁড়িয়ে ঢিলি বলল. মোর এ জীবন রাখার কুনো দাম নেই। মুই গলায় ফাঁস লিবা।
—মোর রান, এ ঢিলি, এ পাপ তুই করবুনি। যে আসেটে আসতে দে। তার তো কুনো দোষ নেই। তোর দুটা গোড়তল ধরি।
কুলাংগারকে বাঁচিই রাখি কি লাভ? বাপ কুলাংগার হিলে ছেলেও কুলাংগার হয়। কাঁটা গাছের বীজে কখনো চন্দন গাছ হয়নি। মুই মরবা। তাকেও মারবা।
—অতো বড় গটে জীবন—একা রইবু কি করি?
কাঙ্গাল এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ঢিলির। ট্যাক গজান দেহলতাকে টেনে নেয় বুকে। শান্ত প্রকৃতিতে উথলানো দুধের মত দুটো হৃদয় আদিম খেলায় মেতে

ওঠে আবার।

সরু যে পথটা এঁকে বেঁকে হাঁড়িসাই-এ ঢুকেছে তার দু'পাশে হাড় মটমটি আর তেকাঁঠি গাছের ঝোপ। এ বোশেখেই নতুন মাটি পড়েছে। হাঁটতে গেলে চ্যাট চ্যাট করে কাদা. পা আটকে যায় এঁটেল মাটিতে। খুব সাবধানে হিসাব করে পা ফেলছে কাঙগাল।

সকাল বেলায় ঠকরী তাকে হাটখোলায় আসতে দেয়নি। মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, যদি যাওতো মোর মাথা খাও। বরষা বাদলের দিনে তুমি ঘরে থাক বাপু। মোর ডান চোখটা নাচেটে।

কাঙগাল তাকে বোঝ দিয়ে বলেছে, আজ মোকে যাইতেই হিবে। আজ যে মিটিং।

—মিটিং ?

—হুঅ। লারাণটা মোর পাথর লিচে। শালা চোর! আজ ওর সাজা হিবে। পঞ্চাতবাবুরা কইচে আজ একটা হেস্তা-নেস্তা হিবে।

—হাঁ গঅ, মুগনি পাথর ঘুরোন পাবা ?

— পাবা তো—

—সত্যি, মোর গা ছুঁইকি কও তো!

মিথ্যে মিথ্যি গা ছুঁয়েছে কাঙগাল। মুগনি পাথর কোথায়, কার ঘরে একথা হলফ করে কেউ জানে না।

পাকা রাস্তায় উঠে আসতেই শেষ হয়ে এল বিকেল। মরা বিকেলের ঝিমানো আলোয় শকুন উড়ছিলো আকাশে। উপর আকাশে তখন চাক বেঁধে আছে আঁধার। লারাণের বড় ছেলে পরাণ এর সাথে দেখা হল মুখোমুখি। বাপের মুখ রেখেছে ছেলেটা। বাপের বদ্ বিদ্যা সব কটাই তার আয়ত্বে।

কাঙগালকে দেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফুঁসে উঠল সে, খুড়া, শুনো তোমার সাথে কথা আছে ?

— কি কথা ?

—তুমি নাকি কইচো মুই মুগনি পাথর চুরিইচি।

দম ধরে থাকে কাঙগাল। বলে. কে লিচে মুই কারও নাম স্পষ্ট করি কইনি। মুই দেখিনি কাউকে তাই নাম কই কি করি ?

—কাজটা কিন্তু ভালা করোনি। মোর মাথা গরম কখন কি করি দিবা তখন মোকে দোষ দিবোনি ?

—কি করবু তুই? চোরের মার বড় গলা। থাম—

—থামবা কেনে, তুমার ভয়ে ?

—তোর বাপো গটে চোর থিলা। তুইও চোর। তোর মুখে ভালা কথা মানায়নি।

—তোর বাপো তো চিটিংবাজ, লোক ঠকাই কি খাইচে। গটে সাদা পাথর লিইকি ব্যবসা শুরু করথিলা শেষে তো মরলা সাপের কামড়ে। হুঃ, বলেকি, মুগনি পাথর

—দেখছ পাথর! যত সব বুজরুকি! ভাবছ মোর মেনে কিছু জানিনি।

—কি জানু তোরা ?

—ওসব পাথর-মাথর কিছু না। স্রেফ পয়সা কামিইবার ধান্দা।

—চুপ কর। নাহিলে গটে চটকান (চড়) মারি দিবা। যত বড় ছুয়া (ছেলে) নয় তত বড় কথা!

ঘনায়মান অন্ধকারে খুড়ো-ভাইপো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুজনেরই চোখ লাল। গরম নিঃশ্বাস।

তখনই শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। বাজ পড়ল মাঝের আকাশে। দুড়দাড় করে ভিজে গেল দু'জনেই। দু'জনেই দু'জনকে দেখে নেবে বলে দু'দিকে ছুটল।

হাটখোলা অব্দি আসতেই কাঙ্গাল একেবারে কাক ভেজা। থরথর করে কাঁপছে। এই দুর্যোগে ঢিলির কাছে গেলে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলা যায়।

মেয়েটার পেট নেমেছে ভাদ্র মাসের পেল্লাই কাখুরের (কুমড়ো) মত। ঢেপ পেটটা নিয়ে সে কোথাও বেরুতে পারে না।

হাটখোলায় বেরুলে লোকে দেখে তাকে হাসে, বলে, রাঢ় মায়াঝির মরণ দেখ। কার কাছে শুয়ে পেট বাধাল কে জানে!

শত জেরার মুখেও ঢিলি কাঙ্গালের নামটা বলেনি। বুকে হাওয়া লাগিয়ে কাঙ্গাল স্বপ্নের মত ঘোরে। মাঝে মাঝে দু' পাঁচ টাকা যা পায় সংসার খরচের জন্য ঢিলির হাতে তুলে দেয়।

কুঁড়ে ঘরটার কাছে যেতেই আকাশ নামল জোরে। ভেজান কবাট সরিয়ে ভেতরে ঢুকে এল কাঙ্গাল। এসেই থ।

মেঝের উপর কাঁথাকানি চেপে প্রসব বেদনায় কাতরে যাচ্ছে ঢিলি। তার চোখময় জল। সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঠোঁটের উপর দাঁত বসিয়ে সে দু'হাতে চেপে ধরল কাঙ্গালের পা।

—ওগো, তুমি আমারে বাঁচাও। আমি আর বাঁচবোনি গো।

ঘন অন্ধকারে কেউ কারোর মুখ দেখতে পায় না। জলের ছাট আসে। উত্তর দিকে বাজ পড়ে হঠাৎ। তখনই ঢিঙ্গর নাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে রক্তডেলা। বিদ্যুৎ-এর আলোয় কাঙ্গাল দেখল ছেলেটার গায়ের রং বজ্রের মত, গুড়ু গুড়ু ধ্বনি নয় একেবারে বজ্র গলায় হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদে উঠল শিশু। কাঙ্গাল উবু হয়ে উত্তাপ নিল তার প্রথম ফসলের। বাবার হাত থেকে প্রথম যেদিন মুগনি পাথর নেয়—সেই অনাস্বাদিত স্পর্শ অনুভূতি আজ যেন ফিরে এল আবার। শিরায় শিরায় খেলে গেল সেই স্পর্শ অনুভূতি। মুহূর্তে শিহরিত, রোমাঞ্চিত হল কাঙ্গাল। অপলক দৃষ্টিতে, এক অতি প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঙ্গাল দেখল, ঢিলির কোল আলো করা সন্তানটি যেন তারই ঘরের মুগনি পাথর।

খড়ের মানুষ

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

১

উনোনের ধাবে বসে উপ্‌চানো ফ্যানের পোড়া গন্ধ শোঁকে টুনি। ভিতরের আগুনের লাল তেজ ঘিবে ধরে তার মুখকে মাঝে মাঝে। টুনি তার রঙীন ছাপা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছতে থাকে কপালের জমে যাওয়া ঘামের ফোঁটাগুলি। ঘামের সেই সব বৃত্তগুলি ভেঙে দিয়ে কপালময় এক ঠাণ্ডা আলতো প্রবাহ বইয়ে দেয। টুনি হাঁফ ছাড়ে। ব্লাউজেব ওপরটা ফাঁক কবে ভাবি বুকে মুখেব গযম বাতাসে ঠাণ্ডা লাগায সে। বাঁ হাতে কাঁচা আম কাঠ আগুনেব আবো ভিতরে ঢুকিয়ে ধোঁযা কমানোর চেষ্টা কবে, আর আগুন ইচ্ছে কবেই নিভে গিয়ে কষ্ট দেয় টুনিকে। জ্বালা বাড়ায—চোখ দিয়ে জল বেবোয নাকে ঘড় ঘড় শব্দ হয। সে সব কষ্ট টুনির ভিতবেব জীবনেব জ্বালার সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে ওঠে। জট লাগা চুলেব ভিতর উকুনের হাঁটা চলা মেয়েমানুষের কষ্টেব প্যাঁচ কষতে থাকে। সচেষ্ট এবং উপায়হীন টুনি, শরীবের কম বয়েসী বেআক্কেল গাঁটগুলোকে টেনে টুনেও আলগা করতে না পেরে লোহার চোঙা নিয়ে ফুঁ দেয় উনোনে। আগুন নিভে গিয়ে আরো ধোঁয়া বাড়িয়ে গন্ধ ছুটিয়ে এক সময় সত্যিই তাকে অসহায় করে তোলে। জীবনের এসব রহস্যের আট ঘাটে নাস্তানাবুদ হয়ে টুনি ক্রমশ অভিজ্ঞ ও বিষয়ী হয়ে উঠতে থাকে। গায়ের ঘামাচির পোকাগুলি বিস্তর কিলবিলিয়ে উঠলে তার মনে হয়, কেউ ঘামাচি মেরে দিলে সে আরাম খেয়েও সুখ। তারপর দপ্‌ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুন জ্বলতেও যতোক্ষণ, নিভতেও ততোক্ষণ। ওপরে হাত তুলে হাই ভাঙে টুনি, গায়ে মচ মচ্‌ আওয়াজ হয়। বগলের কাছে পুরানো ব্লাউজে ফাট ধরে। শব্দ তুলে আরো একবার ছিঁড়ে যায় টুনির শরীরের আচ্ছাদন।

'ও টুনি আয়না' ঘরের ভিতরের অন্ধকারে চৌকিতে শুয়ে থাকা টুনির বাপ ডাকে।

এক গ্লাস জল খেয়ে বাবার কাছে যায় সে। টুনির বাবার কান বন্ধের সুযোগে বাইরে তৈরী 'খস্-খস্'। বাপের পায়ের ফাটে অভাবের চারটা ফোঁটা তেল পটাপট ঘসে দিয়ে বাইরে আসে টুনি।

: কে—

: আমি রে টুনি

: অ—

: এখন ?

: না

: তবে—

: উনানে ভাতের হাঁড়ি

: কখন ?

: ভাত ফুটতে যতক্ষণ

: ও টুনি—

: উম্

: বেজাই কষ্ট রে—

দরজা বন্ধ করে টুনি। আবার উপ্‌চিয়ে ফ্যান পড়েছে উনোনের গায়ে। যেখানে মাটিটা লাল। ফ্যান গড়ে গিয়েই খানিক বুদবুদ। তারপর শুকিয়ে কালো দাগ। এখন তাও নেই। উনোনের ভিতরের মাটি লাল।

কালেরটাতে চাল কিনেছে। চাল আছে। নুন নেই ফোড়ন নেই লংকা নেই পোস্ত নেই তেল নেই—টুনির কিছুই নেই—এইগুলো আনবে। কাঁচা লংকা আর একটা ছোটো মাছ। দু'জনের মতো—একাদশীর দিনটা !

২

পরের দিন ভাত খেয়ে আরাম পায় টুনির বাবা।

: মাছ কেনরে—

: ও কিছু নয়—তুমি খাও না বাবা

: টাকা কি পাঠাইছে—

: হুঁ—

: কতো—

তপড়ানো গাল আর শুকনো চামড়ার তামাটে মুখটা নিয়ে মেঘের ওপর আলোর ঝলকানি খেলিয়ে একটু কি হেসে ফেললো টুনির বুড়ো বাপটা? সবাব আগে আগাপাস্তালা ভেবে ভেবে শূন্যে হেঁটে যেতে যেতে শরীব ভাসিয়ে বেখে বেখে স্বর্গগামী মানুষেরা যেমনতর হাসে? তবুও মেজাজের তোড়ে আকাঙক্ষার ঘোরে টুনি বলে—পঁচিশ।

: মাত্র—

: সব দিন কাজ জুটেনি।

: লিখছে?

: হুঁ।

ভাতের হাঁড়ির কাছে উঠে যায় টুনি। আরো ভাত আনে। কপালে ঘাম—ডাঁসা ডাঁসা পাকা ঘামাচির মতো ঘামের দানা বসেছে টুনির কপালে। এ গুলান যদি ঘামাচি হোতো!

: আর দুটা ভাত দিই বাবা?

: দিবি - দে।

: তমার হাঁফ কমছে?

: না।

: আজ তো কাশী বাড়ছে, শিউলি পাতা কি দিব?

: না, খালি খালি শিউলি পাতা মৌ ছাড়া বেজায় তিতা।

: তবে তুলসী পাতা।

: না না বিস্তর গন্ধ, ঝাঁঝ।

: তবে কাশো কেনে?

: ও আর কম্‌বেনি মা!

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে টুনির বাপ। মাছটা—ভারি স্বাদ রে টুনি। কাশতে থাকে বুড়ো। বুকের হাঁফ বাড়িয়ে মুখ দিয়ে লালা বেরিযে আসে। মাছের কাঁটা চোষে তখন সে।

টুনির হিক্কা ওঠে। সে জল খায়, থুথু ফেলে।

: অ টুনি?

: কি!

: কাছে আয় না মা।

পেতলের ঘটিতে এক ঘটি জল এনে ঠক্ করে বাবার কাছে বসায় টুনি।

: আর কি লিখছে—?

: বর্ষার আগে আসবে, রথের সময়।

: অ টুনি কাঁঠাল খাব—আচ্ছা মধ্যিখানে একটাবার ত আসতে পারে। কতদিন হল রে অ্যাঁ—!

: তিন মাস।

: তিনটা মাস দেখিনি? আমি বুড়ো লোক—ঘরে জুয়ান বোউ—দিনকাল—কি আক্কেল তর!

: চুপ্ করো তো তুমি—ভাল্‌লাগেনি মোর ওসব।

টুনি ঝিঁকিয়ে ওঠে। কাঁপতে থাকে। গাল কপাল আর নাকের ডগা লাল হয়। ফুলে গিয়ে চুলকোতে থাকে, বোধ হয় সর্দি হয়েছে। ফ্যাঁচ করে হাঁচে টুনি, আঁচল দিয়ে নাক রগড়ায়। আগুনের আঁচ লাগে কি টুনির মুখে? উঠোনের আকাশ দেখে টুনি চোখ ভাসিয়ে। মেঘহীন নির্ঝঞ্ঝাট আকাশ রোদের তাপে দাউ দাউ জ্বলে।

ঘটির জলে কুলকুচা করে ভীত, সংকোচে টুনির বাবা আড়ষ্ট জুবুথুবু। কাশতে কাশতে ঘরের অন্ধকারের ভিতরে চৌকিতে উঠে বসে সে—অ টুনি, বিস্তর উড়োস, কাঁথাটা রোদে দিলে—খরায় তেজ আছে।

নিরুত্তর টুনি বাইরে একা দাঁড়িয়ে থাকে। বাপ ডাকে সন্দেহে, ও টুনি—

: কি? বাইরে থেকে টুনি এবার সাড়া দেয়।

: একটা বিড়ি দিবি? রাগু ক্যানে মা!

: কেন কও অর কথা তুমি?

টুনি কাঁদে ফোঁস ফোঁস।

: সে তুই বুঝবিনি মা—

: লও—ঢের বুঝি আমি—অনেক বুঝি—এবার ঘরে আসে টুনি।

বিড়ির সুখ টান টেনে অনেক বেশি কাশে টুনির বাপ। থুথু ফেলার হাঁড়িতে পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে।

টুনির আবার হিক্কা ওঠে। বাইরে বেরিয়ে চালের বাতা ধরে হিক্কা তোলে টুনি। এবার ভাত খেতে হাঁড়ির কাছে যায়। অন্ধকারের ভিতর থেকে বাবা ডাকে—ও টুনি কাছে আয় না মা।

৩.

ভাত ফুটে যায়। জানালার বাইরে তালপাতায় মাইতি ঘরের আলো জোনাকির মতো। আলো না জোনাকি? জোনাকি না আলো? সন্দেহ নিয়ে মন দিয়ে দেখে টুনি। গাছের পাতায় দলে দলে জোনাকি বসলে বৃষ্টি নামে। বাইরে তার

কালো বিড়ালটির মতো ঘন গাঢ় নিশ্চুপ অন্ধকার। খিড়কি পুকুরের পাড়ে টোকা গাছটি থেকে টুপ করে পাকা আম কি খসে পড়লো?
বিড়াল ডাকে ম্যাও। খস্-খস্—দরজায় কেউ।

দরজা খুলতেই অন্ধকারে নেশার গন্ধ উপুড় হয়ে উল্টে পড়ে টুনির দু' নাকের গর্তে। কাপড় টেনে নাক চাপে টুনি। বাবার ঘর থেকে ছিট্‌কে পড়া ডিবরির মরা আলোটা মাছ মারা চৌকির মতো বুকে বেঁধে তার। শাড়ির আঁচল নীচে ফেলে বুক ঢাকে সে। আর তখন টুনির কাঁধে হাত পড়ে।
চ-রে—

গোয়ালের একটি দিকে, সেখানে খড় থাকে, খড়ের আকালের সময় বর্ষার দিনে কাঁচা হালি ঘাস থাকে। গোবরের ভীষণ গন্ধ। মশা।

শোয় টুনি। টুনির পায়ে সে সুযোগে মশা বসে।

: অ টুনি।

: কি?

: আজ কম।

: ক্যানে?

: কম আছে রে টুনি—না হয় বাকি রাখ—

: ধার বাকি নয় গো—লগদ্—'আজ লগদ কাল ধার'—দেখ নাই ঝুলান থাকে দকানে—হি হি হাসে টুনি।

: শম্ভু আসার আগে তো তোর রেট কম ছিল রে -

: রেট? চমকে উঠে বাঘ দেখে টুনি।

ঘাম মোছে বুকের। পেটের কপালের নাকের ডগার সমস্ত ঘাম। সাহস তো কম নয় লোকটার! রীতিমতো গেরস্থ গিরীশ বেরার মেয়ে টুনি। সে—তখন কি আর এখন কি। এখন শম্ভুর বৌ সে। গিরীশের ঘরজামাই শম্ভু পাল। বলে কি এ? রেট! টুনির তাহলে রেট তৈরি হয়ে গেছে না-কি!

ফণা তোলে টুনি। এক চড় বসায় মানুষটির গালে, ঘুঁসি চালায় চুলভর্তি ভুঁড়িতে। টুনি বোধ হয় এতোক্ষণে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। মানুষটি কুঁকড়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে—টুনি রে—

: ফের? —দূর হ' দূর হ'।

: তোর বুড়ো বাপের পেট বন্ধ হবে। খাবি কি? মরদের তো পাত্তা নাই!

শব্দ করে কাঁদে টুনি। কষ্ট হয় সারা শরীরে। বুকের ভিতর গাদাখানেক বাতাস ঢুকে গিয়ে বরফ কঠিন এখন। রাস্তা বন্ধ। ফিরে বেরোতে পারে না

বাতাস। টুনির দম বন্ধ হয়ে আসে। হাত পাতে সে। তখন মোর উঠতি বয়স। জামা পরি।

: বল টুনি আমার ভারি কষ্ট রে।

: শখে গো—সেদিন উঠতি বয়সের রঙের টানে—চুড়ি— ব্লাউজ—ভিতরের জামাটা—

: হুঁ—বল।

: বাবা আমার খাটতো তখন, অভাব ছিলনি ঘরে—আজ মোর হাঁড়িতে চাল নাই, চলে ক্যামনে ?

আবার কাঁদে টুনি—ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে। গরুগুলোর পা নাড়ার শব্দ ডিঙিয়েও জেগে ওঠে টুনির শরীরের শব্দ। এসব যে পালুনি গরু—না হলে বিক্রি বাটায়ও—লোকের গাঙ্গে কপাল ঘসে টুনি ?

: ও টুনি ?

: কি !

: তোর কপালে সিঁদুরের কড়া গন্ধ রে—গালটা বোধ হয় আমার লাল হয়ে —সিঁদুরে ঘামে তোর..........

টুনি নিজের আঁচল দিয়ে মুছে দেয় সে রঙ। গোবরের গন্ধ ছাপিয়েও সিঁদুরের গন্ধ গুমোট বাতাসে বেড়ে চলে দুটি নাকের চারপাশে। টুনি তখন টাকা নেয়। চোখের জল মোছে।

ঘরের ভিতর থেকে টুনির বাবা ডাকে—ও টুনি কাছে আয় না মা।

গোয়াল থেকে বেরিয়ে ভাতের হাঁড়ির কাছে যায় টুনি। জল খায়। তারপর তার পেট গুলিয়ে ওঠে কেমন। স্নান করতে ইচ্ছে করে। শরীরে গরম বাড়ে। ঘাটে যায়। অন্ধকারে পোকারা ডাকে। ঘাসে ফড়িং লাফায়। টুনির কপালে ফড়িং বসে। কপাল যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চাইছে। কপালে জল নিয়ে, মুখে জল ভরে। সিঁদুরের কড়া গন্ধ—টুনির হিক্কা ওঠে। ঘাটে সতর্ক পা রেখে জলে নেমে ডুব দেয়। সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করে। ততোক্ষণে গরম কমে যেন কিছু। ভেজা কাপড়ে ঘরে এসে বাবার ঘর থেকে শুকনো কাপড় নেয়। বাবা বলে, মাগো কাই ছিলু এতোক্ষণ ?

টুনি বলে, ঘাটে।

৪.

পরের দিন, তখনো, জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে দূরে এবং একটু দূর থেকেই টুনির বুকে আটকে পড়া বাতাসের মতো গাঢ় এবং কালো অন্ধকার হিংস্র জন্তুর

আক্রমণের মতো ভয়ংকর ও বীভৎস হয়ে ওঠে। দূরে পুকুর পাড়ে গাছের ফাঁক দিয়ে একটি ঘরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোর রহস্য টুনির বুকে লুকিয়ে থাকা ছোটো একটি সুখের মতো। ওই আলোর সুর এবং অন্ধকারের প্রাবল্য লাফিয়ে পড়তে চায় টুনির শরীরে। তারপর তার ঘন কালো চুলগুলি ধরে টানাটানি করে। যেখানে নিজের কালো বিড়ালটি সুখ খেতে দাপাদাপি করে। ভাতের উপচে পড়া ফ্যানের চোঁয়া গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে চোখ ঢাকে সে। আজ তিন মাস মানুষটা বাইরে। আগেও তো খাটতে বাইরে গিয়েছে। বড়ো জোর দিন পনেরো। মাঝে কারোর হাতে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে, তারপর অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরতো। ঘামেসারা চওড়া ফর্সা পুরুষ মানুষকে দেখে কোন মেয়েমানুষেরই না মনে সুখ বাড়ে! আদর খাওয়ার ইচ্ছায় বুকটা টান টান উত্তেজনায় ধনুকের ছিলার মতো হয়ে যায়! আদর খেতেও মজা, খাওয়াতেও মজা। অন্ধকারে ভয় পেয়ে প্রশ্ন ছোঁড়ে টুনি—বল্‌না গো মজা নেই? কই বুকে হাত দিয়ে বল্ তো—

মাঝারি সম্পন্ন চাষী, গেরস্থ ঘরের ছেলে শম্ভু—তার সোয়ামী। নিজেদের ক্ষেতে ধান ফলাতো। শীতকালে আলু সরষে ফলাতো। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে দে চম্পট—ভবঘুরে। গতর ভালো, খাটতে জানতো। এ সে কতো গ্রাম ঘুরে ঘুরে তারপর টুনিদের গ্রামে। প্রেমে পড়লো টুনির। কানা ঘুষায় লোকে বললো, গিরীশ বেরার ঝি-এর সঙ্গে শম্ভুর আছে। তা সেসব কথা তো কানে গেলো গিরীশের। টুনির বাবার ভালো লাগলো ছোকরার খাটবার কৌশল দেখে। বে-দিয়ে ঘর বাঁধিয়ে দিতে বেশি বেগ পায়নি সেদিন টুনির বাবা। পরে শম্ভুর বাপের কাছে খবর গেলে,—বয়েই গেছে তার অমন ছেলেকে ঘরে নিতে। শম্ভুর বাপ মুখ দেখেনি ছেলের। টুনি কেবল আবছা আলোর ওপর দুহাতে শম্ভুর মুখটাকে রেখে দেখেছে। দেখে দেখে ক্লান্ত হয়েও আবার দেখেছে। দু' বছর মেলায় ঘুরেছে। কিশোরপুরের সিনেমা হলে নৌকা চড়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছে। হলের অন্ধকারে কানে কানে কথা কইতে কতো সুখ। মুখে জর্দাপান গুঁজে হাতে হাত ধরে হেঁটে ফিরেছে কতো। দূরেও তো গিয়েছে তার মরদ, —মাটি কাটতে সরকারি খাল কাটায়, রাস্তা তৈরিতে। তাতে নগদ টাকা। রেটও বেশি।

তার বাপের মালিক গোপেন দাসের বড়ো ছেলেটা বলে কি? টুনির রেট! লাইনের মাগীদের রেট থাকে শুনেছে সে।

চমকে ওঠে টুনি।

আজ তিনমাস শম্ভু ঘরে নেই, একটা পয়সা পাঠানোর দেখা নেই। গাঁয়ের ভিতর কাজ নাই, অসুস্থ বাপের ক্ষমতা নাই। তা না হ'লে গোয়ালের খড়ের ওপর—ছিঃ ছিঃ! —সাহস তো কম নয় লোকটার!

টুনির কপালে ডানদিকের মোটা শিরাটা দপ্ দপ্ করে। বাঁ বুকে ঢিপ্ ঢিপ্। কোমর ধরে যায়। ভয় পায় টুনি। বিড়ালটি কোলের কাছে ডাকে—ম্যাও।

টুনি উঠে দাঁড়ায়। ভাত ফুটে যায় হাঁড়িতে। বাইরে খস্ খস্। দরজায় কেউ! —কে?

দাসের ছোট ছেলে! টুনির থেকে বছর চারেকের ছোট। গোঁফে চুল ফোটেনি এখনো।

ঠাস করে ছেলেটির গালে চড় বসায় টুনি। তখন তার শীত করে। সুড় সুড় করে ছেলেটি ভয় পেয়ে অন্ধকারে যেন মায়ের গভভে ঢুকে যায়। গায়ে আঁচলটা ভালো করে জড়ায় সে। তার জন্য লাইন পড়েছে নাকি!

শম্ভু ঘরে নেই বলে!

দরজা বন্ধ করে টুনি। বাবা ডাকে—ও টুনি কাছে আয় না মা।

বাবার কাছে কতো আর সামাল দিবে সে! জামাই-এর পয়সায় খাচ্ছে তার বাপ! হুঃ — বরাত কতো!

হেঁস পেতে গড়ান দেয় টুনি।

আরো সাতটা দিন দরজা খোলে আর মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে টুনি। টাকা ক'টা ফুরোতে আর বড়ো জোর দু'দিন। তারপর?

কি করবে সে? বিকেলের আবছা আলোতে পারা-চটা আয়নায় মুখ দেখে টুনি। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে দেখে গাছে যেন জোনাকি সেজেছে। দু' দিনের শেষের দিন রাতে ভাত ফোটার পর টুনিদের দরজার বাইরে আবার খস্ খস্। —ও টুনি বিস্তর কষ্ট রে। আধটা দিন—মুখের উপর কবাট বন্ধ তোর। গোপেনের বড়ো ছেলে।

দরজা খোলে টুনি। কপালের ডানদিকের শিরাটি দপ্ দপ্ করে। বুকের বাঁ দিকে ঢিপ্ ঢিপ্।

কাল সকালের চাল আছে হাঁড়িতে দু'জনের সাত মুঠো। তারপর? রাতে বাপের পেটে দেবে কি?

দরজা বন্ধ করে টুনি। বাবা ডাকে—ও টুনি কাছে আয় না মা।

৫.

: টুনি,—পঁচিশ টাকায় আর কতদিন রে মা—

: আজ শেষ

: তবে!

: তমাকে ভাবতে হবেনি

: ও মা সে কি রে?

: তুমি থাম তো—টাকা ঠিক পাঠাবে।

টুনির বাবার হাঁফ বাড়ে বুকে। কাশতে শুরু করে। মুখের ভাত বেরিয়ে আসে। ভামায় খাওয়া চালের কাঁলো ভাত বাছে টুনির বাবা। জল খায়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ভাঙা আয়নায় কপাল দেখে টুনি। সিঁদুর লাগায়। তারপর মুছে দেয়। গন্ধ লাগে গোপেনের ব্যাটার নাকে।

হাঁড়ির ভিতর জল ফোটে টগ্ বগ্, ঘড় ঘড়। জানালার ফাঁক দিয়ে উপচে পড়া অন্ধকার দেখে টুনি। বাবার ঘরে ডিবরিটায় তেল নেই। কোনরকমে জ্বলে থাকায় ঘরের ভিতর প্রায় অন্ধকার। দূরের সেই আলোটা নেই আজ। টুনির বিড়াল ডাকে—ম্যাও।

বাইরে খস্ খস্।

দরজা খোলে টুনি। মদের গন্ধে টুনি নাকে কাপড় চাপা দেয়। মাথায় দপ্ দপ্। বুকের বাঁ পাশে ঢিপ্ ঢিপ্! রেট!

তবে আজ সে তার পুরো রেটটাই নেবে।

মাথা ঘোরায় টুনির। রেট……মাথায় শব্দ ছোটে, কত কি ছোটে।

: পুরা আছে ত?

: না-রে টুনি—অনেক বেশী নেশা করে জড়িয়ে জটপাকানো চুলের মতো গলার স্বর লোকটার। অন্ধকারে সারা দুনিয়া অন্ধকার।

: আবদার তো কম নয় তোর—

খেঁকিয়ে ওঠে টুনি। ঘরের ভিতর থেকে গিরীশ ডাকে, ও টুনি কাছে আয় না মা—

লোকটা বলে, ও টুনি!

—পয়সা নাই ত শখ ক্যানে অ্যাঁ? পুরা নাই ত আসসু ক্যানে? ভাগ্।

দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে টুনি।

—আমি রে, আমি রে—ও টুনি, আর কেউ নয়, আমি শম্ভু।—ও টুনি, খুল!

টুনি প্রাণপণে দরজাকে চেপে ধরে থাকে। শিকল তুলতে হাত ওঠে না

ওপরে। থর থর করে কাঁপে।

টলমলে পা ফেলে ভীত শম্ভু চৌকাঠ ডিঙোয়। খরিশের মতো টুনি কেবল ফোঁস ফোঁস করে কান্নার ঢেকুর তোলে।

উঠোন আর ঘরের মাঝখানে চৌকাঠের ওপর ইঁদুরের ছোটা দৌড়ার মতো জড়ানো খসখসানির শব্দে টুনির বাবা নিভে যাওয়া ডিবরির অন্ধকার হাতড়িয়ে ভিতরের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

অন্ধকার শূন্যে—হাত বাড়িয়ে গিরীশ খোঁজে মেয়েকে—ও টুনি ও টুনি কাছে আয় না মা। কে রে বাপ শম্ভু—তুই কি এলি? ও শম্ভু—কাইরে ও টুনি—কোথায় গেলু মা—

শম্ভু বলে, ও টুনি আয়—টুনিরে—আমি শম্ভু

অন্ধকারে ভূতের মতো দুটি রুগ্ন মানুষের দিকে নিজের অসমর্থ দুর্বল একটি হাত কেবল ভাসিয়ে রাখে টুনি।

কান্নায় ঘেন্নায় রাগে আর হিংসায় লজ্জা আর অভিমানে এক জটপাকানো মজায় এ যেন টুনি কানামাছির খেলা।

বটুরা সাত বোন এবং আমি

কমল চক্রবর্তী

ওদের সাত বোনের একজনকে আমি বিয়ে করেছি। সাত জনের মধ্যে একজন মাত্র ফর্সা ছিল। মানে দুধে আলতা। ফলে ওর নাম কেউ না রাখলেও কালক্রমে 'আলতা' হয়ে যায়। আলতা বিয়ে করেছিল ভালবেসে এক বীট অফিসারকে। সে খুব কম মাইনে পেলেও কোন জাদুতে আলতা রং অক্ষত রেখেছিল জানিনা। তবে আলতার ভাষা বদলে গিয়েছিল। সে আমাকে দশবছর পর এক মিলন উৎসবে মানে পৈতে জাতীয় কোন মাঝারি ধরণের, দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে— কি গ জামাই, ইদিকে বটুকে একবার আইনতে হয়।

আমার স্ত্রীর ডাক নাম বটু। আমিও ওর কোষ্ঠীর নাম বটেশ্বরী মাঝে মাঝে ব্যবহার করতুম। ও 'আমার বটেশ্বরী / ও আমার পটেশ্বরী'। মতলব খারাপ বোঝা যেত।

বটুর কথাই লিখব। বটুর হয়ে ওঠা. ওর গানের মাষ্টার, কিচেন গার্ডেনে লুকোনো ইঁদুর ধরতে এক রাত্তে ছুটে আসা কাল কেউটে। মায়ের থেকে প্রত্যেক-বার ছিনিয়ে আনা টুকিটাকি হরলিকসের শিশি, গুঁড়ো সাবানের সঙ্গে পাওয়া হাতপাখা ইত্যাদি। পুরী বেড়াতে গিয়ে বটু আমার ছাত্রের সঙ্গে এক বিকেলে সমুদ্র হাওয়ায় ঘুরেছিল। এদিকে উইন্ড মিল ওদিকে বি. এন, আর হোটেল, পায়ের তলায় নরম বালি।

এক বোনের সঙ্গে কয়লাওয়ালা দাসের। কালো মুসকো দাসবাবুকে আমরা কোনদিন হাসতে দেখিনি। কিন্তু পৈতে দুলিয়ে খালি গায় কয়লার ওপরে বসে থাকতে দেখতুম। ঐ গর্বিত পৈতেধারী ছোলাবাবার ভজনা করতেন। মহাপুরুষ ছোলার শিষ্যদের সকলেরই ছিল পীত-পৈতে, এবং শ্বেতপাথরের খলনুড়ি, যাতে শিষ্যরা পদধূলি মোলায়েম করে অতি প্রত্যুষে মধুসহকারে।

কোন কোন মধ্যরাতে সেজবোন সরলা এবং দাসবাবুর আর্তনাদে আমাদের

পাড়া দুঃস্বপ্নে ভেসে যেত। কারণ সরলা তখন সবে পাগল হতে শুরু করে। তারও বছর তিনেক পরে এক মাঘী পূর্ণিমার রাতে দেখেছিলুম, বস্ত্রহীন, পরিত্যক্ত সেই যুবতীর সারা গা দিয়ে তখনও রক্ত চিড় চিড় পড়ছে। হিমে অচঞ্চল। কয়লা দাসের রোয়াকে ভাঙা কোনার্ক পড়েছিল। জ্যোৎস্নায় রক্তের সুতো উদোম শরীরে খেলে বেড়াচ্ছিল।

আমি সেদিন কি করতে পারতুম। যে কোন ক্ষয়ই ঘটনাকে দীর্ঘ করে। কিম্বা সরোকে (ডাক নাম) লেপে মুড়ে নিয়ে গেলে। কিম্বা কয়লা ওয়ালে ঘুম থেকে তুললে। কিম্বা আক্রমণ। কিম্বা যারা দুঃখীদের নিয়ে কবিতা লেখে। এইসব সাত্ত পাঁচ, আতসবাজি, গয়নাগাটি, হীরের আংটী, পাটীগণিত, এইভাবেই আসলে মনুষ্য জন্ম সত্য। তবু যে কোন মূল্যে একটা প্রতিবাদ রেখে যেতে হয়।

বাড়ির পূর্বদিকে কবে কোন কালে একটা মোটাসোটা হরতুকি গাছ গজিয়ে ছিল। হয়ত কেউ পাকা ফল খেয়ে বীচি ফেলে গেছে। সেখানে কবে থেকে একজোড়া ব্যাঙমা ব্যাঙমী বাস করছিল জানতুম না। প্রত্যেক বছর পাড়ার ছেলেরা সরস্বতী পুজোয় গাছ থেকে ফল পেড়ে সংকল্প করত। এই গাছের কথায় পরে আসছি।

হ্যাঁ, অনেক পরে একবার মধুপুরে কিম্বা সেটা জামতারাই হবে বেড়াতে যাই। লাল মোরাম দিয়ে হাঁটছি। একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। মাঝে মাঝে মুরগীর গলায় ক' ক' র-ক' ডেকে ফেলছি। কখনও হাওয়ায় লাফিয়ে উঠছি। এইভাবে যেতে যেতে কতদূর যে গিয়েছিলুম ঠিক নেই। তখন হাঁটতেও পারতুম দেদার। নতুন ঠ্যাং, মালাইচাকি, পায়ের সব কটা আঙ্গুল, লিগামেণ্ট, টো, হিল, কাপ ম্যাসল, থাই সব ঝকঝকে। পিস্টনে কেবল পালিস আর লুব্রিক্যাণ্ট পড়েছে, ক্ষয় নেই। কারণ আমি সর্বদা ভিড়েছিলুম যেখানে বিশেষ হাঁটার দরকার নেই। মাঝে মাঝে ইস্কুলের জিলিপি রেসে কিম্বা গুলি চামচে নাম দিয়ে পিস্টনের চকচকানি বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল।

তখন ফুসফুস মানে লাং। একটা ঘন তেঁতুল গাছের মত গ্রীণ, বিশাল খোলা আকাশ। এই বড় বড় লাং, দশটা ঘোড়ার ছুট। আকাশ ধরতে পারা, দেয়ালে ছবি আঁকতে পারা, গুলি খেতে পারা। ছোলা খেলে ছোলা হজম হয়। কাঁচা পেঁয়াজ! এখন কাঁচা পেঁয়াজ খেলে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। তখন দেয়ালে দেখতুম বড় বড় বিজ্ঞাপন, বাকলা, অন্নজিন. দেশোদ্ধার. সূর্যোদয়, আগুন

আরও সব মনে নেই। স্মৃতি ক্ষীণ। কোন কিছুই ঠিক জানতুম না। বেশ মজাসে হাঁটছি, ফিরছি, ভারমুক্ত। কোন চেনা ব্যাপার নেই। হালকা। এটা পরে বুঝেছিলুম, একবার ট্রেনে চাপলে চেনা মানুষ আমার সহ্য হোত না। অচেনা মানুষের সঙ্গ খুব জরুরী হয়ে পড়ত।

শুধু 'কোথায় যাচ্ছেন' নয় আরও বেশি এগিয়ে গেছি কতবার। একবার খাজুরে করতে গিয়ে আমাদের দুটো পেটিকাই ভোগে। দুজনে শেষে ডারুটীতে বাড়ি ফিরি। ভাগ্যিস ও বিদ্যায় আমার পূর্বাহ্নে কিছু গুণপনা ছিল। আমি তো ব্যাটাছেলে কালো কোর্ট দেখলেই সণ্ডাসে লুকিয়ে পড়লুম বা তেমন বুঝলে কামরা টপকে গেলুম অথবা মাঝ স্টেশনে নেমেই পড়লুম। কিন্তু মেয়েমানুষ!

সঙ্গে রয়েছে বটু। মাথায় ঘন কাল কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, রাঙা ঠোঁট, বনহরিণী নয়ন, জটিল থুতনি প্রগলভ চরণ। ওকে ইঁদুর বেড়াল খেলায় নামতে হবে। অথচ আমাদের যথাসর্বস্ব, ব্লেডে কাটা পকেট, জুতো চলে যাওয়া মোজা মাত্র পা, অন্য অক্ষত পকেটে গুরুদেবের প্রসাদী ফুল—এমনকি সততা, চরিত্র যদি যাচাই হোত, আমি নীরবে ঢোক না গিলে পরের পর রামধুন, যেটি গান্ধী বাবা গাইতেন, ঐ ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম [আমি 'তেরা নাম'ই জানতুম (তেরা মানে তোমার) কিন্তু খুব ভাল করে অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত গানে কান পেতে শুনেছি 'তেরো'। তেরোর মানে জানি না।] এ ছাড়া, ভব সাগর তারণ কারণ হে, প্রতিটি শব্দ ঠিক উচ্চারণ করে যেতে পারি।

এ কথা কি জানিনা? আসল সমস্যা গান নয়, গতি। গতি কমে গেলেই রাখাল বালক। ভেড়া ছাগল চরান দিগন্ত মাঠ। নো এডাল্ট। এডাল্ট মানে কাউ-বয়। আমাদের সবটাই শিশু চলচ্চিত্র। এমনকি একজন হিরোইন আধ-কাপড়ে, তাও শিশুভোগ্যই হতে পারে। কারণ এডাল্ট মানে বস্ত্র সমস্যা কি? হয়ত মোরারজী ভাই বলতে পারবেন কারণ মোরারজী মিলের বিজ্ঞাপন প্রায়শই কাগজে দেখি। এখন কথা হচ্ছে, এ মোরারজী সেই মোরারজী কিনা জানি না। তা না হলে, আমি একজ মাত্র বস্ত্রশিল্পপতিকে চিনি তিনি, ঐ।

আমি একজন সুররিয়ালিস্ট পেন্টারকেও জানতুম, সে পরে গলায় দড়ি দিয়ে, আসলে মরতে চাইছে না, মরেও নি, আর একটা ছবি আঁকতেই চাইছে। যে ছবিতে চেনা পাখি, কুঞ্জবন, গর্মশিস, মিছিল থাকবে না। অন্য ছবির জন্যই। মনে আছে কোন কোনদিন বেশি রাতে সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, উঠে, ওর জানালার সামনে দাঁড়াতুম। দেড়টা দুটো হবে, যখন ডাকাত আর

ডিটেকটিভের চলাফেরা। ছায়া ইজেলে পড়লে মুখ না ফিরিয়ে বলত—কি, সিগারেট? ভেতরে এসো।

ভেতরে রং এর গন্ধ, শাদা সেলোফেনে মোড়া, অয়েল. প্যাস্টেল।

—চা খাবে নাকি, বিমল জিজ্ঞাসা করত। একমাত্র ইস্টিসান ছাড়া আর কখনও কেউ রাত দেড়টায় 'চা খাবে নাকি'! না ঠিক বলা হোল না। বাসর রাতে ছোট শালি সুলতা চা এর কাপ হাতে বটুকে সরিয়ে দিয়ে পাশে বসে, গা ঘেঁষে বলেছিল, —এত পর পর ভাবেন কেন, এর পর থেকে তো ওর সাথেই থাকবেন। একদিন আমি একটু গা ঘেঁসি। আমি হাসতে ভুলে গিয়েছিলুম। আমার লবজ হবার জোগাড়। আগে এত স্মার্ট কথাবার্তা শুনিনি। পরে জেনেছিলুম, আজকাল ছোট শালিরা জামাইবাবুদের আরও দুর্ধর্ষ বিশেষ্য বিশেষণ সাজিয়ে দিচ্ছে। দেয়াল বিপ্লব। কত কথাই মনে পড়ে, শেষে সুলতা হারুনকে নিয়ে পালিয়ে গেল। মেগাস্টার হারুন তখন সদ্য জেল থেকে এসেছে। গলার মালা শুকোয়নি। খারাপ স্বাস্থ্য। রাস্তায় দর্শনীয়। 'বিপ্লব' শব্দটি ছিল হারুনের ট্রাম কার্ড। যা নানা ভাবে সে চালাতে চালাতে একদিন আমার ছোট শালির উলের গোলা খয়েরী পাঞ্জাবীর পকেটে ফেলে বেটে পড়েছিল।

সুলতা সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানি না। কারণ সুলতার ওপরে দু বোন তারপর, বটু। একে একে চার বোনের কথাই বলা হোল। এখনও তিনজন বাকি। যে তিনজনের পরিচিতি আমরা কালক্রমে পাব। হুঃ, রাতে সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। কেন যে ডে-এ্যান্ড-নাইট সার্ভিস থাকে না। এসব হাইওয়েতে সারাদিন, দিন। কখনও ধাবা শুকোয় না। সারা রাত। ডিম, তরকা, মুরগী কাটা রক্ত।

আমি, সমীরণ একবার বারৌণির দিকে এক ধাবায়। রাত আড়াইটে। সমীরণ বলল, গুরু একটা হাফ আছে, মুরগা বল। ফলে বলতেই হবে। সে রান্না করছিল, বললুম মিস্ত্রি মুরগা ফ্রাই হবে? সে বলল, হবে। দুজনে দুটো খাটিয়া নিয়ে শুয়ে পড়লুম। কিসানগঞ্জ থেকে ট্রাকে চেপেছি যাব মজঃফরপুর। মিস্ত্রি, বুতরু—এ বু-ত রু ডাকল। একটী দশ বারো বছরের ছেলে রাত দুটোয় প্লেট ধোয়া অসমাপ্ত রেখে উঠে এল। —ক্যায়া চাচা। —ও কালা মুরগা জলদী উড়াকে লাও।

কিছু আগে যখন আমরা গমের ট্রাক থেকে নেমেছি তখনই শুনেছিলুম মুরগীর প্রহর যাপনের ঘাড়ি ধরা ডাক। গভীর রাতে হাইওয়ে, দু চার জন বিক্ষিপ্ত। গোটা দশেক ট্রাক, পাশে খোলা পান দোকান, মদের নিশুতি, চাকা

সারানোর দোকানে হঠাৎ হাসি, মুরগী ডেকেছিল। বাচ্চা ছেলেটি ঝুরি তুলে ঘুমন্ত পাখিকে বাইরে নিয়ে এল।
পাখি নড়েনি, কারণ তার ডানায় (যা একমাত্র ঝটপট করে), নখে, তীক্ষ্ন ঠোঁটে তখনও রাতের ঘুম জড়ানো। কারণ সে রাতপাখি নয়, সে প্যাঁচা বা বাদুড় নয়। কারণ সে মানুষ নয়। আমি খাটিয়া থেকে দেখলুম, একটি শান্ত অবগাহন। মৃত্যু। পালংকের সমুদ্র থেকে অনন্ত শূন্যতায়। বুতরু পাখিটাকে ঝুঁড়ি তুলে নিয়ে এল। চপারে মুণ্ডু আলাদা করে মুহূর্তে সে বাসন ভরিয়ে তুলল রাঙা আলোয়।

—এত রাতে চা! আপনি কি রোজই খান না আমাকে দেখে।
—না তেমন বাধ্য বাধকতা নেই তবে ব্যবস্থা আছে। আপনাকে দেখে মনে হোল ভোর হয়ে গেছে, এক পাত্র খাওয়া যাক।
বসে পড়লুম। এত রাতে কখনও কোন শিল্পীর স্টুডিওতে ঢুকিনি। অদ্ভুত একধরণের ফিলিংস হচ্ছিল। চারধারে অসংখ্য রঙীন ছবি। টাঙানো, শোওয়ানো, অসমাপ্ত। সবগুলোই না চেনা।
—আজকাল কি আঁকছেন?
—হ্যাঁ, ওই, মানে ধরুন, একটা অন্য পৃথিবী, ঐ ধরুন গিয়ে—
—ম্যানে মঙ্গল গ্রহ, শুক্র ইত্যাদির প্রাণী, গাছপালা, তাম্রপাত্র
—না, গ্রহ ফহ নয়, মানে—
—তবে তৃতীয় বিশ্ব, তাই না, একটু হেসে ফেলি।
—না, বিমল হতাশ, নিজের ছবিগুলোর দিকে তাকাল। —বিছু কি বোঝা যাচ্ছে না; শুক্র কিম্বা তৃতীয় বিশ্বই লাগছে! বিমল হতাশায় ছবিগুলোর রঙ-এ মিশে গেল।
—আমি পারছি না। কি জানেন, একটা প্যারালাল বিশ্ব। অথবা বিশ্ব ফিশ্বও নয়, কেবল অস্তিত্ব।
এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, এ আমার চায়ের কাপ নয়। বললুম—আর্টিস্ট, আমার একটা পোর্ট্রেট করতে হবে।
—ঝামেলা আছে, সিটিং দিতে হবে, দীর্ঘ, বড় ক্যাচাল।
—আরে ম্যান ছবি দিয়ে যাব। বর্ণশোকার্ডের তোলা খুব পরিস্কার ছবি আছে। এটা একটা অনেকদিনের সখ। বিমল সিগারেট এগিয়ে দিল। —আর একটা মাত্র স্পেয়ার করতে পারি। এর বেশি দরকার হলে পাউচ রয়েছে।
১৯৮২, তেসরা নভেম্বর, সকাল সাড়ে আটটা, আমার পৌঁছনোর সময়। দেখি,

সারাঘর রঙ, তুলি, বোর্ড, ক্যানভাস, মাঝে দাঁড়ে থেকে বিমল। জানালার ধারে, কিছু টবে, ক্যাকটাসে, ফুল ফুটেছিল। সেদিনও। সেণ্টার টেবিলের পাশে ছ' সাতটি পাতা বাহারের টব। পাতার রঙ যথারীতি রঙীন। এবং দেয়ালে ছবি। একটা প্যারালাল পেইণ্টিং। টবের গাছের পাতাও ঝরেছিল। হাওয়া একটু ঠাণ্ডা।

দারুন সুগন্ধী চা। রঙও তেমনি গোলপী। বিমল বলল, আমার এক ভক্তের চা-বাগান আছে। তার স্ত্রী নিজে হাতে পাতা ছিঁড়ে, ভেজে পাঠান। দু মাস তিন মাস পরপর দিয়ে যান। চলুন একবার বেড়িয়ে আসি। প্রায়ই বলেন। কখনও যাওয়া হয়নি।

—চলুন। চা বাগান কখনও দেখিনি খুব মজা হবে।

বিমল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এত চুপ যে ক্যানভাসের প্যারালাল পৃথিবী জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। বলল—কি হবে গিয়ে। আর এই সব দেখছেন না—হাত দিয়ে দেয়াল আসবাব, সেলোফেন, যেন আকাশ বাতাস রাত্রি সবই দেখাল—এসব কে সামলাবে। খুব গণ্ডগোলে।

বটু বলল, কেন মারা গেল গো, বড় ভাল মানুষ ছিলেন। ইদানীং দেখতে পেতুম না। আমার সেজদির সঙ্গে ওর সম্বন্ধ এসেছিল। ভাগ্যিস হয়নি। ভাব আজকে সেজদি বিধবা হলে! বিমলদাদের বাগানে আমরা ছোটবেলায় চড়ুইভাতি করতে যেতুম। বিমলদা আমাদের দুটো চারটে নারকেল ভোলাকে দিয়ে পাড়িয়ে দিতেন। বিমলদার এক বোন আমাদের সঙ্গে পড়তো।

বটু ওরফে বটেশ্বরী, হেমলতা ও আদিনাথের জৈব প্রহসনের নজির। খড়্গেশ্বরীর মন্দিরে ক্রমাগত পুত্রার্থে হত্তে দিয়ে অবশেষে বটু এল। ফের নাক ফোঁড়াই, কান ফোঁড়াই ওয়ালার খোঁজ। এক টাকা, দু'সের চাল, পাঁচটি আলু। হিজড়ে নিয়েছিল দুটি পুরনো শাড়ি, দশ টাকা, কোলে তুলে নেচেছিল। তখন ছোটমাসি আতুর ফুরোতে এসেছিলেন। হিজড়েদের বললেন, ভাল করে নাচ। হিজড়েরা বাড়তি টাকার লোভে, ডান হাতে মেয়ে বাঁ হাতে কাপড় তুলে, —কার ঘোরে চাঁদ এল রে, কার ঘোরে চাঁদ এল রে—গেয়েছিল। গানে শব্দটি 'ঘোর' হবে না ঘর হবে। আসলে দুইই প্রযোজ্য।

অথচ হেমলতারা কিছুতেই ভুলতে পারেন না ন'মাসের সাধে তাকে যখন ঢাকা দেওয়া দুটী গোপনের একটী ধরতে বলা হয়, উনি নোড়াই ধরেছিলেন। যেমন ওদের রীতি। ন'মাসে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, নতুন শাড়ি, সবই শাশুড়ীর। উনিও এই শেষবার বটুর বেলায়।

রেওয়াজ অনুযায়ী ঝুড়ি ঢাকা ছিল একটি নোড়া এবং অন্য ঝুড়িতে একটি প্রদীপ। হেমলতা নোড়া ধরলে হুল্লোর পড়ে যায়। তৎকালীন রীতি এবং অর্থনীতি স্বচ্ছল থাকায় ঘর ভরা এয়োতির মধ্যে নোড়াটা ঘুরতে থাকে। এবং চুমো, আদরে চিত্রিত হতে থাকে। একজন অতি উৎসাহী নোড়া কোলে—ও-ও-ও- সোনা কাঁদে না—দুদু খাবে—ছুমু খাবে— ওরে আমার দুষ্টুরে। ন' মাসের হেমলতা সেদিন স্বামী সোহাগিনী. রাঙা, বনবালা হয়ে উঠেছিল। সে রাতে প্রায় সকলে ফিরে গেলে, খাটে অর্ধমনস্ক ভারি প্রসূতিকে স্বামী জিজ্ঞাসা করেন—শুনলাম তুমি নোড়া ধরেছ? এই তামাসায় রাত শেষ হয়। এইসব কতদিনের ঘটনা, আজও তাজা মনে হয়। নোড়া কোলে পরিহাস পারঙ্গম যুবতীদের উল্লাস আজও কাচের সার্সি ঝনঝনে ছড়িয়ে পড়ে।

কোন কিছু স্থির নয়। আলতা বলত, এ জামাই, কি বটেহে —আমাদের উদিকে যাবেক নাই। তুমাকে কেঁকড়া খাওয়াবক, খুঁখড়া খাওয়াবক।

আমিও তামাসা কবে বলতুম, হ হ যাবক কেনে নাই। তবে তুমার কেঁকড়া যদি আমাকে দাঁড়া মারে দেয় তখন কে বাঁচাবেক।

দুধে আলতা মুখে বেগুনি আবির ছড়িয়ে হাসত. ই জামাইটা বড় দুষ্ট বটেক। ইয়াকে লিতেই হবে। দু দুটা বড় বাঁধ আছে. নৌকা আছে।

আর ডুবে গেলে. কে বাঁচাবেক? আগে বল তুমি জলে ঝাঁপাবেক, আমি যে সাঁতার জানি নাই, কে বাঁচাবেক, বল সখি, রা লিচ্ছনা কেনে!

আলতা হাসতে হাসতে আরও লাল. বেগুনি শেষে মুখে চাকা চাকা লাল রয়ে যেত। সে তরলমতি নয়, আজ বুঝতে পারি সরলমতি। কত বর্ষ, আষাঢ় শ্রাবণ মাঘ জলকষ্ট খরা অতিক্রান্ত, মনে পড়ে। গাছপালার ফাঁকে রোদের আঁকাড়ি, দুটো চারটে বুনো লতা। লতা মুকুলে গোয়াল ঘরের চাল ম ম, সারাক্ষণ ভ্রমরের গুঞ্জন।

আমি বলেছিলুম, বিমল আপনার ছবি আমি বুঝি না, চায়ে চুমুক দিয়ে ক্যানভাসেই নিবিষ্ট। এটা কোন দেশি!

—বোঝার নয়। আমি বোঝাতেও চাইছি না কিছু। বুঝতে পারছেন না একটা প্যারালাল বিশ্ব। যেখানে ভ্রমর গুঞ্জন নেই, বুনো লতা নেই, কাঁচা আম নেই, হরিণ ছানা নেই, ডুরে শাড়ি নেই, মজা দিঘী নেই। যা আছে তা আগে কখনও ছিল না ফলে অসুবিধা হবেই। আপনি একটা জগৎ ছেড়ে অন্য একটায় ঢুকেছেন। আমি পরের পর ওদের সমস্ত এঁকে যাচ্ছি।

বলব ভাবলুম, আপনি কি ঈশ্বর! নতুন জগৎ সাজাচ্ছেন! কি হাস্যকর আপনি

পাগল। বলিনি। বলিনি, আপনি গাঁজাখোর বাহাত্তুরে।
—বুঝতে পারছেননা কেন ছবি আঁকছি! যা দেখছি সব ভাল, সুন্দর ছিল, এখন নেই। বহু ব্যবহারে এখন এতে আঁকার কি থাকতে পারে। কত মুদ্রাতে ন্যাড ধরবেন কিম্বা গম ক্ষেত। ব্যবহারে জীর্ণ। ফলে যত বিদ্রোহ, বিপ্লব, ভাষা আন্দোলন, শ্রমিক অসন্তোষ, জলোচ্ছ্বাস, ব্যাভিচার। আপনি জানেন, এই মিসাইল—এতো একদিন জেগে উঠবেই। দৈত্য বোতলে ঢুকবে না। তখন? আসলে এত প্রাচীন যে এতে নতুনত্ব নেই বলে যারা নতুন ভালবাসে তারা ভেঙে নতুন বানাবে, ঘটনা সামান্য। মিসাইল জরুরী। ভাঙার মিস্ত্রি।

আমি আজও ঠিক বুঝি না। কেবল রাতে সিগারেট শেষ হয়ে গেলে বেরোন হয় না, ভয়ে। ভূতের ভয়। দড়ি গলায় বিমল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোলে সেই পোষা সিয়ামিজ বেড়াল।
—কেমন আছো বিমল? (এখন তুমি বলি)
বিমল বিড়ালটির পিঠে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে, অন্য পৃথিবী।
—তোমার কোন ব্যথা লাগল না, গলায় দড়ি দিতে পারলে?
বিমল দু হাত পল্লবিত করে নাচের মুদ্রা করল, আমি তো অন্য জগতেই যেতে চেয়েছিলুম। আমি তো বিশ্বাস করতুম ঢেলে সাজাতে হবে। যেটাকে দড়ি ভাবছো ওটা ছিল মায়ের বিয়ের বেনারসী শাড়ি। পুরনো জরিতে ভরা। ওটা ফালা ফালা করে বিনুনি ঝুলেছিলুম। দেখ। ঠিক পদ্ম গোখরোর মতো সুন্দর, লতানো। সত্যি সোনালী সুতোর? একি সত্যিকারের সোনার সুতো, না সাপ!
বিমল হাসল—হ্যাঁরে বোকা এক্কেবারে সত্যিকারের, মায়ের।
বেনারসের বিটলভাই-এর বিখ্যাত কাপড়।
জানালা বন্ধ করে দিলুম। লোভ হচ্ছে, মায়ের বেনারসীতে, যা বিবাহে পাওয়া। বিনুনি করে ঝুলে পড়তে ইচ্ছে করছে। সাপের ফাঁসে গলা দিয়ে ঝুলে পড়ি, শেষে অন্য চিত্রকর হয়ে যাব।
জানালা বন্ধ হলে, ঘরে বটু শুয়ে থাকে। গভীর রাতে মজা দীঘির বকের দলে ভরে যায় বটুর অমন মুখশ্রী। হঠাৎ ইচ্ছে করে আদরে গলা জড়িয়ে বলি, বটেশ্বরী চল বেনারসী পাকাই। চল ঝুলি। চল অন্য বিমলের দেশে। রাত শেষ হয়ে যাবে। প্রথম প্রহর যাই যাই। উঠে দেখে এসেছি দেউড়িতে কুকুর কুণ্ডলি হয়ে শুয়ে। ভুলো রাতভোর কেবল ঘুমোয়, পাহারা দেয় না। বড্ড বাচাল অসময়ে চেঁচায়।

হঠাৎ একটা গান মনে পড়ল, সর্বহাবাব শ্রেষ্ঠ গীত। আলতা শুনিয়েছিল। —আমি যে রিক্সাওয়ালা / তুমি কি আমাব হবে / বল গো ও মাধবী / তুমি বড়লোকেব মেয়ে। গানটি বড। পদগুলি সব মনে নেই। ভাল লেগেছিল। সর্বহাবাব গান অনেকই শুনেছি, এ্যাসপ্লানেড ইস্ট থেকে শুরু কবে মাঠ ময়দান। এ জীবনে অনেক দেখা হোল। কিন্তু অমনটি আব কখনও শুনিনি। হৃদয় বিদাবক।

আলতা প্রথম যখন গায় শুনে আমি খুব একচোট হাসলুম। ওব বড়দিদি বলল কিবে জামাই নিয়ে খুব আদিখ্যেতা হচ্ছে। খুব যে। আলতা হাসল। বলল, জামাইকে শুনাচ্ছি ও ব্যাটা আমাব ঘব যায় না। এখন গানেব টানে যদি যায়। বড়দি বলল, টেনে নিয়ে রাখবি কোথায়? ভুবন কি ছাড়বে? ভুবন আলতাব বিয়ে কবা, বাবু।

এই গান যা একদা দুপুরে জামাই ক্ষ্যাপানোব জন্য গাওয়া হয়েছিল, তা পবে রূপ পাল্টে যায়। ভেবে দেখি কোন পলবোবসন নয়, আমাব শোনা শ্রেষ্ঠ সর্বহাবা বেদনাব গান—'বল গো ও মাধবী'। ওব প্রত্যেক ছত্রে ছিল বুবুক্ষু, খবা, প্রতাবণা, বঞ্চনা। একদল মানুষেব সাবলীল বিদ্রোহ। সমাজ সচেতন হয়ে ওঠাব আনুষ্ঠানিক কবোনেসন নয়। হাস্যকব ঐ শব্দ 'সমাজ সচেতন'। পচা, নষ্ট, তঞ্চক। সরল মানুষকে বিব্রত কবার শব্দ, এত দাপট! এত আড়াল ও নিষ্ঠুবতা! এত সাবোতাজ ও নিববচ্ছিন্ন আঁধাব আব অভিধানে নেই। যেমন লোকে সাধু সাজে তেমনি সমাজ সচেতন সাজা, সজঘব, সাবঞ্জাম, দেখতে দেখতে কাঙ্গাল নয়ন অশ্রু ঝবায়। কম বিপ্লবী তো এজন্মে দেখা হোল না। এক একজন মদ মাংস তামাকে আবণ্যবী অভিধান।

আমি জানি, আমি পারবো না। আমি লুকিয়ে বিমলেব পৃথিবীব বাসিন্দা। আমার গলায় বেনাবসীব সোনালী ফেঁসো তৈবী সোনাব হাব। আমি জানি পলবোবসন এ যুগেব ত্রাতা, এহ বাহ্য! আমি জানি আমি সমাজ সচেতন নই, এহ বাহ্য! আমি জানি ঐ আঁধাব দেউব পেবিয়ে মজা দীঘি দীঘিতে শামুকখোল পাখিব আদিগন্ত আঁচড় কেটে এক সকালে স্থিব হয়ে বসা। যেখানে ধীবে একজন ভবঘুরে গান গায় আব প্রাণ গায়—আমি যে রিক্সাওয়ালা তুমি কি আমার হবে, বলগো ও মাধবী তুমি বড়লোকেব মেয়ে। তু—মি—ব—ড়—লো—

পৃথিবীব প্রকৃত সর্বহাবাবা কোনদিনও পলবোবসন ইত্যাদি ক্ল্যাসিকেল বিপ্লবী মূর্ছনা গাইতে শেখেনি। অক্ষবজ্ঞানহীন সেই অন্ত্যজ চোখের জলে গান বেঁধেছিল—

আমি যে রিক্সাওয়ালা। হয়ত এই গানটিই বিমলের কাজে লাগত, ওর দেশের রাষ্ট্রগীতি হতে পারত। আমি অন্য পৃথিবীর আভাস পেয়ে যাই, যেখানে নারীমুক্তির নামে নারী ব্যাভিচার নেই, যেখানে 'পোলেতারিয়েত', 'পোলেতারিয়েত' খেলা নেই, যেখানে রেলরক্ষীর সঙ্গে চাল পাচারকারিনীর কুশল বিনিময় নেই। একটা ঘিনঘিনে, ছিন্ন, উনপাঁজুরে আওয়াজ ক্রমাগত গেয়ে যায় তার দেশের জন্য, (তার দেশ বলতে সে চেনে তার কয়েকটি গাছপালা) রচিত গানগুলি। আমাকে কি মেম্বার ক'রে নেবে?

মেজদি, মানে বটুর মেজদি গান শুনে বলেছিল, বাড়াবাড়ি! দিনে দিনে মেয়েটার রুচি বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে। এসব আমাদের কলকাতায় চ'লে না। কেবল টাকা থাকলেই হয় না, বুঝেছিস বড়দি। রুচি একটা ব্যাপার। যেমন ঘোগের মত একটা ঘ্যাগা বর, তেমনি হয়েছে তার ইস্ত্রি। যেমন দেবা তেমনি দেবী। ভগবান বুঝে বুঝে সব জোড়া তৈরী করে, বুঝেছিস। মেজদি ঝামটে ঘরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছিল।

মেজদির বর ছিল ডাকপিওন। ওকে একবারই দেখেছি, শাশুড়ীর মৃত্যুর সময়। সব থেকে বেশি সময় লাশ কাঁধে রেখেছিল। কবিরাজসুলভ রোগা, ঈষৎ ঝুঁকে পড়া মুন্ডু। রসিকতা খুব জানেন। শ্মশানে গিয়ে অন্য জামাইরা যখন চা বিস্কুট গপ্পে বাইরের গুমটিতে ভিড় করেছিল, একা মেজ জামাই ক্রীয়া-কর্ম সামলে দিয়েছিল। সম্ভবত উনি মুখে নুড়োও দিয়েছিলেন। খুব অনুগত, সাদাসিধে। আমি ওকে বলেছিলুম—মেজদা একবার আমাদের ওখানে ঘুরে যান না। একটু থেমে আমার দেওয়া সিগারেট থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিলেন —সময় পাইনা ভাই। আপিসের পর একটা আয়ুর্বেদিক ফার্মেসীর এজেন্সি আছে, বুঝলে না। পরে জেনেছিলুম, ভাস্কর নুন, স্বর্ণভষ্ম, হরতুকি, আমলা বিক্রি করেন। কোন আয়ুর্বেদিক কোম্পানীকে জটামাংসি, হাতিশুঁড়, কেশুত, ঘৃতকুমারী, কালমেঘ ইত্যাদি যোগান দেন।

নিজে জানতেনও অনেক। আমার ডিমে এলার্জি শুনে বলেছিলেন, তিন খোরাক সর্পগন্ধার সঙ্গে তিন চামচ মধু, রোগমুক্তি। সুর করে সংস্কৃত পড়তে পারতেন। ফলে শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ বাসরে গীতা, মাইক্রোফোনে মেজদা পড়েছিলেন। ঐ একদিন মেজদিকে খুব গর্বিত উজ্জ্বল দেখেছিলুম। স্বহস্তে নির্মিত চবনপ্রাস খেয়ে মেজদা গীতা পড়তে বসেছিলেন। ভয়ংকর অগ্নিবর্ণ সেই সংস্কৃতজ্ঞ ডাকপিওন। উনি আমাকে একদা বলেছিলেন পৃথিবীতে দু ধরণের জীব আছে, আমিষ ও নিরামিষ। যারা আমিষ তাদের কান ছোট, নিরামিষদের কান বড়।

এই থেকে চিনে নিও। কাজে সুবিধে হবে। এতে হয়েছিল কি যে কোন তেমন মানুষের সঙ্গে দেখা হলে, যেমন ইনটারভিউ বোর্ড বা বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি বা বড় ব্যবসায়ী (চাঁদা তুলতে গেছি) প্রথমেই কান লক্ষ্য করতুম। বুঝতে চাইতুম, মাংসাষী না তৃণভোজী। এমন কি লক্ষ্য করেছিলুম আমার প্রেমিকাদের কান দুটি ঈষৎ বড়ই ছিল।

একদিন বললেন.—বুঝলে ভায়া যে সব মেয়েছেলের ছেলেপুলে হয় না আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, অনিবার্য. হাসলেন, ও দেখতে হবে না।

—কি ব্যাপার. হাসলুম, মানুষ সুবিধের নয়তো।

—আরে না না কড়া ওষুধ আছে। এই যে দেখছ তোমার মেজদি, বিয়ের পাঁচ বছর পরে ছেলে দিয়েছে. ও'ক হোত! সব জড়িবুটি।

ডাকপিওনের বৌ আগে কখনও দেখিনি। পরে কখনও না। তবে মেজদা বিশ্লেষণ করেছিলেন, মাংসাষী মানে সিংহ. বাঘ. বেড়াল ইত্যাদি আর গরু. ভেড়া, ছাগল. হরিণ, গাধা, ঘোড়া, হাতি সব তৃণভোজী। বড় কান। আমার পক্ষে কান-বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

একটি উদীয়মান পৃথিবী ঐ হেমলতা আদিনাথের বংশলতিকা। একটি অদ্ভুত গাছ যা ছায়া দেয় আবার কখনও মানুষখেকো হয়ে ওঠে। একটা গাছ যাতে পাখি বসেছিল ব্যঙ্গমা, ডিম পেড়েছিল ঈগল, আকাশে উড়েছিল মহাসারস। কয়লাওয়ালা দাস, বিপ্লবী হারুণ, ডাকপিওন মেজজামাই, একজন ঠিকেদার, একজন সখের গোয়েন্দা, ডাক্তার। এছাড়া কারও কারও দু তিনটে করে ভূমিকা যেমন সামুদ্রিক জ্যোতিষী কিম্বা ভেষজ কারবারী। কম হোল কি?

একদিন বিকেলে সবে আমরা তেলেভাজা মুড়ি শেষ করে চা নিয়ে বসেছি। বটুর সঙ্গে নানা সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছে। হঠাৎ দরজায় টোকা। বটুই খুলতে গেল। খুলেই চেঁচিয়ে উঠল, দেখ কে এসেছে? ততক্ষণে বটুর বোন মালতী ঘরে ঢুকে পড়েছে। একটু অবাক হলুম।

প্রায় বছর সাতেক আগে একবার কাশ্মীরে আমরা দুজনে বরফ ছোঁড়াছুঁড়ি খেলছি তখন শেষবারের জন্য মালতীর সঙ্গে দেখা হয়। আকস্মিক। ওরা পাঁচ ছ' জন, বরফ দেখতে এসেছিল।

চীনার, ম্যাপল, বার্চ গাছের পাতায় বরফের ঝালর। মেঘলা আকাশ। কিছু দূরে আপেল বনে শীত না পছন্দ করা পাখির ডাক। একটু দূরের দৃশ্য দেখা যায় না। বটুর পরনে আমার ছোট হয়ে যাওয়া প্যান্ট-সার্ট। কাশ্মীরে কেনা পশমিনার পুলওভার। মাথায় গোলাপী হলুদ উলের টুপি,

পায়ে লাল কেডস্। তখন বটু নথও পরত।

কিন্তু আজ এমন বিধ্বস্ত, অমার্জিত মালতীকে এত বছর পর দেখব ভাবিনি। এই ভাবনার আর একটি কারণ আছে, ওর সম্বন্ধে কালজয়ী গল্পগুলি। গত সাত আট বছর ধরে শুনে আসছিলুম। এবং যতবার দেখা হয়েছে আলোয়, বর্ণনায়, স্বাস্থ্যে।

এমন কি শাশুড়ীর মৃত্যুতে মালতী আসেনি। চিঠিও লেখেনি। তাছাড়া মায়ের মৃত্যু নিয়ে আর কাকে চিঠি লিখবে! কারণ ওর ভাই ছিল না, বাবা বহুদিন আগে এক শীতের রাতে মারা যান। সেবার অবশ্য সাত বোনই ছিল। সকলে চাঁদা করে পিতৃঋণ শোধ করেছিল।

একদিন রেল অবরোধে মালতীকে শেষবার দেখেছিলুম। আমার টিকিট কাটা ছিল ফৈজাবাদের। স্টেশনে এসে দেখি সব অচল। পুলিশ তখনও এসে পৌঁছয়নি। সেটা মূল্য বৃদ্ধি অথবা জন্মবৃদ্ধির বিরুদ্ধে 'রেল রোকো' মনে নেই। সব অচল দেখে কিছু এগিয়ে গেলে দেখি সারসার নারী পুরুষ লাইনে শুয়ে।

মালতী; তুফান মেলের লোহার রেলে, পাথরে সাতাশ বছরের শরীর। দেখে চমকে উঠি। ওর শুয়ে থাকার ভঙ্গি এত অনায়াস এবং মোলায়েম ছিল যে আমারও শুতে ইচ্ছে করে। তার পাশাপাশি পতাকা ঢাকা আরও কয়েকজন পুরুষ শুয়ে শুয়ে ফুরফুর বিড়ি টানছিল, কিন্তু সেদিন লজ্জা লেগেছে। আশ্চর্য ঐ মাটির সঙ্গে মিশে যাবার আয়োজন। যদি হঠাৎ কোন রাগি ড্রাইভার ট্রেন চালিয়ে দেয়। যদি পুলিশ লাঠি সোটা ঘুরোতে ঘুরোতে উদয় হয়। আমার উচিৎ ছিল ডাব হাতে ওর সঙ্গে দেখা করা। হয়নি। বরং ভিড়ে হারিয়ে যাই।

ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে, এ্যাটাচি হাতে, ওয়াটার বোটল কাঁধে হাঁটছি। চেনা যাচ্ছে না, আমি ট্যুরিস্ট না পথচারী ফেরিওয়ালা না রিপ্রেজেনটেটিভ। চেনা যায় না, আমি কাল এসেছি না আজ। আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যাচ্ছে না। কত কালের? কারণ আজকাল সাফারি স্যুট, সাদা চশমা, চিরুনি ঘড়ি, আংটি, নর্থ স্টার সবাই পরছে। কারণ ব্লোপ্লাস্টের এ্যাটাচি সর্বত্র। প্রত্যেকটা মোড়ে সিগারেটের দোকান, ভাল তামাক পাওয়া যায়। দাড়ি কামাবার ল্যাজার। আফটার শেভের গন্ধে বাতাস চনমনে।

ফলে কে বলে দেবে, আমার স্ত্রী বটু? বটুরা সাত বোন। কোন জন সমর্থন ছাড়াই হাঁটছি।

আলোচনা ঃ ১৯টি ছোট গল্প

এই সংকলনভুক্ত ১৯ জন গল্পকারের গল্পগুলি নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রয়োজনেই বেরিয়ে এসেছে কিছু সৎ মন্তব্য। মূল্যায়ন নয়, লেখকদের শক্তিমত্তা যাচাইয়ের মাপকাঠিও নয়। লেখকদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই এখানের যাবতীয় মন্তব্য।

সাম্প্রতিক বাংলা গল্পের সার্বিক অবয়বের সম্যক ধারণা সুসম্পাদিত কোন গল্প সংকলনে নথিভুক্ত থাকা কোন অত্যাশ্চর্য ঘটনা নয়। গল্প সংকলন পারিপার্শ্বিক গল্প আন্দোলনের চেহারাটাকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতদুষ্ট নয় এমন সংকলনে বাংলা গল্পের সামগ্রিক চেহারাটা এক নজরে ধরা পড়বে, যা ছোট্ট একটি মানচিত্রের মধ্যে বিরাট একটি দেশের অবস্থানের মতন।

এই গল্প সংকলন ১৯ জন গল্পকারের মননসমৃদ্ধ লেখায় সমৃদ্ধ যেখানে গল্পের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজেরই। মহাশ্বেতা দেবী থেকে শুরু করে অনিন্দ্য ভট্টাচার্য—এঁরা প্রত্যেকেই বিকৃত সমাজ জীবন, ধোঁয়াশা অন্ধকারময় জীবনযাপন, শোষণ অন্ত্যজ অথবা মধ্যবিত্ত মানুষের সজীব নিঃশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের লেখায়। এঁদের গল্প প্রথাচলিত বা বাজারচলিত আদৌ নয়; জীবনরসে জারিত সূক্ষ্ম অনুভূতিময় হৃদয়ালেখ্য।

যাঁদের লেখায় এই গল্প সংকলন সমৃদ্ধ এবং গৌরবান্বিত, মোটামুটি তিন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে তাঁদের। সংশয় নেই, মহাশ্বেতা দেবী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, উদয়ন ঘোষ গল্পভূমিতে স্ব-স্ব অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত, শুধু প্রতিষ্ঠিত নয়—বিতর্কিত, আলোচিত ও সমালোচিত। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, সহানুভূতি, মানবিক অবক্ষয় এবং শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ, গ্রাম্য জনজীবনের নানাবিধ সমস্যার নিখুঁত চিত্রণ তাঁদের লেখাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। সত্তরের মাঝামাঝি থেকে অভিজিৎ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমর মিত্র, নলিনী বেরা, সমীরণ দাস, সৈকত রক্ষিত,

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী প্রমুখরা ধারাবাহিক বাংলা গল্পের ক্ষীণ-শরীরে নতুন রক্ত সঞ্চালনে যৌবনের স্নিগ্ধ হাওয়া বইয়ে দিলেন যা আদপে গতানুগতিক নয় বরং নতুন চিন্তা-ভাবনার আলোকে আলোকিত। এ'দের লেখায় বিষয় বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। শুধু জীবন নয়, আশপাশের বিভিন্ন সংঘাত-দ্বন্দ্বকে এ'রা বিশ্লেষণ করে দেখালেন, বোঝালেন, এতদিনের চেনা জীবনের অ-সুখ, ভণিতা ও বিশ্বাসহীনতা। এ'দের লেখা বিভিন্নখাতে বহমান হলেও তার সংগমস্থল একই। আলাদা আলাদা করে চেনা যায় এ'দের লেখক সত্বাকে, হৃদয়ের আর্তি এবং আবেদনকে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রিতম মুখোপাধ্যায় অনিল ঘড়াই অনিন্দ্য ভট্টাচার্য উধর্বেন্দু দাশ বা নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়— এ'রা প্রত্যেকেই আশির দশকের গল্পকার হিসাবে সমধিক পরিচিত। উধর্বেন্দু দাশ মূলতঃ সত্তরের কবি, গল্পে তাঁর আগমন নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নীলাঞ্জন উধর্বেন্দু বা অনিন্দ্য এ'রা আশির মাঝামাঝি সময় থেকে লিখতে শুরু করেছেন, এ'দের কোন গল্প সংকলন নেই। স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রিতম মুখোপাধ্যায় বা অনিল ঘড়াই এ'রা লেখনীর নিজস্বতায় বাংলা গল্পে নিজেদের জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়েছেন, বলা বাহুল্য—এ'দের লেখা বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। হয়ত সত্তরের লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে থেমেছিল সেখান থেকেই এ'দের লেখার শুরু বা সূচনা। এ'দের লেখায় গ্রাম শহর স্বাভাবিকভাবে এসেছে, বিশ্বাসহীনতার অপবাদ এ'দের গল্পে নেই। প্রথাচলিত বাজারী লেখকদের থেকে এ'দের লেখা সাহিত্য গুণগত দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ঐতিহ্যবাহী।

সংকলিত বেশির ভাগ গল্পেই যে বিভিন্ন জীবিকার মানুষ এসেছে তাদের ষাট শতাংশই অন্ত্যজশ্রেণীভুক্ত। মধ্যবিত্তের ছায়াপাত তেমনভাবে এ'দের লেখায় জায়গা করে নিতে পারেনি। তাছাড়া ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির কোন ছায়াপাত ঘটেনি এ'দের লেখায়। বিভিন্ন চরিত্ররা ভিড় করে এসেছে কিন্তু চরিত্রের ভিড়ে লেখকদের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর। ব্যক্তি জীবনকে বাদ দিয়ে লেখকের কলম অন্য জীবনের সন্ধানে সতত ক্রিয়াশীল যে জীবন অনেকাংশে আরোপিত এবং বাহুল্য দোষে দোষণীয়। অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ গল্প, জীবন সমৃদ্ধ গল্পের কাছাকাছি যেতে পারেনি। বিগত কুড়ি বছরে মধ্যবিত্তজীবন সাহিত্য থেকে লাজুক পায়ে অপসৃয়মান। অথচ, মধ্যবিত্তজীবনেই ঘটে চলেছে একের পর এক উত্থান-পতন, অবক্ষয় বা রাজনৈতিক আন্দোলন। বিপন্ন মধ্যবিত্ত জীবনবোধ সমকালীন লেখকদের লেখায় কেন উপেক্ষিত? গ্রাম-গঞ্জের গল্প লিখলেই

'প্রগ্রেসিভ রাইটার' হওয়া যায় এমন বোধ কি তরুণ লেখকদের আচ্ছন্ন করছে?

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'ভাতুয়া' গল্পে শ্রমহরণ বা শ্রমশোষণের কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা 'বণ্ডেড লেবার প্রথার' পুনরাবৃত্তি, এই গ্রাম-বাংলায়, হ্যাঁ—আমাদের এই চেনা গ্রাম বাংলায় আজও চোরা স্রোতের মত বহমান। আমাদের শিক্ষিত শহুরে বোধকে ভাবিয়ে তুলবে তাঁর 'ভাতুয়া'। মহাশ্বেতার গল্পে সর্বদা যে পজিটিভ রিয়্যাকশন থাকে 'ভাতুয়া'তেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে পাঠক সংস্কার এবং গ্রাম্যতার পাশাপাশি পরিমার্জিত একটি চিন্তা ভাবনার সাথে পরিচিত হতে পারবেন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এ গল্পের উপজীব্য হলেও শোষক এবং শোষিত-এর বিরুদ্ধে জেহাদ এ গল্পে তীব্রতা লাভ করেছে।

'উদ্বাস্তু' গল্পে **অমিয়ভূষণ** উৎখাত সময়ের ইতিহাস নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে গদ্য গল্প শরীরের অলংকার অহংকার। ভিটেবাড়িচ্যুত মানুষগুলো শিকড় উপড়ান গাছের দুঃখ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে কলকাতার ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের দুর্বিসহ মানসিক যন্ত্রণা এ গল্পে ধৈর্যের তাঁতশালে বোনা নিখুঁত কাপড়ের মত সুন্দর। ভূমিপুত্রদের ভূমি হারানর গল্প 'উদ্বাস্তু'।

'একটি পরিমার্জিত অভারতীয় গল্প'-এ **উদয়ন ঘোষ** মধ্যবিত্ত জীবনের ফাটলটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর এ দেখায় কোন ফাঁকি নেই। ভারতীয় মাতৃত্ব সন্তান বা নিকট আত্মীয়'র অবহেলায় যে গুমরে কাঁদে তারই নিষ্করুণ প্রতিফলন পরিমার্জিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। লেখকের সাবলীল গদ্য গল্প পাঠের চিরন্তন ধারাটিকে অম্লান রেখেছে।

সত্তর দশকের **অভিজিৎ সেন** বাংলা গল্পের মৌসুমী হাওয়ায় প্রশাসনের কারচুপি নগ্নতা বৈষম্য, প্রতিবাদ সব কিছুকেই পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে। **তপন বন্দ্যোপাধ্যায়** নিপুণভাবে তুলে ধরেন ইটভাটার শ্রমিক জীবনের চরম বাস্তব পরিস্থিতি। বেঁচে থাকার বদলে নরক ভোগের কাহিনী। শোষণের দু'মুখো সাপ এবং তার ছোবল 'স্লো পয়জন'-এর মত কাজ করে তপনের গল্পে। চেনা পৃথিবীটা যে এত নোংরামীতে ভরে উঠেছে তপনের গল্প না পড়লে জানা যায় না। **নলিনী বেরা** 'কুসুমতলা' গল্পে তুলে ধরেন তার হারান কৈশোর, যা বাস্তবতাকে ছাপিয়ে কখনো সৌখিন মজদুরী হয়ে যায় না। নলিনীর বড় গুণ তার গদ্যের সরলতা, বাক্য বিন্যাসের

চিন্তা-ভাবনা। গ্রামীণ অলিখিত শব্দে তাঁর পটুত্ব অনস্বীকার্য। তবে একথা বলা হয়ত শোভনীয়, নলিনী বেরার 'কুসুমতলা'র চেয়েও উৎকৃষ্ট মানের গল্প ইতিমধ্যে নজরে পড়েছে, যা নলিনীর সাহিত্য সম্মানকে বাড়িয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গল্পটি সংকলন যোগ্য কিনা তা নলিনী বেরার একবার ভেবে দেখা উচিত। লেখকের দায়বদ্ধতা লেখকের কাছে—যেখানে সম্পাদকের কিছু করার থাকে না, সম্পাদক সেখানে নিরপেক্ষ অসহায়।

অভিজিৎ সেনের 'আপস' গল্পে নৈতিকতা এবং আদর্শের মৃত্যু বা অধঃপতন ভয়াবহভাবে ফুটে ওঠেনি যা তার অন্যান্য লেখায় উদ্দীপ্ত। তেমনি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'দাহ' গল্পের শেষ রক্ষা করতে পারেননি। যদিও তাঁর গল্প বলার কায়দা সহজ সরল। টাচি গদ্য তাঁর আয়ত্বে। কিন্তু গল্পের অন্তিম বাস্তবতা নিয়ে লেখক আরো সতর্ক হলে পাঠক একটা ভাল গল্পের আস্বাদন পেতেন। *ভগীরথ মিশ্রের* 'মায়ের জন্য'-এ চিৎবাঙর ডাঙ্গায় সেই খেজুর গাছটার মত ধু-ধু কাঁকুরে ডাঙ্গার কাহিনী। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ভগীরথ মিশ্র যেন বরাবরের খুঁতখুঁতে তা তাঁর গল্প পড়লেই বোঝা যায়। ইদানীং গল্পের ফর্ম নিয়ে তিনি বেশ ভাবিত। এ ভাবনা তাঁকে কোন দিকে ঠেলে দেবে এ নিয়ে আমরাও বিশেষ-ভাবে ভাবিত। শোষণ-এর বহুমুখী প্রকাশ ভগীরথ মিশ্রের গল্পে ঘুরে ফিরে আসলেও 'মায়ের জন্য'-এ তা অন্যরকমভাবে ধরা পড়েছে। আঞ্চলিক ভাষার সুষম প্রয়োগ, গদ্য ভাষার সাবলীল ঢেউ উপমার উপযুক্ত প্রয়োগ তাঁর গল্পের সম্পদ। সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের গল্প ভগীরথ মিশ্রের বলিষ্ঠ লেখনীতে অসাধারণ হয়ে উঠেছে, এটাই লক্ষ্যণীয়।

'রুণা ও একটি অসমাপ্ত লিরিক'-এ কবি *উৎপলেন্দু দাশ* সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তদের জটিল জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দেখায় ফাঁকি নেই, লেখাতেও তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যিক গদ্য এ গল্পে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। এটা সুখের কথা।

'কাঁচা সোনায় সুন্দরবাবুর বাগানে' *অজিতেশ ভট্টাচার্য*-এর গল্প। শহর আর গ্রামের পরিবেশগত বৈষম্যই এ গল্পের মূল উপাদান হলেও শহুরে জীবনযাত্রায় হাঁপিয়ে ওঠা এক যুবকের আত্ম অনুসন্ধান পাঠককে ভাবাবে।

সত্তর দশকের আর এক বিশিষ্ট গল্পকার *অমর মিত্র* তার 'খুঁটি ছিল না' গল্পে নারীমনের অসহায়তাকে ব্যক্ত করেন ঠাস বুনোট কাহিনীর মধ্য দিয়ে।

পটভূমি গ্রাম হলেও অমর মিত্রের লেখায় ৮০-র দশকের ক্ষয়প্রাপ্ত গ্রামের হালফিল চিত্রটি বেশ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। লেখকের বক্তব্য, চরিত্রচিত্রণ মোটা দাগের নয়, যার জন্য সাধারণ ঘটনাও বিশেষভাবে আন্দোলিত করে পাঠক মনকে।

সৈকত রক্ষিত এই সময়ের একজন শক্তিমান গল্পকার। তাঁর লেখায় গ্রাম সবুজ শ্যাওলার গন্ধ নিয়ে উঠে আসে. শাল-মহুয়া লাল পাথুরে মাটি তাঁর গল্পকে মেজাজ এনে দেয় যা ইদানীং অনেকের লেখায় ধরা পড়ে না এত আন্তরিকভাবে। তাঁর আকিশ' গল্পে এমন এক বিচিত্র পেশার মানুষের কথা আছে যাদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কমই লেখা হয়েছে। আর লেখা হলেও তা এমনভাবে, এত জীবনঘনিষ্ঠভাবে লেখা হয়েছে কি?

সুতীর্থ রায় ওরফে *সমীরণ দাস* মূলতঃ নাগরিক মানসিকতার লেখক। মধ্যবিত্ত জীবন বিশ্লেষণ তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেলেও 'হাও' গল্পে সাম্প্রতিক সময়ের উষ্ণ দুই যুবকের মানসিক দ্বন্দ্বই প্রকট হয়ে উঠেছে যারা জীবন এবং সততা সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল। গল্পের স্বার্থে টুকরো টুকরো ঘটনার বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন অযাচিত বা অপ্রাসংগিক নয় বরং আকর্ষণীয়।

'আকাশকোঠা' গল্পে *ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়* এমন সব মানুষদের ছবি এঁকেছেন যারা জীবন এবং জীবিকার জন্য নিরন্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন, তাদের চব্বিশ ঘণ্টার লড়াই, বিপন্ন অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখার লড়াই। কালী-তারা বা রাসবিহারী—এরা কেউই আমাদের অপরিচিত নন। চেনা চৌহদ্দির মধ্য থেকে উঠে আসা এমন সব নির্ভেজাল খেটে খাওয়া মানুষেরা ঝড়েশ্বরের গল্পে রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আশির দশকের শুরুতেই *স্বপ্নময় চক্রবর্তী* প্রিতম মুখোপাধ্যায় অনিল ঘড়াই বাংলা গল্পে গ্রাম-শহর, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত শুধু তাই নয়—বিভিন্ন পেশার মানুষকে খুব সহজভাবে নিয়ে এলেন যাঁদের উপস্থিতিতে আপাতসমৃদ্ধ হ'ল বাংলা গল্প। স্বপ্নময়ের গল্পে গ্রাম এবং শহর দুই ই বর্তমান কিন্তু তারা কখনো আরোপিত নয় বরং বলা যায় অভিজ্ঞতার আলোকধারায় স্নাত। স্বপ্নময়-এর 'বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর!' অন্য স্বাদের লেখা হলেও প্রশাসন এবং তার ভণিতা সেই সঙ্গে পুলিশী ঔদাসীন্য তীব্রতা লাভ করেছে।

'মুগনি পাথর' গল্পে *অনিল ঘড়াই* অনায়াস দক্ষতায় সাহিত্যময় করে তুলেছেন অন্ত্যজ শ্রেণীর সেই সব মানুষদের যারা 'হাট ঝাঁটায়' 'ছাচুন' বেচে জীবিকার জন্য, মনুষ্যত্ববোধে এখনো উদ্দীপ্ত। তাঁর গল্পের ভাষা

সম্পূর্ণ নিজস্ব। গ্রামীণ জন-জীবনের নিখুঁত কথোপকথন এবং বর্ণনা মুগীন পাথর' -এর ঔজ্জ্বল্য এবং সম্মান বাড়িয়েছে। **প্রিতম মুখোপাধ্যায়** সেই স্বতন্ত্র ধারার লেখক যাঁর লেখার সাথে বর্তমান সময়ের অন্যান্য লেখকের দূরত্ব অনেকখানি। বিষয় বৈচিত্র্যে এবং অভিনবত্বে প্রিতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর 'গন্ধপোকা' গল্পে নিষ্ঠুর সময়ের যুব সম্প্রদায়ের মানসিক ভারসাম্যহীনতা, অবিশ্বাস এবং আত্মগ্লানির কথা আছে। 'গন্ধপোকা' নেগেটিভ অ্যাকটিভিটির গল্প হলেও সময়ের বিপজ্জনক স্রোতে এর যুযুধান মূল্যায়ন নিতান্ত কম নয়।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং অনিন্দ্য ভট্টাচার্য আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গল্প লেখায় নিমগ্ন হন। নীলাঞ্জন তাঁর 'ফাইল' গল্পে প্রশাসনের ভয়াবহ মুখোশকে খুলে জনসমক্ষে উদ্‌ভাসিত করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। **অনিন্দ্য ভট্টাচার্য** 'খড়ের মানুষ' গল্পে গ্রামীণ অর্থনৈতিক আক্ষায় বিপর্যস্ত মানুষদের বেঁচে থাকার কাহিনী শুনিয়েছেন।

কমল চক্রবর্তী 'বটুবা সাত বোন এবং আমি' গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের স্বরূপ নির্ণয়ে এগিয়েছেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই যে লেখক শিল্পী সৃষ্টি হন তার জন্য যে মননশীলতা ও দুর্নিবার জয়ের আকাঙ্ক্ষা এসব কিছুই কাব্যময় ভঙ্গীতে কবি কমল উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে। এ গল্পে কমলের চনমনে রৌদ্র স্নিগ্ধ ভাষা বাড়তি আকর্ষণ। মানুষের বিপন্ন অস্তিত্ব এ গল্পের বিষয় হলেও দুর্গত মধ্যবিত্ত জীবনের অন্ধকার ছাপিয়ে ভাবী সময়ের নির্ভীক পদচারণা রীতিমত ইংগিতবহ।

এই সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন মেজাজ এবং মানসিকতার একথা বলা বাহুল্য। প্রায় সব গল্পেই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সততা আছে এবং সাধারণ মানুষই এই সব গল্পের মুখ্য চরিত্র। যেহেতু সংকলনভুক্ত একটিমাত্র গল্প দিয়ে লেখকের সাহিত্য বলয়ের সামগ্রিক পরিচয় জানা সম্ভব নয় সেইজন্য এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক লেখার অবতারণা। এমন নয় যে উল্লেখিত মন্তব্যগুলিই চূড়ান্ত যে কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তনশীল এবং সংশোধনযোগ্য। পাঠকের মতামতই আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।

সম্পাদক

অনুকথন : বাংলা ছোটোগল্পের জন্য

বীতশোক ভট্টাচার্য

....

ছোটোগল্পের সঙ্গে কবিতার তুলনা দেওয়া হয়, বাংলা গল্পের কথায় তাই কবিতার কথা এসে পড়ে। বাংলা কবিতার ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো, বাংলা গল্পের ইতিহাস একশো বছরের। অনেক বেশিদিন ধরে অনেক বেশিরকম কবিতা বাংলায় লেখা হয়েছে, গাওয়া হয়েছে, পড়া হয়েছে শোনা হয়েছে, বাংলা গল্পের তেমন কিছু সার্বিক লেখক ও পাঠক নেই। বাংলা গদ্যেরই বয়স কমবেশি দুশো বছর, তার ভিতর বাংলা গল্প ধবে বা ভাবে তেমন কাটে না। পরিমাণ যদি গুণ পালটায় তাহলে বলতে হবে বাংলা কবিতা অনেক বেশি পালটেছে, বাংলা গল্পে সেই তুলনায় খুব একটা কিছু বদল ঘটেনি। বাংলা গল্পের সঙ্গে তাই বাংলা কবিতার তুলনা না দেওয়াই ভালো।

অনেকে বলবেন বাংলা গল্প এখন অনেক বেশি লেখা ও পড়া হয়, আর অনেক বেশি গল্প লেখা মানে অনেক বেশি ভালো গল্প লেখা। ইস্কুল কলেজের পত্রিকা থেকে ছেলেমেয়েরা গল্প বেছে আগে পড়ে, আর কিছু না পড়ে শুধু গল্প পড়ে পাতা উলটে বা না উলটে রেখে দেয় হয়তো। ধারাবাহিক কোনো উপন্যাস, আস্ত কোনো উপন্যাস, থাকে না বলেই গল্প পড়ে, গুড়ে মধুর অভাব মেটায়। বয়সি পাঠক রবিবারের কাগজ খুলে আগে ধারাবাহিক লেখা পড়েন, চলছে চলবে উপন্যাসের জের টানতে তাঁদের ভালো লাগে, গল্প পড়ে ওঠা তত ভালো লাগে না। উপন্যাসের কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই, গল্প সেখানে অসহায় নিরুপায়। রবীন্দ্রনাথ যখন সাধনা হিতবাদী কাগজে গল্প লিখেছেন তখনো বাঙালি পাঠক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনীকে অনেক বেশি কদর করতেন, এখনো তাই করে থাকেন। গল্পের বই প্রকাশকরা প্রকাশ করতে চান না, পাঠকরা পড়তে চান না এই শাদা কথায় অনেক ছোটোগল্প প্রেমিকের মুখ কালো হয়ে যাবে। তবু উপন্যাস, ছোটো উপন্যাসও বাঙালি লেখক পাঠক ক্রেতা বিক্রেতার কাছে অনেক বেশি দর ও আদর পায় একথা মিথ্যা নয়।

বাংলায় অনেক বেশি ভালো গল্প লেখা হয়ে চলেছে, এ এক কল্পকথা মনে হয়। একটা সরল অঙ্ক করা যায়। ক একটা নামজাদা কাগজ, ভালো বিজ্ঞাপন আছে তাই তা ভালো কাগজ ফি হপ্তায় বার হয়। আর এই কাগজের প্রতি সংখ্যায় একটি করে গল্প ছাপা হয়। বছরে গড়ে পঞ্চাশটি গল্প ছাপা হলে এক দশকে এই কাগজে পাঁচশো নতুন গল্প ছাপা হয়। কিন্তু

এই এক দশক সত্যিকার ভালো পাঁচটি গল্প বা পঁচজন প্রকৃত ভালো গল্পকার দিতে পারে না। কাগজে গল্প ছাপা হয়, ছাপা হয়, ছাপা হয়, ছাপা হয়ে শুয়োবের মাংস হয়ে যায়। এর ভেতর গল্প লিখে যাওয়া, গল্পের পত্রিকা বার করা শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের কাজ। কিন্তু ভালো গল্প লেখা হয় কিনা, ভালো গল্পের পত্রিকা বার হয় কিনা, পাঠকরা তা কেনেন ও পড়েন কিনা এসব প্রশ্ন থেকে যায়।

বাংলায় ইংরেজির নকল না করে গল্পবললেই হয়, ছোটোগল্প বলতে হয় না। ছোটোগল্প যে বাংলায় কম লেখা হয়, প্রায় লেখা হয় না এই অভিযোগ তাহলে আর কাটিয়ে ওঠার দরকার পড়ে না। বাংলায় গল্প লেখা হয়, ছোটোগল্প লেখা হয় না। জাপানিরা কমিয়ে বলতে ভালোবাসে, বাঙালি বাড়িয়ে বলতে। ছোটোগল্পের আঁটোসাঁটো গড়নে আমাদের লেখকের কালঘাম ছোটে, আমাদের পাঠকের দম বন্ধ হয়ে যায়। ছোটোও হবে আবার গল্পও হবে এক সঙ্গে দুধ ও তামাকের এ ফরমাশে আমরা স্বস্তি বোধ করি না। টানটান আবেগের সঙ্গে মথিত সংযম মিশিয়ে যে ছোটোগল্প বানানো যায় এখবর অনেক বাঙালি গল্পকাবের অজানা। ছোটোগল্পের প্রকরণ বিষয়ে অজ্ঞানতা ও বিমুখতার জন্য গল্পকারদের রচনার একটা মস্ত বড়ো অংশ গল্প হয়ে যায়, ছোটোগল্প হয় না।

সুন্দর করে বলতে হবে, এই নান্দনিক দাবি ছোটোগল্পের, এখানে কবিতার সঙ্গে ছোটোগল্পের মিল। অথচ ছোটোগল্পের এই অবশ্যমান্য শর্ত বাংলা গল্পলেখকরা জানেন না, জানলে মানেন না বলতে হয়। রূপদক্ষতা হালের বাংলা কবিতায় কতখানি বজায় আছে, এখানে সে প্রশ্নের মীমাংসার জায়গা নেই। কিন্তু বাংলা ছোটোগল্প যে রূপদক্ষতার লক্ষণে দীন, রূপকরণের বিমুখতা যে বাংলা গল্পের বৈশিষ্ট্য, সে কথা বলতে বাধ্য হতে হয়। আর এখানে, এইখানে কবিতার সঙ্গে বাংলা গল্পের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তথাকথিত শাস্ত্রবিরোধী বাংলা গল্পকারের মিলও কবির সঙ্গে নয়, মোরাভিয়ার মতো বাস্তববাদী লেখকের সাম্প্রতিক গল্পের সঙ্গে।

কবিতার মতো ছোটোগল্পও নানা ধরণের হতে পারে, হয়। ওভার-কোটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা রুশ ছোটোগল্প স্বভাবে ঢিলেঢোলা। শলোকভ, তারাশঙ্কর, লরেন্সরা বড়ো ছোটোগল্প লিখেছেন, সেসব ছোটোগল্প হয়নি একথা বড়ো মুখ করে বলার কথা নয়। তাঁদের বড়ো ছোটোগল্পের মধ্যেও সেই মুনশিয়ানা আছে যা তাঁদের ছোটো ছোটোগল্পেরও ধরণ। এ সংকলনে

তেমন বড়ো ছোটোগল্প নেই, একেবারে খুব ছোটো ছোটোগল্পেরও দেখা মিলবে না। যা আছে তা শুধু গল্প। অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটোগল্পটি এখানে সবার থেকে আলাদা। উদ্বাস্তু-সমস্যা অমিয়ভূষণের বেশ কিছু গল্পের প্রসঙ্গ, নির্বাস উপন্যাসেও তিনি এই বিষয়ে লিখেছেন। পাঞ্জাবি বা জর্মান ছোটোগল্পের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় দেশভাগের সমস্যা নিয়ে লেখা বাংলা গল্প, বাঙালির গল্প নেই বললেই চলে। বাংলায় এরকম হওয়াই স্বাভাবিক, সেদিক দিয়ে অমিয়ভূষণের গল্পটি অস্বাভাবিক বলতে হবে। এখনই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সময় নয়, তার আগে বলা দরকার রূপদক্ষতার নিরিখে এটি এ সংকলনের সবচেয়ে উৎরে যাওয়া গল্প। উদ্বাস্তু একটা নভেলেটের অংশ, একথা জানার পরে লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। বোঝা যায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পায়াস আছে তাঁর রচনায়, দরকারে চারটে গল্প জুড়ে তিনি একটা উপন্যাস বানাতে পারেন, প্রয়োজনে একটা নভেলেট ভেঙে তিনি চারটে গল্প বার করে আনতে জানেন। বক্তব্য যত প্রচ্ছন্ন, অভিঘাত তত অমোঘ, এঙ্গেলসের একথা অমিয়ভূষণের গল্প এখনকার পাঠকদের ও লেখকদের নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গ আর রচনাপদ্ধতি তাঁর ছোটো-গল্পে কখনো আলাদা নয়, জলে ডুবিয়ে তুলে নেওয়া গনগনে দা-এর মতো তাঁর গল্প একই সঙ্গে শীতল ও শানিত। এখনকার গুচ্ছ গুচ্ছ গল্পের ভিড়ে অমিয়ভূষণের রচনাকে যথার্থ ছোটোগল্প বলতে হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর ভাতুয়া গল্পের কথা মনে রেখেই একথা বলা। শিল্পী এবং নাগরিক হিশেবে মহাশ্বেতার গদ্যের দুটি মাত্রা আছে। দুটি মাত্রাই সফলতার সূচক ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু মহাশ্বেতার রচনায় এ দুটি মাত্রা আগে পরের দুটি আলাদা পর্যায়, খুব কম জায়গাতেই এখন এ দুটি মাত্রা মিশে যায়, তাঁর লেখায় তাই আজ তৃতীয় আয়তন পাওয়া যায় না। জীবন এখন সমস্তের ঘোলা স্রোতে আবিল, অন্তঃশীলা শিল্পকারুর সময় কোথায়, এই যেন তাঁর হালের বাহানা। ভাতুয়া গল্পে যথারীতি এই আধো-সামন্ততান্ত্রিক আধো-ঔপনিবেশিক দেশের এক নিষিদ্ধ দক্ষিণ দরজা খুলে দেন, আমরা দেখি বনডেড লেবার বাংলায় নামে না থাকলেও কাজে আছেন। এতে মহাশ্বেতা অবাক হন, পাঠক অবাক হন, ভাতুয়া গল্পের রাজনৈতিক চরিত্রটি অবাক হন। এই বিস্ময় রোম্যানটিক মনে হয়। সেই সঙ্গে মনে হয়, এতে অবাক হওয়া উচিত নয়, কারণ এদেশে এটাই স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের ছবির মতো আমাদের দুঃস্বপ্নের দেশ লাল কালোর এক সুষম গাঢ়তা

চায়। তার বদলে মহাশ্বেতা তাঁর গল্পের পর গল্পে একই জিনিস ভরে দেন : সেই কাটাকাটা বাক্যবন্ধ, আঞ্চলিকতা ও ইংরেজি শব্দের মিশোল, টাইপ শোষক টাইপ শোষিত ও টাইপ পরিত্রাতার ভূমিকা এবং শেষে আরোপিত আশাবাদ, ব্যক্তিগত বীরত্বের বাহাদুরি। অন্ধ ভাতুয়া শেষে জোতদারের টালের ধান নষ্ট করে, মহাশ্বেতার লেখার স্লটমেশিন থেকে গল্পের এই নমুনা বেরিয়ে আসে, যাত্রার এই নমুনা। স্টাকাটো বাক্যবন্ধে আপত্তি নেই, তা যেন হেমিংওয়ের সাংবাদিকসুলভ অথচ বহুবার পরিশোধিত গদ্য হয়। টাইপ চরিত্রে আপত্তি নেই, তা যেন গর্কি'র লেখায় যেমন তেমনি শ্রেণীচরিত্রের নির্যাস হয়। ব্যক্তিগত বীরত্বে আপত্তি নেই, তা যেন ব্যক্তির প্রাত্যহিক বাস্তবিক শৌর্য'র অন্য নাম হয়। হায়, মহাশ্বেতার গল্পে তা আর হয় না, যা হয় তা স্বাদু বিপ্লববিলাসে পর্যবসিত হয়। ফলে পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মহাশ্বেতা দেবীর গল্প লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক গল্পের মতো মায়াবী বাস্তবতার এক অন্য ভুবন সৃষ্টি করতে পারে না, আমরা সে গল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের দীনতা, যন্ত্রণা ও স্বপ্নকে তালগোল পাকানো সত্যতর বস্তুরূপে চিনতে জানতে পারি না। মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে অভিযোগ সবচেয়ে বেশি, কারণ এই সময় তাঁর কাছ থেকে পাওয়ার আশা সবচেয়ে বেশি।

মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে অভিযোগ সবচেয়ে বেশি, কারণ এই সময় তাঁর অনুগামী গল্পকারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। গল্প লেখার একটা নতুন ঘরানা তিনি তৈরি করেছেন, তাঁর গল্পের ভাব ও রূপের প্রত্যক্ষ অনুসরণে পরোক্ষ ছায়ায় গত এক দশক ধ'রে অজস্র অজস্র গল্প লেখা হয়ে চলেছে—তেমনি বিকলাঙ্গ, তেমনি সোচ্চার, তেমনি ব্যর্থ। দক্ষিণ ও বাম দুটি সমান্তরাল ও শেষ পর্যন্ত সংলগ্ন গল্প লেখার ধারা থেকে সরে এসেছেন এই গল্পকারদল, একটি তৃতীয় ধারা তৈরী করেছেন, করছেন, এটি একটি ব্যর্থতার খোঁড়া অজুহাত। বাংলা ভাষা ও ছোটোগল্পের ভাষা সম্পর্কে তাঁদের অসচেতনতা কেবলই একতাল শব্দপিণ্ড তৈরি করছে; এ আঘাত দেয়, অভিঘাত আনে না। ফলে এ সংকলনের বেশ কিছু গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় প্রতিধ্বনি মহাশ্বেতার ধ্বনিটিকে ব্যঙ্গ করছে, আঞ্চলিক শব্দের বিদ্যুৎচ্ছটায় শূন্যের প্রান্তরে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু কোনো এগিয়ে দেওয়া আলো আসছে না। এই চীৎকারের সময়, উচ্চকিত হয়ে ওঠার সময় অসীম রায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঊনকথন ন্যূনকথন খুব বেশি করে মনে পড়ে।

রূপকরণের প্রতি বিরূপতা কোনো আলাদা ঘটনা নয়। এটি গল্পকারদের

নিজস্ব শ্রেণীবিমুখতার অন্য নাম। বিগত এক দশক ধরে বাংলা গল্পের ক্ষেত্র নির্বাচনে একটি স্পষ্ট পরিবর্তনের ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলার প্রগতি সাহিত্য একসময় বাংলা গল্পের পরিসর বাড়ানোর আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মজদুরের শৌখিনতা বাংলা সাহিত্যে এখনকার মতো আর কখনো এমন অশালীনভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর নিরন্ন নগ্ন একথা সত্য, মহাশ্বেতা এবং সম্প্রদায়ের গল্প কখনো তাঁরা পড়তে পারবেন না একথাও সত্য, তার চেয়েও একথা বেশি সত্য যে তাঁদের গল্প এই মধ্যশ্রেণীর মানুষদেরই লিখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ শাস্তি ছোটো গল্পটি লেখার দায় অনুভব করেছিলেন, চন্দরাদের জানার দীনতা তিনি সংকল্প দিয়ে অনেকখানি পূরণ করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ সবার কর্ম নয়। যে ছোটোগল্প শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণীর প্রতীতির সমগ্রতা সঞ্চারিত ক'রে দিতে চায় সে হবে কুঁড়ে ও কারখানা থেকে উঠে আসা গল্প, ফান গো যেমন খনি শ্রমিকদের মধ্যে থাকার পর খনি শ্রমিকদের ছবি আঁকেন, কৃষক পরিবারের মধ্যে থাকার পর কৃষক পরিবারের ছবি। এখনকার বাংলা গল্পে প্রতীতির এই সমগ্রতার সবচেয়ে বেশি অভাব। লেখক স্বাভাবিকভাবে কলকাতামনস্ক, লেখা যদি তাঁর পেশা হয় তাহলে বাণিজ্যরাজধানীমনস্ক না হয়ে তাঁর উপায় নেই, গাঁ গঞ্জ মফস্বলের গল্প লিখলেও তিনি আসলে কলকাতার গল্পই লেখেন। সে গল্প প্রায়ই মানবপ্রকৃতি থেকে উঠে আসে না নিসর্গপ্রকৃতি থেকে উঠে আসে না। সমরেশ বসুর মতো বিচিত্র ও উৎসারিত অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য না থাকলে এসব গল্প লেখা যাবে কেমন করে।

সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াই এবং ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা রাঢ়ের মানুষ ভাটির মানুষদের সঙ্গে আমাদের নতুন করে আন্তরিক পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। এঁদের সততায় অবিশ্বাসের কারণ নেই, কিন্তু কেবল আন্তরিকতায় ছোটোগল্পের চিঁড়ে ভেজে না। মোপাসাঁর গল্পের প্রসঙ্গ তাঁর নিজের দেশ ও কাল থেকে নেওয়া কিন্তু বাস্তবধর্মী গল্পরচনায় তাঁর সিদ্ধির কারণ অপরিশোধিত আকর সংগ্রহ নয়, সেটাকে পরিস্রুত করে প্রকাশ। মোপাসাঁ গল্প লেখার আগে বছরের পর বছর ফ্লবেয়ারের কাছে গল্প লেখা শিখেছেন, সেই নাছোড় খুঁতখুঁতেপনা তাঁর ছোটো গল্পের ভাষা তার ফরাসীভাষাকে অনন্যরূপ দিয়েছে। ভগীরথ মিশ্র অনিন্দ্য ভট্টাচার্য অমর মিত্রের মতো লেখকদের গল্পে নিচের মহলের মানুষজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার শুদ্ধ ছাপ আছে। কিন্তু প্রকাশের যাথার্থ্য না থাকলে, পরস্পরসম্পর্কিত বিষয়াশ্রয় খুঁজে পাওয়ার আকুতি

না থাকলে এই জাতীয় গল্প সফল ছোটোগল্পে উত্তীর্ণ হতে পারে না বোধ হয়। ইটভাটির শিশু শ্রমিক বা জমি না পাওয়া আদিবাসীকে প্রসঙ্গ করে ভালো ছোটোগল্প লেখা যেতে পারে, কিন্তু অপরিচয়ের অগভীরতা অসফল শিল্পরূপ আমন্ত্রণ করে আনে।

জীবনঘনিষ্ঠ ও শিল্পসফল বাংলা ছোটোগল্পের দূরত্ব হাত ও ভাতের দূরত্বের মতো ক্রমশ বেড়ে চলেছে। স্বকীয়তা মানে নতুন চোখে দেখা, কিন্তু গল্পকার অনেক সময়ই প্রথাগত বাস্তব আঁকছেন। বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির মতো বাংলা ছোটোগল্পেও হালে দুটি প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্ত হয়ে এসেছে : হিংস্রতা ও যৌনতা। প্রাতিষ্ঠানিক পত্রপত্রিকায় হিংস্রতা ও যৌনতার যে ছবি দেখা যায়, এ তারই উলটোপিঠ, তা একই রকম দাঁতে নখে লাল। এ সংকলনের বেশ কিছু গল্পে তার নমুনা আছে। এখানে হিংস্রতা শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষের মধ্যে প্রকাশ পায়, এখানে যৌনতা শোষণের রকমফের ব'লে দেখানো হয়। এ সংকলনের একাধিক গল্পে ধর্ষণের উল্লেখ আছে, এ সমাজকাঠামোয় নারী নিশ্চয় আর্থনীতিক পণ্য, মোপাসাঁ তাঁর প্রথম গল্প একতাল চর্বি লেখাটিতেই তা দেখিয়েছেন, কিন্তু বাংলা গল্পে বেশি কষটানো লেবুর মতো প্রসঙ্গটি দ্রুত তেতো হয়ে যাচ্ছে এই ভয় হয়। জোতদার বা অফিসার মেয়েটিকে ব্যবহার করে, মেয়েটি অর্থের প্রয়োজনে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেয় : এই প্রসঙ্গগত ক্রোধ, করুণা ও ভয় আমাদের নিশ্চিত স্পর্শ করবে। কিন্তু তার আগে প্রকাশের যোগ্য আধার চায়। মার্কেয়েজ একটি মায়াবী বাস্তবের লোকে আমাদের উত্তীর্ণ করে দেন, সেখানে বেচারি এরেন্দিরা মেয়েটির অসহায়তা ও নিরুপায়তা আমাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়। বাস্তবকে অধিবাস্তবে তুলে দিয়ে আরো বাস্তব করে তোলার সে জাদু, ভাষাকে চেতনায় অবচেতনায় বাহিত করার সে মন্ত্র বাঙালি গল্পকারের জানা নেই। তাই তাঁর ব্যবহৃত প্রসঙ্গ আড়ষ্ট মনে হয় এবং তা পাঠককে সমপরিমাণে ক্লিষ্ট করে।

মধ্যশ্রেণীর বাঙালি গল্পলেখক তাঁর জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার দুটি বিকল্প পথ খুঁজে পেয়েছেন : একটি পথ গ্রামে গঞ্জে বিসর্পিত, গল্পে শ্রমিকের কৃষকের জীবনের শরিক হতে চায়। আরেকটি পথ মহানগরীর, ক্রমশ উচ্চবিত্তদের হর্ম্যে উঠে যায়। আমরা মধ্যশ্রেণীর পাঠকরা অত্যন্ত বিমূঢ় ও বিচলিতভাবে লক্ষ করি : আমাদের গল্প নেই। গল্পে নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণী উপস্থিত, অথচ মধ্যশ্রেণী নেই। এ কেমন করে হয়। এ কেমন শিল্প যেখানে শিল্পী নিজের কথা নিজেদের কথা লেখেন না। একে ঐশী নিরাসক্তি বলতে পারলে

খুশি হওয়া যেত, বহুরূপী শিল্পীর আত্মবিলোপের ক্ষমতা বলতে পারলে ভালো লাগতো। কিন্তু তা বলা যাবে না। এমন নয় যে মধ্যশ্রেণী নিয়ে যা গল্প লেখার সব লেখা হয়ে গেছে, এমন নয় যে মধ্যশ্রেণীর কামনা ক্রোধ মদ মাৎসর্য যা প্রতিবাদী গল্পের বিষয় হতে পারতো তা নিঃশেষিত। দাঙ্গা বা দেশভাগের মতো মধ্যশ্রেণীর মূল ধরে নাড়া দেওয়া ভালো ছোটোগল্প এমন কি গল্পও বাংলায় যা লেখা হয়েছে তা এক আঙুলে গুণে ফেলা যায়। এ পটভূমিতে বাঙালি অপসরণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল মনে হয়। নিজেকে সমালোচনা করার ভয়, নিজের শ্রেণীকে সমালোচনা করার আতঙ্ক এই ধারার বাঙালি গল্পকারকে ক্রমশ মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম গৃহস্থের নিজের পরিবারের প্রতি ঔদাসীন্যের সূচক, এ পরিস্থিতিতে এমন সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হবে।

আমাদের সংকলনের বেশির ভাগ গল্পে শ্রমিক কৃষকের মতো নিম্নবিত্ত মানুষদের উপস্থিতি দেখে একথা মনে হয়েছিল, দু একটি গল্পে উচ্চবিত্ত মানুষদের সম্ভবপর অথচ অবিশ্বাসযোগ্য উপস্থিতি চোখে পড়ায় সেকথা নতুন করে মনে পড়লো। রুণা ও একটি অসমাপ্ত লিরিক গল্পটিতে রোম্যানটিকতা আছে, কিন্তু সে রোম্যানটিকতার মূল লেখকের স্বশ্রেণীর গভীরে নেই, তাঁর গীতিময়তার উৎস অন্যত্র উৎসারিত। আপস গল্পে এক উচ্চবিত্ত প্রশাসকের কথা আছে। সে প্রশাসক অথচ সৎ এটা তার অহংকার, সে মদ খায় ও মুখ খারাপ করে এটা লেখকের অহংকার। সে শেষ পর্যন্ত অসৎ হয়ে যায় ও মদ খেতে থাকে, এভাবে লেখককে আপস করতে হয়। লেখক না চাইলেও মধ্যশ্রেণীর দ্বিধা দ্বন্দ্বের ছাপ গল্পে পড়ে যায়, ছাপ পড়ে যেতে থাকে। ফাইল গল্পের প্রশাসক প্রশাসনের আদিবাসীপ্রীতির অর্থহীনতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন, আদিবাসীদের মূল সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর অসহায়তাও আমাদের স্পর্শ করে; কিন্তু তিনি যখন বলেন কাঠকুড়ানিরা অরক্ষিত বনের কাঠ কেটে ফেলছে, বনসৃজন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, অথচ বনবিভাগের যোগসাজসে ঠিকেদারদের বন সাবাড়ের গল্প তাঁর মনে আসে না, তখন তাঁর শ্রেণীচরিত্র একটি অগোচর মাত্রা পায়। দাহ গল্পে একটি বালকের মৃতদেহ গনগনে ইটভাটিতে ঢুকে যায়—সে শিশু বলে কি অবহেলা পায়, শ্রমিক ব'লে, না হিন্দু ব'লে। খড়ের মানুষ গল্পে মেয়েটি নিজেকে বিকিয়ে দিতে থাকে, সে কি বাবাকে টিকিয়ে রাখবে তাই, না সতীর ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখবে সেজন্য?

এবং এরই মধ্যে মধ্যশ্রেণী কিছু গল্পের ব্যাপার বিষয় হয়ে ওঠে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমীরণ দাস উদয়ন ঘোষরা এই সময়ের ও এই সমাজের গল্প লেখেন।

উদয়ন ঘোষ তাঁর গল্পটিকে অভারতীয় বলেছেন বোধ হয় খুব বেশি রকম ভারতীয় বলেই একথা বলেছেন। ছেলে এবং গোপালের একটি সরল সমীকরণ আছে এ গল্পটিতে, যা সুধেন্দু মল্লিকের কবিতা ছাড়া এখন আর কোথাও দেখা যায় না। অবাক লাগে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কারণ, আর্থনীতিক কারণটিকে উদয়ন গল্পটির ভাবভিত্তি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন দেখে। বড়লোক বউ তাঁর গোপালকে আলাদা করে দিয়েছে দেখে মায়ের গোঁসা হয়, চাকরীর জন্য ছেলেকে অন্যত্র যেতে হলে মায়ের গোপাল কি মায়ের সঙ্গে থাকতো। এখানে এই সহজ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায় না। সমীরণ দাস ও স্বপ্নময় চক্রবর্তী এই ভিত্তিস্থানীয় তলটিকে উপেক্ষা করেন না। অমর মিত্রের গল্পে যেমন জমির উর্বরতা ও গর্ভবতী নারী মিলে গিয়েছিল ভগীরথ মিশ্রের গল্পে তেমনি জননী ও জন্মভূমি একাকার হয়ে যায়। এই সমীকরণ কোনো অবধারিত প্রণালীর ফল নয়, তাঁর গল্পের শুরুতে খেজুর রসের উল্লেখ এ কারণে প্রক্ষিপ্ত বোধ হয়। সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে এই জাতীয় প্রক্ষেপ প্রায়ই সামগ্রিক প্রতীতির বোধ ক্ষুন্ন করে দেয়।

এবং শেষ পর্যন্ত ছোটোগল্পের শিল্প-সার্থকতার প্রসঙ্গটি ফিরে আসে। একটিছোটো গল্পের থেকে আমরা অন্তত দুটি জিনিশ প্রত্যাশা করি। প্রথমত রচনাটি ছোটোগল্পের ভাষা এবং বাংলা ভাষাকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করবে। দ্বিতীয়ত, ছোটোগল্পটি কোনো সর্বজনগ্রাহ্য বাস্তবতাকে ভাষা দেবে, সে ভাষা সাধারণ হলেও এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির ভাষা। দুয়ে মিলিয়ে ভাষা একটিই। এই সংকলনভুক্ত গল্পমালার নির্ভরে সে ভাষার বিবেচনায় প্রবৃত্ত হয়ে দেখা গেল লেখকরা বাস্তবতাকে ভাষা দিতে যতটা আগ্রহী ছোটোগল্পকে ভাষা দিতে তত উৎসুক নন। এবং সে বাস্তবতা ম্যাজিক-রিয়ালিজম নয়। অথচ অধিবাস্তবতা ছাড়া এ মুহূর্তে আমাদের আর কোনো পরিত্রাতা প্রস্থান নেই।

এই সংকলনের গল্প সম্পর্কে এসব মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য নয়, এ সময়ের বাংলা ছোটোগল্পের কথা মনে রেখে সাধারণভাবে এই সমস্ত কথা বলা। কোনো বিধুর পিছুটান থেকে বলা হচ্ছে না যে এর আগের কয়েকটি দশকে অনেক বেশি এবং অনেক সফল ছোটোগল্প লেখা হয়েছে। ক্ষেত্র-বিশেষে কারো কারো সাফল্য ঈর্ষা করার মতো, সব মিলিয়ে এখন আমাদের সামগ্রিক অর্জন শোচনীয়ভাবে দীন। বর্তমানে ইংরেজী অনুবাদে ও মূলে যে সব গল্প পড়া যায় তার থেকে ধারণা করা অন্যায় হবে না যে বিশ্বছোটো-গল্পের একটি বৃহৎ অংশে মন্দা চলছে, বাংলা ছোটো গল্পও সেই ধারা বহন করে চলেছে। উত্তর বিপ্লব চীন ও সোভিয়েত দেশের গল্পসমূহের সঙ্গে তুলনা করলে এ সংকলনের প্রায় প্রতিটি গল্প প্রকাশযোগ্য মনে হবে এবং এটিই সম্ভবত সংকলনটি করার প্রধান কারণ।